রামমোহন

সময় জীবন সাধনা

রামমোহন

সমগ্র জীবন সাধনা

মদনমোহন গরাই

প্রাপ্তিস্থান
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৪/৩ কলেজ ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২

P. K. Roy
Rs-12.50

RAMMOHUN
SAMAY JIBAN SADHANA

By

MADAN MOHAN GARAI

প্রকাশক :
মদনমোহন গরাই
পি-২৫ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মূল্য : চার টাকা

॥ নিবেদন ॥

রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষে প্রাণগঙ্গার ভগীরথ। তামসী রাত্রির সকল দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করেছেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর সময়, জীবন ও সাধনা সম্পর্কে সাধ্যমত আলোচনার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে।

রামমোহন-চর্চায় পূর্বগামীদের নিষ্ঠা, শ্রম ও গবেষণার ফলে অনুগামীর পথ সুগম হয়েছে; তাঁদের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের একটি সুচিন্তিত ও মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আমি বিশেষভাবে উপকৃত। গ্রন্থাগারের কর্মীদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থ মধ্যে প্রুফ সংশোধনে যে-সব ভুল রয়ে গেল তার জন্য আমি গভীরভাবে দুঃখিত। আশা করি সহৃদয় পাঠক সে ত্রুটি মার্জনা করবেন।

মদনমোহন গরাই

॥ ভূমিকা ॥

একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।" রামমোহনের তিরোধানের একষট্টি বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য সে যুগের কারও কারও কাছে কিছু উচ্ছ্বসিত মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ যদি আমরা সংস্কারের ছোট ছোট খোপ থেকে বেরিয়ে এসে বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মিকা চৈতন্যের দ্বারা রাজা রামমোহনের জীবন ও সাধনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করি, তা হলে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকে অতিশয় যুক্তিসঙ্গত মনে হবে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের তরুণ লেখক শ্রীমান মদন মোহন গরাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রামমোহনের সমগ্র কর্মপ্রেরণার মূল উৎসকে বস্তুগতভাবে আলোচনা করেছেন। রামমোহনের কোন এক বিদেশিনী অনুরাগিণী তাঁর সম্বন্ধে একটু আলঙ্কারিক ভাষায় বলেছিলেন, "He was the arch which spanned the gulf that yawned between superstition and science, between despotism and democracy, between immobile custom and a conservative progress, between a bewildering polytheism and a pure, if vague theism." 'রামমোহন : সময়-জীবন-সাধনা' গ্রন্থের নবীন লেখক নানা তথ্য, নথিপত্র, বিভিন্ন ব্যক্তির মন্তব্য প্রভৃতি থেকে এই কথাটাই বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন।

রামমোহন সম্বন্ধে একদা বিষম দলাদলি, মতান্তর এবং মতান্তর থেকে মনান্তরের সৃষ্টি হয়েছিল। তার কারণ রামমোহনকে ইতিহাস-দর্শন-নির্দিষ্ট বস্তুগত পটভূমিকায় না দেখে আমরা নিজ নিজ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংস্কারের পিঞ্জরের ফাঁক দিয়ে তাঁকে অবধারণ করতে গিয়েছিলাম। বাংলা একাধারে নব্যন্যায়ের দেশ এবং প্রেমভক্তির পীঠস্থান। কিন্তু প্রায়ই ভাবাতুর চিত্তপ্রবণতা আমাদের এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, বুদ্ধির নিঃস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা স্পৃহণীয় আবেগের দ্বারা আর্দ্র করে ফেলি। বাংলাদেশের যাবতীয় মননকর্মের এ একটা মারাত্মক ত্রুটি—এবং একথা বলাই

বাহুল্য যে, রঙিন চশমার ফাঁক দিয়ে যা কিছু দেখা যাবে তাকেই রঙিন মনে হবে। জবাফুলের প্রচ্ছায়ে শুভ্রতনু মর্মরমূর্তিও রক্তিমাভা ধারণ করে একথা কে না জানে? তাই রামমোহনের মতো বিরাট, বিচিত্র ও জটিল ব্যক্তিত্বকে বিচার করতে গেলে ব্যক্তিগত প্রবণতার উর্ধ্বে উঠতে হয়। ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী এবং তার ছায়াপটে আবির্ভূত কুশীলবদের নানা ভূমিকায় অভিনয়—এর প্রত্যেকটির পিছনে যে কালবিবর্তন কখনও প্রকাশ্যে, কখনও অন্তরালে সমস্ত ঘটনা ও ঘটনাজাত চিত্রপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তার সম্বন্ধে অস্বচ্ছ ধারণা গবেষণাকর্মের ঘোর বিরোধী। শ্রীমান মদন মোহন গরাই আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস-দর্শনের সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে বিশেষভাবে অবহিত তা তাঁর এই গ্রন্থখানি থেকেই বোঝা যাবে। তিনি উপাদান ও উপকরণকে শুধু তালিকাবদ্ধ করে সাজিয়ে দিয়ে গবেষণাকর্মের স্থূলতম পন্থা অবলম্বন করেননি, বা ফুটনোট তস্য ফুটনোটের কণ্টকশয্যা তৈরী করে তার উপর হঠযোগীর ব্যায়াম-কসরত দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। সর্বোপরি এই তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিবহ ও মৌলিক চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থখানি একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ হয়েছে; তথ্যের সঙ্গে মিশেছে তাঁর মূল্যাবধারণার বিচক্ষণতা, যুক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে রচনাভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা, সরলতা ও স্বচ্ছতা।

ইদানীং বাংলাদেশের মননকর্ম দু'ভাবে নির্বাহ হয়। এক—গবেষণা, দুই—রম্যরচনা। গবেষণা বলতেই একপ্রকার নিরেট তথ্যবোঝাই, ভীমদর্শন, গুরুভার গ্রন্থ বোঝায়—যা সাধারণ ও রসিক পাঠকের ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। পাদটীকার চরণ বিলাসই যার পদচারণার একমাত্র অবলম্বন। তাতে জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা ঢের থাকতে পারে। সুধী ব্যক্তিরা তাতে আনন্দিত হবেন, কিন্তু অ-সুধী দুর্মেধা ব্যক্তি, যাঁর স্বাভাবিক রসোপভোগ ক্ষমতা ভিন্ন অন্য কোন বাড়তি সপ্তেন্দ্রিয় নেই, তিনি গবেষণা-অরণ্যের লতাজটিল অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই আমাদের গবেষণাগ্রন্থ থেকে স্কুলঘরের শাসন ঘুচল না। গবেষণাও যে একপ্রকার সুখপাঠ্য শিল্পবস্তু, বিশেষতঃ সাহিত্যসংক্রান্ত গবেষণা—একথা অনেক গবেষকই ভুলে যান।

এর প্রতিষেধক হিসেবে কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা 'রম্যরচনা'র দিকে তর্জনী তুলে ধরেন। আমাদের দেশের রম্যরচনা একধরনের গন্ধে স্বপ্ন দেখার

সামিল হয়ে পড়েছে। যাঁদের তত্ত্ব, তথ্য, চিন্তা, মননে কিছুমাত্র অধিকার নেই, তাঁরাই অনেক সময় মুখরোচক রম্যরচনার কমলবনে তরবেতর 'খোয়াব' দেখতে থাকেন। রম্যরচনা বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অতি দুরূহ শিল্প, বাসনা-সংস্কার ও মন-মেজাজ না থাকলে ওপথে যাত্রার মানে হল প্রবন্ধের জাত মারা। রুচি যখন বেপরোয়া, চিন্তা যখন এলোমেলো, আবেগ যখন নির্বাধ, লিখনকৌশল যখন অনায়ত্ত, তখন অনেকেই যে রম্যরচনার খোলামাঠে কানামাছি খেলতে প্রলুব্ধ হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের এই বর্ত্মে বহু পথিক ভীড় জমিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সুলভ ও সহজের রসে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা চেষ্টাসাধ্য ও পরিশ্রমসাপেক্ষ তত্ত্বানুশীলন ও তথ্যানুসন্ধিৎসা বেমালুম পরিত্যাগ করে যান এবং যাবতীয় কঠিন মননকর্মের প্রতি প্রবল অনীহা বোধ করে থাকেন। রম্যরচনার বাড়াবাড়ির ফলে, বিশেষতঃ এই শিল্পপ্রকরণটি অনধিকারীর হাতে পড়াতে শিথিল চিন্তা ও অপটু রচনা-ভঙ্গিমাই হয়েছে রম্যরচনার প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এই গ্রন্থের লেখককে গুরুভার গবেষণা ও রম্যরচনার মরুভূমি ফুল যে আকর্ষণ করেনি এজন্য তিনি পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তিনি রামমোহনের দেশ-কাল নির্ধারণে, বিশেষতঃ রামমোহনের মনোজীবনের বিশ্লেষণে যেমন কৌতূহলী, তেমনি সেই চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্বকথাকে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন মূর্তি দিতেও সমান উৎসাহী।

'রামমোহন: সময়-জীবন-সাধনা'—এক কথায় রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবন, তদানীন্তন দেশ ও কাল, ভাবাদর্শের দ্বন্দ্বসংঘাত এবং সেই পটতলে রামমোহনের চিত্তজাগরণ—নানা তথ্য ও উপাদান থেকে লেখক সে কথা অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। রামমোহন যেন অন্ধকার আকাশের অনির্বাণ ধ্রুবতারা, অপার সমুদ্রের আলোকস্তম্ভ। তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনার কথা বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় জ্ঞাত আছেন। ১৭৭৪ সালে তাঁর জন্ম, ১৮১৪ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদির বাংলা ভাষায় অনুবাদ-ব্যাখ্যা-প্রচার, সাময়িকপত্র ও পুস্তিকার মারফতে ভারতীয় সনাতন ধর্মপ্রণালীর স্বরূপ বিশ্লেষণ, সেই প্রসঙ্গে কুযুক্তিবাদী ও একচক্ষু মিসনারী সম্প্রদায় এবং শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বৈরথ, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিক্ষার যুক্তবেণী রচনা, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্থাপনের

জন্য আন্দোলন, সাময়িকপত্রের স্বাধীনতার জন্য আবেদন ও প্রতিকার প্রার্থনা—এসব বিষয় সম্বন্ধে বাংলা দেশের পাঠক অবহিত আছেন। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন, সেখানে গিয়ে য়ুরোপে প্রথম চক্ষুষ্মান ভারতীয় বলে অভিনন্দিত হন, ওদেশের বহু চিন্তাশীল মনীষীব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হন, অনেকের বন্ধুত্ব লাভ করেন। দীর্ঘতনু এই ভারতবাসীর কণ্ঠে আধুনিক জীবন, যুক্তিবাদ ও মানবতার বাণী শুনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও *Calcutta Monthly Journal*-এর মতো বলতে পারতেন, "If the labours of Luther in the western world are entitled to be commemorated by Christians—the Herculean efforts of the individual, we have alluded to, must place him high among the benefactors of the Hindoo portion of mankind." ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে বিদেশে এই বিরাট পুরুষের জীবন অস্তমিত হল।

'জবরদস্ত মৌলভী' রামমোহন, বহু ভাষাবিদ রামমোহন, সংস্কৃতশাস্ত্র ও ইহুদী—খৃস্টান তত্ত্বে অতিশয় অভিজ্ঞ রামমোহন—আবার সমাজসংস্কারে ধৃতাস্ত্র যোদ্ধা, রাজনৈতিক স্বৈরাচারের ঘোর শত্রু, স্বাধীনতা-আন্দোলনের বন্ধু—একাধারে তিনি পণ্ডিত, মনীষী, কর্মী, সংস্কারক এবং অবহেলিত মানুষের বান্ধব। আমাদের বাংলাদেশের সমাজ, ধর্ম, নীতি ও সংস্কার-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রগতিশীল আন্দোলনের তিনিই পথিকৃৎ, তবু তাঁকে আমরা বিশ্বপথিক বলতে পারি। আধুনিক বিশ্বের বিরাট প্রাঙ্গণেই তাঁর মানস-পরিক্রমা। আবার অপরদিকে আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনিই প্রাচ্যভুবনের প্রথম জাগ্রত পুরুষ। সে জাগরণের অর্থ হল—যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং উদার মানবতাবোধ। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যুক্তিবাদ আধুনিক মানুষের মনে আত্মজিজ্ঞাসার বহ্নিকুণ্ড রচনা করেছে, রামমোহন সেই বহ্নিকুণ্ড থেকেই অগ্নি চয়ন করেছিলেন। প্রাচীন প্রমিথ্যুস অগ্নি অপহরণের জন্য নিদারুণ নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, আর আধুনিক প্রমিথ্যুস রামমোহনকেও নানা স্থান থেকে আঘাত পেতে হয়েছিল, কারণ তিনি জ্ঞানালোকের দ্বারা যুগান্তীর্ণ তিমিরকে বিদীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। অপূর্ব আলঙ্কারিক ভাষায় ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তাঁর বিশ্ববিস্তারী জ্ঞানাদর্শ সম্বন্ধে আচার্য ব্রজেন্দ্রলাল শীল যথার্থ বলেছেন, "He was

the peer of the Voltaires, and the Volneys, the Diderots and the Herders across the seas; and he had seen and travelled beyond them all, a modern Ulysses, voyaging in the land of the setting sun, and descending—not once, not twice, but manytimes—into the dark underworld, to bring messages from the old prophets in the middle ages." এই হল রামমোহনের যথার্থ স্বরূপ।

যুক্তিবাদ ও মানবহিতবাদ—যা আধুনিক য়ুরোপের প্রধান হাতিয়ার, রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সুপরিচিত হবার আগেই তার অনেকটা লাভ করেছিলেন সেমিটিক ধর্মানুশাসন ও জ্ঞানচর্চা থেকে। ইসলামী 'মোতাজেলা' সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ এবং 'মুওহাদ্দিন' সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদী তত্ত্ব তাঁকে প্রথম যৌবনে যুক্তিমার্গীয় ও ঐক্যবাদী ধর্মতত্ত্বের দিকে আকর্ষণ করেছিল, বেদান্ত-উপনিষদচর্চা তাঁকে ভারতীয় চৈতন্যের সেই ঐক্যতত্ত্ব অবলম্বনেই উৎসাহিত করেছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজী ভাষা শিখে তিনি য়ুরোপীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ বুঝে নিয়েছিলেন। এইভাবে প্রাচীন ভারতের ঐক্যমুখী দার্শনিকতা, সেমিটিক মর্ত্যমুখিতা ও যুক্তিবাদ এবং আধুনিক য়ুরোপ তাঁর চেতনাকে নির্মোহ, সংস্কারমুক্ত ও উদারতর পরিমণ্ডলে উপস্থাপিত করেছিল—যার অনেক কথা মিল, বেন্থাম, কোঁৎ প্রভৃতি সমাজ-দার্শনিকেরা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাতরঙ্গমুখর য়ুরোপের মানব-সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে বলে গেছেন। রামমোহনও এদেশে তার কিছু আগে থেকেই মানবতাবাদের সমতলভূমি থেকে মানবকল্যাণের বাণী ঘোষণা করেছিলেন। তিনি যে চেতনার মুক্তির কথা বললেন তার অর্থ হল—সর্ববিধ সংস্কারমুক্ত চিত্তের বিকাশ, যুক্তিপন্থার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপারকে বুঝে নেবার চেষ্টা, এবং যুক্তিপন্থার মধ্য দিয়েই সেই মানুষকে বরমাল্য দিতে হবে যার জীবন ভূগোল-ইতিহাসে বিবর্তিত হলেও, দেশকালের বাতাবরণের দ্বারা যে-জীবন পরিচ্ছিন্ন নয়। রামমোহন বিশ্ববোধের উদার পটভূমিকা থেকেই বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার নিপুণ আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। লেখক তৎকালীন দেশ ও কালের ভাবতরঙ্গের ঐতিহাসিক মানচিত্র অঙ্কন করেছেন এবং সেই মানচিত্রে রামমোহনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রামমোহনের

জীবন ও সাধনার যথার্থ স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু জানতে হলে এ গ্রন্থটিকে অপরিহার্য মনে হবে। তরুণ লেখক গবেষকের পরিশ্রম ও শিল্পীর প্রতিভা দিয়ে যে আলোচনা, বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন, এ গ্রন্থে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাবে। এর দ্বারা রামমোহন-সাহিত্যের একটি মূল্যবান সংযোজন হল। এতে বাংলার এক যুগসঙ্কটের কালপর্যায় আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে—বাংলা মননকর্মের এটি একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

বাংলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সূচীপত্র ॥

পূর্বপট। ১—৭

প্রথম পর্ব

[এক] আত্মজীবনীমূলক পত্র। ১১—১৫

[দুই] বংশ পরিচয়—পিতামাতা—জন্ম বৎসর। ১৬—২৫

[তিন] বাল্যশিক্ষা—বিবাহ—পাটনা ও বেনারসে শিক্ষা—হিন্দু পৌত্তলিকতা বিষয়ে পুস্তক রচনা—তিব্বত ভ্রমণ—গৃহে প্রত্যাগমন—বিষয়কর্ম—রামকান্তর দানপত্র—পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্তি—কোলকাতায় নিজস্ব গদি—অর্থোপার্জন—পাটনা ও বেনারস যাত্রা—রাধাপ্রসাদের জন্ম—প্রথম চাকরি। ২৬—৩৮

[চার] রায়পরিবারে বিপর্যয়—রামকান্ত ও জগমোহনের জেল—রামকান্তর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ। ৩৯—৪৪

[পাঁচ] 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন' রচনা। ৪৫—৪৯

[ছয়] রামমোহন ও জন ডিগবী—ডিগবীর অধীনে চাকরি—রামগড়—যশোর—ভাগলপুর—স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের সঙ্গে বিরোধ—রংপুর—জগমোহনের মৃত্যু—বিষয়কর্ম ও শাস্ত্রালোচনা। ৫০—৬০

দ্বিতীয় পর্ব

[এক] কোলকাতায় আগমন—'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা—ভুটান যাত্রা—কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন—হিন্দু-সমাজের অবস্থা—আত্মীয়সভায় উৎসবানন্দ বিদ্যা-বাগীশের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার। ৬৩—৭০

[দুই] ধর্মালোচনা—শাস্ত্রানুবাদ—বেদান্ত—বেদান্তসার—কেনোপনিষৎ—ঈশোপনিষৎ—শঙ্কর শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা—এলিসের অভিযোগ—ভট্টাচার্যের সহিত

	বিচার—গোস্বামীর সহিত বিচার—কবিতাকারের সহিত বিচার—সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার—চারি প্রশ্নের উত্তর—পথ্য প্রদান—কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার।	৭১—৮৫
[তিন]	সামাজিক আন্দোলন—সতীদাহ—সতীদাহ নিবারণে মিশনারী প্রচেষ্টা—সরকারী প্রচেষ্টা—সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ—প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ—সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার—বহুবিবাহ—কন্যাপণ।	৮৬—১০১
[চার]	রামমোহনের কর্মপ্রচেষ্টায় মিশনারীদের সমর্থন—রামমোহন প্রসঙ্গে তাঁদের আগ্রহ ও কৌতূহল—দেশ-বিদেশে রামমোহনের খ্যাতি।	১০২—১১০
[পাঁচ]	খৃষ্টধর্মের প্রতি রামমোহনের আগ্রহ—'Precepts of Jesus' প্রকাশ—মিশনারীদের সঙ্গে মসীযুদ্ধ।	১১১—১১৭
[ছয়]	বাইবেলের অনুবাদ—উইলিয়ম এ্যাডাম কর্তৃক খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ বিসর্জন—মিশনারীদের সঙ্গে রামমোহনের সংঘর্ষ—'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশ—টাইটলরের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ—'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ'।	১১৮—১৩০
[সাত]	শিক্ষা বিস্তার—শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানীর মনোভাব—চুঁচুড়ায় মে সাহেবের স্কুল—হিন্দু কলেজ—অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল—পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের জন্য লর্ড আমহার্স্টের নিকট আবেদন।	১৩১—১৩৯
[আট]	'ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' স্থাপন—ইউনিটেরিয়ান প্রচারকার্য—খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচারে এ্যাডামের আগ্রহ—তাঁর আশাভঙ্গ।	১৪০—১৪৬
[নয়]	রাজনৈতিক আন্দোলন—সংবাদপত্র প্রকাশ—'সংবাদ-কৌমুদী'—'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার'।	১৪৭—১৬৩
[দশ]	রাজনৈতিক আন্দোলন—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ—রামমোহনের প্রতিবাদ—সুপ্রীম কোর্টে	

আবেদন—'মীরাৎ'-এর প্রকাশ বন্ধ—ইংলণ্ডে রাজার নিকট আবেদন। ১৫৪—১৬৫

[এগার] রাজনৈতিক আন্দোলন—ইণ্ডিয়ান জুরি বিল—এদেশীয়দের অধিকার হ্রাস—প্রতিবাদে পার্লামেণ্টে আবেদন—উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আবেদন—লাখরাজ ভূমি-সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আবেদন। ১৬৬—১৭২

[বার] একেশ্বরবাদ প্রচার—বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ—'গায়ত্রীর অর্থ'—'আত্মানাত্মবিবেক'—'প্রার্থনাপত্র'—'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ'—'গায়ত্র্যা পরমোপাসনা-বিধানং'—ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠা—এ্যাডামের মনোভাব—সমাজগৃহ স্থাপন—ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডীড—বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ—'বজ্রসূচী'—'ব্রহ্মোপাসনা'—'ব্রহ্মসংগীত'—'অনুষ্ঠান'—'ক্ষুদ্রপত্রী'—ব্রহ্ম—বিদ্যালয় স্থাপন। ১৭৩—১৮১

[তের] অর্থনৈতিক আন্দোলন—কলোনাইজেসন সমর্থন। ১৮২—১৮৬

[চোদ্দ] সামাজিক আন্দোলন—সতীদাহ—'সহমরণ বিষয়' প্রকাশ—উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রচেষ্টা—সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ—বেণ্টিঙ্কের অভিনন্দন—রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ের আবেদন অগ্রাহ্য—'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা—ইংলণ্ডে আবেদনের আয়োজন। ১৮৭—১৯৩

[পনের] শিক্ষা বিস্তার—আলেকজাণ্ডার ডফ্‌কে সাহায্য—ইংরাজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ—স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা—'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'—বাংলা গদ্যে রামমোহনের অবদান। ১৯৪—১৯৮

[ষোল] পারিবারিক জীবন—রঘুনাথপুরে নিজস্ব বাগান ও বাড়ী—রমাপ্রসাদের জন্ম—আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনান্তর—গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে মকদ্দমা—দুর্গা দেবীর সঙ্গে মকদ্দমা—তেজচাঁদের সঙ্গে মকদ্দমা

—রাধাপ্রসাদের দুর্ভোগ—রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আক্রমণ—প্রাণসংহারের প্রচেষ্টা—অর্থাভাব—মাণিকতলার বাড়ী বিক্রয়—ইংলণ্ড যাত্রা। ১৯৯—২০৮

তৃতীয় পর্ব

[এক] ইংলণ্ড রওনা—দিল্লীর বাদশার দৌত্যকার্য—রাজারাম—জাহাজে সহযাত্রী সাদারল্যাণ্ড—তাঁর স্মৃতিকথা—লিভারপুলে আগমন—উইলিয়ম রস্কোর সঙ্গে পরিচয়—লণ্ডন যাত্রা—পথে ম্যানচেষ্টার দর্শন—লণ্ডনে জেরিমি বেন্থামের সঙ্গে পরিচয়—লণ্ডন ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েসনে অভ্যর্থনা—কোম্পানী কর্তৃক ভোজসভার আয়োজন—রাজ দরবারে উপস্থিতি—ইংলণ্ডের উচ্চসমাজে প্রতিষ্ঠা। ২১১—২১৩

[দুই] সিলেক্ট কমিটির প্রশ্নের উত্তর প্রদান—রাজস্ব-বিভাগ—বিচার বিভাগ—ভারতবর্ষের অবস্থা—রামমোহনের মতামত সম্বন্ধে এদেশে আলোচনা—কলোনাইজেসন—লবণের বাণিজ্য প্রসঙ্গ—সতীদাহ সম্পর্কে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল—জুরি বিল—রিফর্ম বিল—লাখরাজ জমি—দিল্লীর বাদশার দৌত্যকার্য। ২২৪—২৩৮

[তিন] ফ্রান্স গমন—লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন—হেয়ার পরিবারে বাস—লণ্ডনের সমাজে প্রতিষ্ঠা—লুসী একিন—ফ্যানী কেম্বল—রেভারেণ্ড ডি ডাবিসন—মিস্ কেডেল—মিস্ ক্যাসেল—ব্রিষ্টলে আগমন—'ষ্টেপলটন গ্রোভ'-এ বাস—অসুখ—মিঃ এষ্টলিনের বিবরণ—মৃত্যু—সমাধি মন্দির—স্মৃতিফলক। ২৩৯—২৪৯

পরিশিষ্ট। গ্রন্থপঞ্জী ২৫০—২৫৬



॥ পূর্বপট ॥

পলাশী-যুদ্ধের পর থেকে বাংলার ইতিহাসে নূতন পালা শুরু হল। বাংলার মসনদে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পর নবাব হয়ে বসলেন জাফর আলী খাঁ। কিন্তু তার আগে তৈরী হল দশ দফা সন্ধির সর্ত। ইংরাজের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রভূত অর্থ দিতে রাজী হলেন জাফর আলী। রাজী হলেন, 'An alliance offensive and defensive against all enimies whatever'.[১] ইংরাজের রক্ষার জন্যই সর্বস্ব পণ করলেন বাংলার নূতন নবাব। বাংলার জন্য নয়; বাঙালীর জন্য নয়।

আসলে একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই ছিল পলাশী-চক্রান্তের গোড়ার কথা। তাই গোপনে জাফর আলী ক্লাইভকে লিখেছিলেন, 'when I am arrived near the army I will send you privately all the intelligence'.[২] আর উত্তরে ক্লাইভও জানিয়ে দিলেন, 'Be assured if you do this you will be subah of these provinces'.[৩] জাফর আলীর লোভী মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। চক্রান্ত সম্পূর্ণ হল। অস্ত গেল বাংলার স্বাধীনতা। পলাশীর প্রান্তরে উড়ল সুচতুর ইংরাজের উদ্ধত বিজয়-নিশান। সেদিন তার মধ্যে ছিল বাংলার অনিবার্য ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘোষণা; ছিল বেনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্বাপদ-সঞ্চারের অভ্রান্ত সংকেত। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে-মগ্ন চৈতন্যে ধরা পড়ল না সেই অশুভ ভবিষ্যতের ছবি। মসনদে মসগুল হয়ে রইলেন নবাব জাফর আলী খাঁ। সঙ্গীসাথীরা ব্যস্ত রইলেন নবাব প্রাসাদের হীরা জহরৎ আর টাকাকড়ির ভাগাভাগিতে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজেকে ধন্য মনে করলেন স্বয়ং ক্লাইভের কাছ থেকে পাঁচখানা কামান উপহার পেয়ে।[৪] আর রাজবল্লভের বিধবা স্ত্রী কোম্পানীর কাছে তাঁর মাসোহারার দাবী জানিয়ে পাঠালেন, যেহেতু

১। Bengal in 1756-57
২। ঐ
৩। ঐ
৪। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত

তাঁর স্বামী পলাশীযুদ্ধে সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করেছিলেন। এমনকি সেদিনের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের মনেও জাগেনি কোন খেদ। পলাশী যুদ্ধের পর আরও তিন বছর বেঁচেছিলেন তিনি। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরী রসে মত্ত মন নাগরলীলার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে দেশ অথবা জাতির দুঃখে একদিনের জন্যও সোনা হয়ে ওঠেনি।

পলাশী যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশে সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। তখন থেকে নবাব হল কোম্পানীর হাতের পুতুল। নবাবকে সামনে রেখে কোম্পানী তাই তৎপর হল স্বার্থসাধনে। বেনিয়া কোম্পানী সেদিন ভালভাবেই জেনেছিল যে এদেশের শিল্প বাণিজ্যকে ধ্বংশ করতে না পারলে তাদের ব্যবসারও প্রসার হবে না; রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলও দৃঢ় হবে না। জেনেছিল, দাস সৃষ্টি না হলে প্রভু হওয়া সম্ভব নয়। তাই দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের মূলে পড়ল কোম্পানীর নির্মম কুঠারাঘাত। সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর মিরজাফরের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি হয়েছিল যে নবাব কোম্পানীর ব্যবসা সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এই চুক্তির বলেই শুরু হল কোম্পানীর যথেচ্ছাচার। জোর করে তন্তুবায়দের বাধ্য করা হত দাদন গ্রহণ করতে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অসম্ভব রকমের বেশী সংখ্যক বস্ত্র প্রস্তুত করে দেওয়ার মুছলিকা লিখে নেওয়া হত। তার উপর বস্ত্রের যে মূল্য নিরূপণ করা হত তা সবসময়ই বাজারের মূল্য অপেক্ষা শতকরা পনের থেকে পঞ্চাশ ভাগ কম। আর এই সঙ্গে থাকত কড়া নির্দেশ যেন কোম্পানী ছাড়া আর কাউকে তারা বস্ত্র বিক্রী না করে। নির্দেশভঙ্গকারীর জন্য গুরুতর শাস্তির বিধান। অথচ ডাচ, ওলন্দাজ অথবা পর্তুগীজদের কাছে বিক্রী করলে প্রকৃত মূল্য পাওয়া যেত। কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে নিরীহ তন্তুবায়েরা ইংরাজ ছাড়া আর কোন খরিদ্দারের পথ মাড়াতে সাহসী হত না। নিজেদের পরিশ্রমের যথাযথ মূল্যটুকুও গ্রহণ করার অধিকার ছিল না তাদের। এর পরও ছিল মূর্তিমান শয়তানের মত স্বার্থপর গোমস্তারা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গ্রামের যুবতী মেয়েদের পাইক দিয়ে ধরে নিয়ে যেয়ে কুঠির সাহেবদের কাম চরিতার্থ করার জন্য উপহার দিত। এই সমস্ত অর্থ-পিশাচরা তন্তুবায়দের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের জন্য তারা ইংরাজ ছাড়া ফরাসী অথবা পর্তুগীজদের কাছে বস্ত্র বিক্রী করছে বলে তাদের নামে কুঠির সাহেবদের

কাছে অভিযোগ করার ভয় দেখাত। অভিযোগের অর্থই হল অত্যাচার। তাই সেই মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তারা গোমস্তাদের হাতে অর্থ তুলে দিত। আর যারা তা পারত না তাদের নামে নালিশ যেত কুঠিতে। সত্যাসত্যের কোন অনুসন্ধান হত না, হত না কোন বিচার। কুঠি থেকে দল বেঁধে সিপাহী যেত বাড়ীতে। বাড়ী লুঠ হত। মেয়েদের ধর্ম নষ্ট হত। তারপর এক পৈশাচিক উল্লাসের মধ্যে সমস্ত বাড়ীটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত। পুড়ে গেল তাদের শিল্পকর্ম। পূর্বপুরুষদের সাধনা দিয়ে, শ্রম দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে উন্নত করে তোলা বাংলার একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্মকে রক্ষা করা সম্ভব হল না তাদের পক্ষে। জোর জুলুম আর অন্যায় অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রাতের অন্ধকারে ধারাল অস্ত্র দিয়ে একে একে তারা সবাই নিজেদের আঙুল কেটে ফেলল।

শুধু এই নয়, এর পরও আছে। কাশেম আলীর সময়ে কোম্পানী তাদের বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যের উপর মাশুল দিতে অস্বীকৃত হল, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিল যে বাঙালীদের কাছ থেকে মাশুল অবশ্যই নিতে হবে। 'Selfishness has rarely ventured to display itself under so thin a veil as was believed sufficient on this occasion to disguise'.[১] এই অন্যায় আবদার কাশেম আলীর মনঃপূত হল না। তাই চক্রান্ত করে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল সিংহাসন থেকে। এদিকে কোলকাতায় ট্রেডিং এসোসিয়েসন নামে একটা বণিকসভা স্থাপিত হল। কোম্পানীর প্রায় সকল ইংরাজ কর্মচারী হল এই বণিকসভার সভ্য। নিয়ম হল যে, দেশের মধ্যে যত লবণ, তামাক আর সুপারি উৎপন্ন হবে তা সরাসরি দেশীয় কোন বণিককে বা জনসাধারণকে বিক্রী করা চলবে না। এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য কেবলমাত্র বণিকসভাকে বিক্রী করতে হবে। পরে বণিকসভা তা বিক্রী করবে দেশীয় বণিকদের কাছে। এদের কাছ থেকে জনসাধারণ কিনতে পারবে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বণিকসভা উৎপাদকের কাছ থেকে একশ মন লবণ কিনত পঁচাত্তর টাকায়, আর সেই লবণ পাঁচশ টাকায় বিক্রী করত দেশীয় বণিকদের কাছে। এই অত্যাচারের ছাড়পত্র স্বরূপ নবাবকে বাধ্য করে তাঁর স্বাক্ষরিত পরওয়ানা বার করা হল। সেই পরওয়ানায়

১। Thorton's History of British Empire in India

লবণ নির্মাতাদের নির্দেশ দেওয়া হল যে তারা একমাত্র এই বণিকসভা ছাড়া আর কাউকে লবণ বিক্রী করতে পারবে না এবং প্রত্যেককে এই মর্মে মুছলিকা দিতে হবে। মুছলিকা না দিলে অথবা নির্দেশমত কাজ না করলে তাকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া হবে। এর পরই শুরু হল অকথ্য অত্যাচার। ইংরাজ বণিকদের ক্ষমতাদৃপ্ত যথেচ্ছাচারের সঙ্গে দেশীয় গোমস্তাদের নীচ অর্থলোলুপতা মিলে আবার সেই শত শত দাস সৃষ্টির মহোৎসব। সেই অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের জন্য নালিশের ভয় দেখান, সেই অভিযোগ, সিপাহী-পাইক, অত্যাচার-লুণ্ঠন, নারী-নির্যাতন, আর শত শত জনসাধারণকে পথের ভিখারী করে দেওয়া। লবণের কুঠির গোমস্তা অথবা নিমকের দারোগা সেদিন পল্লীবাংলার নিরীহ মানুষদের কাছে ছিল সাক্ষাৎ যমের যমজ সহোদর।

আসলে এই সমস্তর মূলে ছিল বেনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুর্নিবার লোভ। জাফর আলীর সঙ্গে সন্ধির সর্ত অনুসারে বিজয়ী ইংরাজ প্রসারিত করল তার লোলুপ হস্ত। মুর্শিদাবাদের ভাণ্ডার শূন্য করে দিয়েও লোভের সে মুঠি পূর্ণ হল না। তাই নিরুপায় নবাবের লক্ষ্য পড়ল নিরীহ প্রজাকুলের উপর। শোষণের যন্ত্রটাকে সক্রিয় করা হল আরও নির্মমভাবে। ভূমির রাজস্ব বেড়ে চলল উত্তরোত্তর। প্রজাদের দুর্দশা চরমে উঠল। ১৭৬৫ সালে মীরজাফর মারা গেলেন। ঐ সালেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পেল বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ। কিন্তু সুচতুর কোম্পানী প্রকাশ্যভাবে শাসনমঞ্চে অবতীর্ণ হল না। ১৭৬৭ সালে সিলেক্ট কমিটিকে ক্লাইভ এক পত্রে এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'to appoint the Company's servants to the office of collectors or to do any act by any exertion of English power which can be equally done by the Nabab, would be throwing off the mask and declaring the company soubah (Government) of the province'.[১] তাই রাজস্ব আদায়ের ভার পড়ল মহম্মদ রেজাখাঁর উপর। ইংরাজের কৃপাপ্রার্থী রেজাখাঁ প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য নিরঙ্কুশভাবে নির্মম হয়ে উঠলেন রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে। উৎপীড়ন আর অত্যাচারের স্রোত বহে গেল সারা দেশে। মূর্তিমান অভিশাপের মত আবির্ভূত হলেন রাজা দেবী সিংহ।

১। Hunter's Annals of Rural Bengal.

সম্ভ্রান্ত জমিদারের মর্যাদা পাইকের বেপরোয়া লাঠির আঘাতে ভেঙে গুঁড়ো ধুলো হয়ে গেল। কাছারীর প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য দিবালোকে চরমভাবে লাঞ্ছিতা হল শতশত রমণী। শোকে, দুঃখে, কষ্টে, অত্যাচারে, ভয়ে, আতঙ্কে কত কোমল, পবিত্র, শান্ত, নির্বিবাদী জীবন পাগল হয়ে গেল। চারিদিকে নামল বিভীষিকার করাল ছায়া। তারপর এক দারুণ হাহাকারে ভেঙে পড়ল ১৭৭০ সালে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের মূর্তি নিয়ে। ইতিহাসে আজও সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এক সীমাহীন আতঙ্কের ভয়াল দৃষ্টান্ত। 'All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle, they sold their implements of agriculture, they devoured their seed-grain, they sold their sons and daughters, till at length no buyer of children could be found. They ate the leaves of the trees and the grass of the field and in June 1770 the Resident at the Durbar affirmened that the living were feeding on the dead.'[১] সমগ্র দেশটাই একটা বিরাট শ্মশানে পরিণত হল। বেনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার কৌশলপূর্ণ প্রণালীবদ্ধ অত্যাচারের মধ্যদিয়ে সমগ্র দেশটাকে একটু একটু করে নিজের আয়ত্বে নিয়ে এল। পলাশীযুদ্ধের পরই বাংলার মসনদে সে বসেনি। অত তাড়াতাড়ি মুখোশ খুলে ফেলার মত দুর্বুদ্ধি তার জাগেনি। তাই নবাবকে সামনে রেখে সে তার আপন অধিকারের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার কাজে এগিয়ে গেছে। একটু একটু করে দেশীয় বাণিজ্য ধ্বংশ করে নিজেদের ব্যবসার প্রসার করেছে। ক্ষমতাশালী প্রভাবশালী জমিদারদের পৈতৃক জমিদারী থেকে উৎখাত করে পথের ভিখারী করে দিয়েছে, যাতে করে তারা না কোনদিন কোম্পানীর বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারে। এদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছে একদল কুচক্রী, নীচ, স্বার্থপর ব্যক্তিদের, যারা অর্থের পায়ে ধর্ম, বিবেক, মনুষ্যত্বকে বলি দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে ইংরাজের কাছে। দেশের শ্রমজীবী আর উৎপাদকদের জোর করে দাদন দিয়ে মুছলিকা লিখে নিয়ে পদানত করেছে। নবাবকে বাধ্য করে, প্রভাবিত করে, তার সাহায্য নিয়ে ডাচ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজদের ব্যবসা ধ্বংশ করেছে। এই ভাবে সমগ্র দেশ যখন তার করায়ত্ত, তখনই একদা সে তার মুখোশ ফেলেছে

১। Hunter's Annals of Rural Bengal.

খুলে। 'on the 4th of May 1772, the East India Company, by a solemn act, stood forth, as the visible governors of Bengal'.[১]

কোম্পানীর অধিকার ঘোষিত হল বাংলা দেশে ; শুরু হল নূতন যুগ। বাংলার নবাবী আমলের শেষ হল। এতদিন দ্বৈতশাসনের যে প্রহসন চলছিল তারও সমাপ্তি ঘটল। কোম্পানী হল বাংলার একচ্ছত্র শাসনকর্তা। সমগ্র দেশের জনসাধারণ হল কোম্পানীর দাস। মুর্শিদাবাদে নবাবের বংশধর থেকে শুরু করে সামান্যতম প্রজার জীবনধারণ নির্ভর করে রইল ইংরাজের অনুগ্রহের উপর। বেনিয়া কোম্পানীর রাজত্বে বাঙালী হল আত্মবিস্মৃত গোলাম।

ধাপে ধাপে বাঙালী জীবন এগিয়ে গেছে অবক্ষয়ের পথে। তাই তার জীবনের সর্বঅঙ্গেই নিদারুণ বিকৃতি। হিন্দুধর্ম তার সুমহান ঐতিহ্য হারিয়ে হয়েছে নির্মম-ভাবে রক্ষণশীল। তার পায়ে পায়ে কুসংস্কারের শিকল বাঁধা। শাস্ত্রচর্চার পুণ্য প্রহর হয়েছে অন্তর্হিত ; শুরু হয়েছে শুষ্ক আচারের অনুবর্তন। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম নেমে এসেছে কর্তাভজা আর নেড়ানেড়ীর দলের মধ্যে। প্রতিটি আখড়া হয়ে উঠেছে বিকৃত যৌনকামনার লীলাভূমি। তান্ত্রিক সাধনার বহিরঙ্গ কুহকের মত আকর্ষণ করেছে জনসাধারণকে। জীবনে সার হয়েছে, 'বামে বামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্'। ধর্মের নামে সর্বত্র ব্যভিচার আর অত্যাচারের স্রোতধারা। গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন, জগন্নাথের রথের চাকার তলায় আত্মহত্যা আর সদ্য-বিধবাকে স্বামীর জলন্ত চিতায় জোর করে পুড়িয়ে মেরে সমগ্র জাতির মহোল্লাস। জীবনে কোন চিন্তা নেই যা মহৎ, কোন কর্ম নেই যা কল্যাণকর। শিক্ষা শুধু অক্ষর পরিচয়। সাহিত্য শুধু পাঁচালী, তরজা, ঝুমুর আর হাফআখড়াই। আবার এতেও তৃপ্তি নেই ; রুচির টানে প্রতি আসরে কিছুক্ষণ খেউড় না গাইলে শ্রোতার মন ওঠেনা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে সমগ্র জাতির জীবন জুড়ে শুধু ঘন কালো অন্ধকারের জমাট বিভীষিকা।

এরপরও ইতিহাস আছে। ইতিহাসের চাকা থেমে থাকে না, সে চলে। সেই চলার টানে এই অন্ধকারও সরতে থাকে। ১৭৭২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হল এদেশের সর্বময় কর্তা। সুতরাং এখন থেকে শুধু শোষণ করলেই

১। Hunter's Annals of Rural Bengal.

চলবে না, সেইসঙ্গে শাসনও করতে হবে। ওয়ারেন হেষ্টিংস হলেন প্রথম গভর্নর জেনারেল। ১৭৭৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হল। ১৭৯৫ সালে বেনারসে গড়ে উঠল সংস্কৃত কলেজ। শাসনের সুবিধার জন্য বিলাত থেকে সদ্য আগত সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। আবার এদিকে বাইবেল হাতে গুটি গুটি এসে শ্রীরামপুরে বাসা বাঁধলেন মিশনারীরা। এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার হল তাঁদের ব্রত। কোম্পানী চাইল দেশ শাসন করতে আর মিশনারীরা চাইলেন খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে। এই উভয় চাহিদার পরোক্ষ ফলে কল্যাণের বীজ উপ্ত হল বাংলার মাটিতে। এখন থেকে ভাগ্য অন্বেষণের আশায় পিতৃমাতৃ পরিত্যক্ত ইংরাজ যুবকরাই কোম্পানীর কর্মচারী হয়ে এল না; শিক্ষা, জ্ঞান, মনুষ্যত্বকে সঙ্গে নিয়ে সাগরে পাড়ি দিলেন বহু সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহোদয়। এদেশের বন্ধ জানালার অর্গল গেল খুলে। পশ্চিমের আলো হাওয়ায় অভিসিক্ত হল তার লুপ্তপ্রায় চেতনা। পশ্চিম জগতে তখন জীবনের সবুজ সূচনা। তার সতেজ প্রাণচাঞ্চল্য মানুষের কল্যাণ সাধনায় নিয়োজিত। এই সাধনার ঢেউ একে একে আঘাত হানল বঙ্গপোসাগরের কূলে। পশ্চিমের শিক্ষা, জ্ঞান, এবং মানবহিত সাধনার আলোকে বাংলা দেশের যে মানুষটির চিত্ত নূতন দীপ্তিতে প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তিনি হলেন রামমোহন। এই নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাকালেন দীর্ঘদিনের সঞ্চিত জড়তা ও অন্ধ সংস্কারের অচলায়তনে অবরুদ্ধ আত্মবিস্মৃত নিজের দেশের দিকে। জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে দুহাতে সরিয়ে দিলেন প্রাণহীন অন্ধকারের দুঃসহ গুরুভার। শাস্ত্রকে মুক্ত করলেন উপশাস্ত্রের জঞ্জাল থেকে। ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করলেন মিথ্যা আচারের জাল দীর্ণ করে। স্বার্থ আর সংস্কারের ব্যগ্র মুঠি আলগা করে সমাজের সামনে রাখলেন মানবহিতের আদর্শ। দারিদ্র্যের লজ্জা থেকে তুলে এনে দেশবাসীকে দিলেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মন্ত্র। পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন শিক্ষার অঙ্গনে। জাতির জীবনে দিলেন স্বাধিকার সচেতনতা। অন্ধকারের রাত্রিশেষে দেখা দিল নবজাগরণের মঙ্গলপ্রভাত।

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

একদা এক চিঠির স্বল্প পরিসরে অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে একান্ত সংক্ষিপ্তাকারে রামমোহন তাঁর আত্মজীবনীর খসড়া লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখ এত সামান্য যে নেই বললেই চলে। অবশ্য একথা সত্য যে তাঁর রচনায় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অবতারণার সুযোগ ছিল না; এবং একান্ত স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা যায় যে বিভিন্ন কর্মে ব্যস্ত রামমোহনের জীবনে নিজের জীবনকথা বলার সময়ও ছিল না।

রামমোহনের মৃত্যু হয় বিলাতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে। ৫ই অক্টোবর তারিখে বিলাতের এথিনিয়ম পত্রিকায় তাঁর সেক্রেটারী স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট পত্রাকারে লিখিত রামমোহনের ঐ আত্মজীবনীটি প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'The Rajah gave this brief sketch of his life shortly before he proceeded to France in the autumn of last year (1832),' এরপর ঐ চিঠিটি বিভিন্ন পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। মিস্ কার্পেণ্টার তাঁর 'The last days in England of the Rajah Rammohun Roy' গ্রন্থে এই চিঠিটি মুদ্রিত করেন এবং এই প্রসঙ্গে লেখেন, 'The letter may be considered as addressed to his friend Mr. Gordon, of Calcutta.' মিস্ কার্পেণ্টারের অনুমানের পশ্চাতে কী কারণ ছিল তা তিনি উল্লেখ করেন নি। কোলকাতায় অবস্থানকালে জনৈক গর্ডন সাহেবের সঙ্গে রামমোহনের বন্ধুত্ব ছিল। রামমোহন যখন উইলিয়ম এ্যাডামের সঙ্গে ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন তখন এই গর্ডন ছিলেন একজন সভ্য। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখের বেঙ্গল হরকরায় ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান মিশনের এক সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় সেখানে গর্ডনের উল্লেখ দেখা যায়। গর্ডন সাহেব ছিলেন ম্যাকিণ্টস্ এণ্ড কোম্পানীর একজন অংশীদার। শুধু রামমোহন নন দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। রামমোহন যখন বিলাতে ছিলেন তখন এই ম্যাকিণ্টস্ এণ্ড কোম্পানী ছিল তাঁর এজেণ্ট। এই সূত্রে বিলাতে

অবস্থানকালেও গর্ডনের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। এই সময় যে তাঁর সঙ্গে রামমোহনের পত্র বিনিময় চলত তার উল্লেখ পাই রাধাপ্রসাদকে লেখা রামমোহনের ১৮৩২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে।

রামমোহনজীবনীর অপর এক লেখিকা মিস্ কলেট কিন্তু রামমোহনের আত্ম-জীবনীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর 'Life and Letter of Raja Rammohun Roy' গ্রন্থে এই লেখাটিকে 'spurious' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেন যে এই আত্মজীবনীর খসড়াটিকে নকল হিসাবে গণ্য করা হবে তার কোন কারণ তিনি দেন নি। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, 'Whether the Rajah wrote or dictated the whole of it may be doubted, but to reject the whole as a fabrication would be going much too far'.[১] সুতরাং লেখাটি স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। মূল পত্রটি ইংরাজীতে রচিত। নিম্নে তার অনুবাদ[২] লিখিত হল।

"প্রিয় বন্ধু

আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিবার জন্য আপনি আমাকে সর্বদাই অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে আমি আহ্লাদের সহিত আমার জীবনের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিতেছি।

আমার পূর্ব্ব-পুরুষেরা উচ্চ 'শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় এক শত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ-দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, কখনও পতন; কখন ধনী,

১। Biographical Essays.

২। অনুবাদটি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত।

কখন নির্ধন ; কখন সাফল্যলাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ-বংশীয়েরা কৌলিক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযাজক-ব্যবসায়ী ; এবং উক্ত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তাঁহাদিগের পরিবারের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীস্থ অপর কেহই ছিলেন না। তাঁহারা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্ম চিন্তাতে অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা, তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।

আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান রাজসরকারে কার্য্য করিতে হইলে উক্ত দুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই ; হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত।

ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে, আমার পিতা আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিলেন ; —আমি পুনর্ব্বার তাঁহার স্নেহ লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইউরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানলাভ করিলাম। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিক দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম ; তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহাদিগের শাসন বিদেশী শাসন হইলেও উহা দ্বারা শীঘ্র দেশবাসীগণের অবস্থোন্নতি হইবে। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসপাত্র ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি

হস্তক্ষেপ করাতে আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল ; এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার প্রতি পুনরায় বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেকপ্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, দুই তিন জন স্কটল্যাণ্ডবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাঁহারা যে জাতির অন্তর্গত তাঁহাদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ।

আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কোন দিন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মতবিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্ত্বেও, আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় ইউরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবৃদ্ধি হয়, সে পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবীরাজ্যশাসন ও ভারত-বাসিগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপিল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীদের নিকট আবেদন করিবার জন্য তিনি আমার প্রতি ভারার্পন করেন। আমি তদনুসারে ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে আসিয়া উত্তীর্ণ হই।

আমি আশা করি, এই বৃত্তান্তটি সংক্ষিপ্ত হইল বলিয়া আপনি ক্ষমা করিবেন ; কেননা এখন বিশেষ বিবরণ সকল লিখিবার আমার অবকাশ নাই।

রামমোহন রায়”

॥ দুই ॥

রামমোহনকে ব্যঙ্গ করে একসময় একটি গান প্রচলিত হয়েছিল। তার কিছু অংশ এইরূপ :

> সুরাইমেলের কুল
> বাড়ী খানাকুল
> ওঁ তৎসৎ বলে এক
> বানিয়েছে স্কুল।

উদ্ধৃত অংশ থেকে জানা যায় রামমোহন ছিলেন সুরাইমেলের কুলীন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ১৩০৩ সালের আশ্বিন মাসের 'নব্যভারত' পত্রিকায় বহুদিনের শ্রমে ও যত্নে রামমোহনের বংশতালিকা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। এই তালিকায় রামমোহনের ঊর্ধ্বতন ছাব্বিশ পুরুষের নাম আছে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মত হল : রামমোহন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এবং ভট্টনারায়ণ অন্বয়ে সঞ্জাত। ভট্টনারায়ণই সর্বপ্রথম কনোজ থেকে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। এখানে একাদিক্রমে বার পুরুষ বসবাস করার পর ত্রয়োদশ পুরুষ সংকেত পূর্ব বাংলার বাঙ্গালপাস নামক স্থানে বাসস্থান পরিবর্তন করেন। তারপর সেখান থেকে অষ্টাদশ পুরুষ গোবিন্দ চলে আসেন মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেনীপুর গ্রামে। বেণীপুর থেকে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামে আসেন কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্র হলেন এই বংশের চতুর্বিংশ পুরুষ।

বিদ্যানিধি মহাশয় যেমন রামমোহনের একটি সুদীর্ঘ বংশ তালিকা সংগ্রহ করেছেন, তেমনি History of Brahmo Samaj গ্রন্থে লিওনার্ড সাহেব আবার পৃথক এক বংশতালিকার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মত হল, চৈতন্য-শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর হলেন রামমোহনের পূর্বপুরুষ। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে এ তথ্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করে লিখেছেন, 'আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি যে একথার কোন মূল নাই।'

রামমোহনের আত্মজীবনীর খসড়া থেকে জানা যায় যে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সে যুগের অন্যান্য ব্রাহ্মণ পরিবারের মত যজন-যাজনই

ছিল তাঁদের কৌলিক বৃত্তি। হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব অনুসারে সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মাধ্যমে পরমার্থচিন্তাই হল জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সেই হিসাবে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা, বিশেষতঃ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা জীবনের এই শ্রেষ্ঠ আদর্শকেই গ্রহণ করেছিলেন। অর্থের মোহ তাঁদের চিত্তে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারেনি। তারপর বাংলায় যখন নবাবী আমল শুরু হল তখন দিল্লীর মোঘল দরবারের অনুকরণে সেখানেও এল বিলাসের স্রোত। নবাব দরবারের সেই সুখ, ঐশ্বর্য, সেই ভোগপিপাসা সাধারণের জীবনের মধ্যেও ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হল। অবশেষে ব্রাহ্মণরাও প্রলুব্ধ হলেন। পরমার্থচিন্তার পরমানন্দ জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাকে আর চেপে রাখতে পারল না। তাই তাঁরাও পার্থিব সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন।

রামমোহনের পূর্বপুরুষদের মধ্যে তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম ধনসম্পত্তির আকর্ষণ অনুভব করেন। তাই তিনি ধর্ম সম্বন্ধীয় কার্য পরিত্যাগ করে বৈষয়িক উন্নতির প্রতি অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। সেযুগে নবাব সরকারে, বিশেষ করে তার রাজস্ব বিভাগে চাকরি গ্রহণই ছিল বৈষয়িক উন্নতির রাজপথ। প্রয়োজনীয় বুদ্ধি, নিষ্ঠা আর সুযোগসন্ধানী তৎপরতার সঙ্গে চাকরি করলে অসম্ভব ছিল না অল্পদিনেই জমিদার অথবা তালুকদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কৃষ্ণচন্দ্র তাই বৈষয়িক সুখের আশায় নবাব সরকারে চাকরি নিলেন। তারপর আপন দক্ষতার পরিচয় দিয়ে নবাবের কাছ থেকে পেলেন 'রায় রায়ান' উপাধি। এই উপাধি সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর পদবীতে স্থান করে নিল। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তিনি হলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। এ ছাড়াও আর একটি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্রের আদি বাসস্থান ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার শাঁকসা গ্রামে। চাকরির প্রয়োজনে এবং, কিংবদন্তী আছে, আর একটি কারণে তাঁর নূতন বাসস্থান হল খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগর গ্রাম। কিংবদন্তীটি এইরূপ :— বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র রায় মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে বর্ধমানের জমিদারী ইজারা নেন। তাঁর কাছ থেকে আবার কিছু অংশ ইজারা নেন খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অনন্তরাম চৌধুরী। এই অনন্তরাম ছিলেন যেমন তেজস্বী, তেমন প্রভাবশালী। তিনি বর্ধমানের রাজার নিকট নিয়মিত কর দিতেন না। অথচ নবাবের কাছে দেয় করের দায়িত্ব ছিল বর্ধমানের রাজার উপর। তাই

তিনি নবাবের কাছে একজন উপযুক্ত কর্মচারী প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনার উত্তরেই কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন। কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথের মূর্তি দেখে কৃষ্ণচন্দ্রের বৈষ্ণব মন পুলকিত হয়। তাই তিনি নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামেই বসবাস শুরু করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র এই পরিবারের জীবন ও জীবিকার ধারাকে যে নূতন পথে চালিত করেন সেই পথ ধরেই চলেছিলেন তাঁর তৃতীয় পুত্র ব্রজবিনোদ। দক্ষ কর্মচারী হিসাবে নবাব সরকারে পিতার ন্যায় তাঁরও যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাছাড়া দিল্লীর বাদশা দ্বিতীয় শাহ্ আলম যখন পূর্বদেশে ছিলেন তখন তাঁর কাছে থেকে তিনি যথেষ্ট কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন। দীর্ঘদিন পরে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় রামমোহনকে লেখা দিল্লীর বাদশার একটি চিঠিতে। তবুও ব্রজবিনোদ সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী হল, নবাব কর্তৃক অপমানিত হওয়ায় তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। ব্রজবিনোদের পঞ্চম পুত্র রামকান্ত সম্বন্ধেও দেখা যায় এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। কিন্তু উভয়ের কর্ম পরিত্যাগ সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া রামকান্ত যে নবাব সরকারে চাকরি করতেন তারও কোন স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। শেষজীবনে রামকান্ত কয়েকটি মামলায় জড়িয়ে পড়েন। এই সময় বোর্ড অব রেভিনিউ এবং বর্ধমান কালেক্টরের পত্রের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে রামকান্তকে বলা হয়েছে, 'most respectable man in the district' এবং 'a man of substance and respectibility.' কিন্তু তিনি যে কোন দিন নবাব সরকারে চাকরি করতেন তার কোন উল্লেখ নেই। রামকান্তর চাকরি না করার পক্ষে এছাড়াও আর একটি প্রমাণ আছে। ১৮০৯ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে রামমোহন একটি আবেদন করেছিলেন লর্ড মিণ্টোর কাছে। সেই আবেদনে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের পরিচয় প্রসঙ্গে লেখেন, 'your petitioner's grandfather was at various times, chief of the different districts during the administration of His Highness Nawab MohabatJung, and your petitioner's father for several years, rented a farm from Government the revenue of which was lakhs of rupees.' রামকান্ত যদি নবাব সরকারে চাকরি করতেন তাহলে রামমোহনের আবেদনে নিশ্চয়ই তার উল্লেখ থাকত।

রামমোহন তাঁর আবেদনে পিতৃপরিচয় প্রসঙ্গে যে কথা লিখেছিলেন অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে আছে সেই তথ্যের সমর্থন। রামকান্ত তাঁর নিজের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন, কোম্পানীর কাছ থেকে তালুক ইজারা নিয়েছিলেন, আর সেই সঙ্গে ছিলেন বর্ধমানের মহারাণী বিষণকুমারীর মোক্তার। মহারাণীর বিষয়-সম্পত্তির উপর তাঁর ছিল 'uncontrolled management,'—এটি বর্ধমানের কালেক্টরের মত। আসলে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকেই এই রায় পরিবারের সঙ্গে ঐ রাজপরিবারের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'কৃষ্ণচন্দ্র এবং ব্রজবিনোদ উভয়েই বর্ধমানের মহারাজা জগৎচন্দ্র ও কীর্তিচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে বহু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর পান। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও বর্ধমানের বৃত্তিভোগী, ইজারাদার এবং কর্মচারী ছিলেন।'

রামকান্তর তিনটি স্ত্রী—সুভদ্রাদেবী, তারিণীদেবী ও রামমণিদেবী। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী তারিণীদেবীই রামমোহনের জননী। তারিণীদেবী শাক্ত কুলের কন্যা; অথচ রামকান্ত ছিলেন পরম বৈষ্ণব বংশের সন্তান। সে-যুগে শাক্ত আর বৈষ্ণবের মধ্যে বিবাহের চলন ছিল না সচরাচর। তাই এই বিবাহকে কেন্দ্র করে একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে। কাহিনীটি এইরূপ: রামকান্তর পিতা ব্রজবিনোদ অন্তিমকালে গঙ্গাতীরস্থ হলে শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী ছাতরা গ্রামের জনৈক শ্যাম ভট্টাচার্য তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং ব্রজবিনোদের যে কোন একটি পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্যাম ভট্টাচার্য শাক্ত, তার উপর ভঙ্গ কুলীন। তবুও অন্তিমকালে ব্রাহ্মণকে বিমুখ করা ব্রজবিনোদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি একে একে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে; কিন্তু সম্মত হলেন না কেউই। অবশেষে রামকান্ত এগিয়ে এলেন পিতার বাসনা পূর্ণ করতে। শ্যাম ভট্টাচার্যের কন্যা তারিণীদেবীর সঙ্গে রামকান্তর বিবাহ হল।

এই কাহিনীটিকে সমান মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন মিস্ কলেট ও নগেন্দ্রনাথ তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণায় দেখা যায় এটি সত্য নয়। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার ১৩৪১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রজবিনোদের স্বহস্ত লিখিত একটি দানপত্রের ফটোস্টাট প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছেন। এই দানপত্রটি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রামকিশোরের উদ্দেশে রচিত। এতে তারিখ আছে ১১৮৬

সাল তাং ১৭ই বৈশাখ; অর্থাৎ এটি লিখিত হয়েছে ১৭৭৯ সালের মে মাসে। কিন্তু এর বহু পূর্বেই তারিণীদেবীর সঙ্গে রামকান্তর বিবাহ ত দূরের কথা রামমোহনেরও জন্ম হয়েছে। সুতরাং ব্রজবিনোদের অন্তিমকালে এমন একটি নাটকীয় পরিবেশে রামকান্তর সঙ্গে তারিণীদেবীর বিবাহের সম্বন্ধ যে হয়নি তা নিশ্চিত। অবশ্য এই কাহিনীটির আর একটি বক্তব্য আছে, তা হল রামকান্তর পিতৃভক্তি।

রামকান্তর প্রথম স্ত্রী সুভদ্রাদেবী ছিলেন নিঃসন্তান। সম্ভবতঃ সেই কারণেই গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন তারিণীদেবী। রায় পরিবারে তারিণীদেবী পরিচিত ছিলেন 'ফুল ঠাকুরাণী' নামে। শাক্তবংশের কন্যা হলেও বিবাহের পর তিনি শ্বশুরবাড়ীর ধর্মবিশ্বাসকে আপন করে নিয়েছিলেন। চরিত্রমাধুর্যের গুণে সংসারের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের প্রপৌত্রী হেমলতা দেবী তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন: 'মহাতেজস্বিনী রামমোহন-জননী সাধারণ নারী ছিলেন না।······বিষয়বুদ্ধি ছিল তাঁর এতই প্রখর যে স্বামী জমিদারীর কাজ চালাতেন তাঁর পরামর্শ নিয়ে। বৈধব্যে তিনি স্বয়ং জমিদারী পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। জমিদার-সংসারের কর্মচারীরা সময়ে সময়ে তাঁর আইন সংক্রান্ত কূট প্রশ্নে বিস্মিত ও চমকৃত হত, শোনা যায়। একনিষ্ঠ দেবভক্তি তাঁর এতই প্রবল ছিল যে, দেবতার নামে প্রাণসম পুত্র রামমোহনকে বিধর্মী জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছিলেন।' তারিণীদেবী ছিলেন সুন্দরী, তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী। রামমোহনের প্রায় প্রত্যেকটি জীবনচরিতকারই তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে রামমোহনের চরিত্রের অনেকগুলি সদ্‌গুণই তাঁর জননীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

রামকান্তর তৃতীয় স্ত্রী রামমণিদেবীর একটি মাত্র পুত্র, রামলোচন। তারিণী দেবীর দুই পুত্র, জগমোহন ও রামমোহন। এছাড়া তাঁর একটি কন্যাও ছিল। কিন্তু ঐ কন্যা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এমন কি তাঁর নামেরও কোথাও উল্লেখ নেই। নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'শ্রীধর মুখোপাধ্যায় নামক এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহিত কন্যাটির বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের পিতা ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁর পুত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় রামমোহনের প্রথম শিষ্য।' রামমোহনের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রে

গোবিন্দপ্রসাদের যে মামলা হয় সেই মামলায় গুরুদাস ছিলেন একজন সাক্ষী। তাঁর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, তিনি রামকান্তর কন্যার সন্তান। রামকান্তর রাধানগরের বাড়ীতেই তাঁর জন্ম হয়। ১৮১৯ সালে এই মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল বত্রিশ বৎসর অথবা তার কাছাকাছি। সুতরাং গুরুদাসের জন্ম হয় আনুমানিক ১৭৮৭ সালে। গুরুদাস রামকান্তর সঙ্গে রাধানগরের বাড়ীতেই থাকতেন। পরে রামকান্ত যখন লাঙ্গুলপাড়ায় বাসস্থান পরিবর্তন করেন তখন অন্যান্যদের সঙ্গে গুরুদাস নূতন বাড়ীতে আসেন। কিন্তু গুরুদাসের মাতার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু দীর্ঘদিন পরেও গুরুদাসের পিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। জগমোহনের মৃত্যুসংবাদ তিনিই গুরুদাসকে রংপুরে পত্র দ্বারা জানান। অথচ তিনি যে রামকান্তর পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতেন তার কোন উল্লেখও নেই। সুতরাং মনে হয়, গুরুদাসের মাতা অর্থাৎ রামকান্তর কন্যা গুরুদাসের জন্মের অল্পকাল মধ্যেই মারা যান এবং মাতৃহীন এই দৌহিত্রকে রামকান্তই লালনপালন করেন আপন আশ্রয়ে।

রামমোহনের জন্মবৎসর আজও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয়নি। ভবিষ্যতেও যে হবে সে আশাও দুরাশামাত্র। অথচ রামমোহন এ-যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী। প্রচুর বাধা-বিপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশে এবং বিদেশে শ্রদ্ধা এবং সম্মানের বহু সুদুর্লভ মাল্যরাজীতে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। বহু জ্ঞানী-গুণীর অন্তরে পেয়েছিলেন সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি। অথচ কেউই তাঁর সঠিক জন্মতারিখটি লিপিবদ্ধ করে যান নি। এমন কি তাঁর কৃতী সন্তানগণও এবিষয়ে আশ্চর্যভাবে নীরব। তাই রামমোহনের জন্মবৎসর সম্বন্ধে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক মত। এদের মধ্যে যে দুটি সর্বাধিক প্রচলিত তা হল, ১৭৭২ সাল ও ১৭৭৪ সাল। প্রামাণিক উল্লেখের অভাবে যুক্তি-বিচারের সাহায্যে একটিকে গ্রহণ করা ছাড়া এখন আর উপায় নেই।

রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। তার কিছু পরে (shortly after Raja's death) ডাঃ কার্পেন্টার রামমোহনের জীবন-চরিতের একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। রামমোহনের প্রবাসজীবনে ডাঃ কার্পেন্টার ছিলেন একজন ঘনিষ্ঠ সহচর। তিনি লিখেছেন, 'Rammohun was born most probably about 1774.'

হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ জেমস্ সাদারল্যাণ্ড ছিলেন রামমোহনের একজন

বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি রামমোহনের সঙ্গে একই জাহাজে বিলাত যান। রামমোহন সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথা ১৮৩৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়। সেই স্মৃতিকথার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'In his latter part of life, which closed in his sixtieth year……'.যদি ষষ্টিতম বৎসরে রামমোহনের জীবন শেষ হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর জন্মবৎসর হয় ১৭৭৪ সাল।

শ্রীকিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৪৫ সালের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় রামমোহন সম্বন্ধে লিখেছেন, 'He was born in 1774.'

শ্রীকেশব চন্দ্র সেন ১৮৬৫ সালে পাক্ষিক 'ইণ্ডিয়া মিরর' পত্রিকায় রামমোহন প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন,'……died in Aswin 1755 (1833) in the sixtieth year of his age.' সাদারল্যাণ্ডের সঙ্গে কেশবচন্দ্র একমত। সুতরাং এখানেও রামমোহনের জন্মবৎসর পাই ১৭৭৪ সাল।

রামমোহনের কর্মজীবনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রিষ্টলে তাঁর যে সমাধিমন্দির তৈরী করেন সেখানে ১৮৭২ সালে প্রস্তরফলকে খোদিত হয় : 'He was born in Radha-nagar, in Bengal in 1774 and died at Bristal, September 27th 1833.'

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। ঐ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকের শেষভাগে (১৭৭৪ খ্রী: অ:) জন্মগ্রহণ করেন।' পাদটীকায় এ প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, 'তাঁহার অধিকাংশ চরিতাখ্যায়ক ১৭৭৪ খ্রী: অ: কে জন্মবৎসর বলিয়াছেন, এবং অনুসন্ধানে তাহাই ঠিক বলিয়া প্রতীত হইল।'

এরপর ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'Life and Letters of Raja Rammohun Roy' গ্রন্থে মিস্ কলেট লিখেছেন, 'Rammohun Roy was born……on the 22nd may, 1772.' ১৭৭৪ সালটি রামমোহনের জন্মবৎসর হিসাবে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কেন যে তিনি ভিন্ন একটি তারিখ গ্রহণ করেছেন তার কারণ উল্লিখিত হয়েছে পাদটীকায়। কারণটি হল : ১৮৮০ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে Sunday Mirror পত্রিকায় রেভারেণ্ড সি, এইচ, এ, ডাল লিখিত একটি চিঠি

প্রকাশিত হয়। চিঠিতে ডাল সাহেব লেখেন যে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ ১৮৫৮ সালে কোলকাতায় তাঁর বাড়ীতে কয়েকজন বন্ধু এবং মক্কেলের উপস্থিতিতে বলেন যে তাঁর পিতা জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭২ সালে। মিঃ ডাল অতঃপর তাঁকে জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কিন্তু রমাপ্রসাদ তা বলতে পারেননি। অপর এক সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদও এই তথ্য সমর্থন করেছে। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় মিস্ কলেটকে জানান যে রামমোহন ১৭৭২ সালের ২২শে মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান যে একথা তিনি শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে এবং রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন রামমোহনের প্রদৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। মিস্ কলেট তাই তারিখটি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছেন।

স্মুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৮৩৩ সালে রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে ১৯০০ সালে মিস্ কলেটের গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রামমোহনের জন্মবৎসর হিসাবে ১৭৭৪ সালটিই ছিল প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। এই সময়ের মধ্যে রামমোহনের বহু বন্ধু, ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, নিকট আত্মীয়স্বজন জীবিত ছিলেন। যদি ১৭৭৪ সালটি রামমোহনের জন্মবৎসর না হত তাহলে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতেন। আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব না হলেও রামমোহনের দুই পুত্র পিতার জন্মবৎসর নিশ্চয়ই জানতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা দেশবাসীর কাছে প্রচারিত ভুল তথ্যটি সংশোধন করে সঠিক জন্মবৎসরটি নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ করে যেতেন। কিন্তু যতদূর জানা গেছে, তেমন কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। একমাত্র ডাল সাহেবের চিঠি থেকে জানা যায় যে রমাপ্রসাদ তাঁর বন্ধুদের সামনে ১৭৭২ সালের উল্লেখ করেছিলেন। রমাপ্রসাদ একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যেকথা ১৮৫৮ সালে বলেছিলেন তা সাধারণের কাছে প্রকাশ পেল ১৮৮০ সালে, যখন রমাপ্রসাদ আর বেঁচে নেই। স্মুতরাং এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে। প্রথমতঃ, রমাপ্রসাদ সত্যই একথা বলেছিলেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের ভুল জন্মতারিখ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে একথা জেনেও তা উপযুক্তভাবে সংশোধন না করার মত নিশ্চেষ্টতা রমাপ্রসাদের ন্যায় একজন বিদ্বান, গুণী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব কিনা? তৃতীয়তঃ, রমাপ্রসাদ ডাল সাহেবকে লিখিতভাবে কিছু জানাননি। স্মুতরাং

মৌখিক আলাপ-আলোচনাকালে একদা রমাপ্রসাদ যা বলেছিলেন দীর্ঘ ২২ বৎসর পরে ডাল সাহেবের তা যথাযথ স্মরণ থাকা স্বাভাবিক কিনা? রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক ফণীভূষণ মিস্ কলেটকে যা জানিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গেও প্রশ্ন রয়ে যায়। রামমোহনের প্রদৌহিত্র ললিতমোহন যদি জানতেন যে ১৭৭২ সালের ২২শে মে তারিখে রামমোহনের জন্ম হয় তাহলে তিনি কেন সে তথ্য কোন পত্র-পত্রিকা মারফৎ সাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন না? রবীন্দ্রনাথ, যিনি জীবনে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করতেন 'ভারত-পথিক রামমোহন'কে, তিনিও নীরব রইলেন কেন? একজন মনীষীর আবির্ভাবতিথি সমগ্র জাতির কাছে কতখানি মূল্যবান তা তাঁর অজানা ছিল না। তাই ললিতমোহনের কাছ থেকে প্রাপ্ত রামমোহনের জন্ম-তারিখটি যদি তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকতেন, তাহলে সে তথ্য সমগ্র জাতির কাছে প্রচার না করে শুধুমাত্র ফণীভূষণের কাছে কেন বললেন তা রহস্যাবৃত। রামমোহন সম্পর্কে এতখানি অবহেলা কি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব?

তাই মনে হয় রমাপ্রসাদ, ললিতমোহন, রবীন্দ্রনাথ অথবা রামমোহনের বন্ধু, সহকর্মী এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউই যখন প্রচলিত ১৭৭৪ সালের বিপক্ষে প্রকাশ্যভাবে কিছু জানান নি, তখন শুধুমাত্র ডাল সাহেব এবং ফণীভূষণের চিঠির উপর নির্ভর করে প্রায় সর্বজনস্বীকৃত এবং সর্বত্র প্রচারিত এই তথ্যটি অস্বীকার করে ১৭৭২ সালের ২২শে মে তারিখটি গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

তাছাড়া ১৭৭৪ সালের পক্ষে আর একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ইহা রামমোহনের মনিব ও বন্ধু জন্ ডিগবীর দুইটি উক্তি। ডিগবীর উদ্যোগে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে Trans. of an Abridgment of the Vedant······likewise A Trans. of the Cena Upanishad প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি রামমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। তাহাতে প্রকাশ, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের বয়স ৪৩ বৎসর, এবং ডিগবীর সহিত যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। এই দুইটি উক্তি হইতেই রামমোহনের জন্মবৎসর—ইং ১৭৭৪ পাওয়া যায়। ডিগবী ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন, এবং পর বৎসর (ইং ১৮০১) কলিকাতায় রামমোহনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের

জন্মবৎসর ধরিলে, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৭ বৎসর হয়। কিন্তু ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডিগবী এদেশেই আসেন নাই, রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া ত দূরের কথা।"[১]

রামমোহনের জন্মতারিখ প্রসঙ্গে এই সমসাময়িক উল্লেখটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। এসম্বন্ধে মিস্ কলেট তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'Had Rammohun been forty three in 1817 he would have been born in 1774. As this is the date given on his tombstone, it must have been currently accepted one time in India. But as this is indubitably two years later than the true date, all the intermediate dates of his age specified by Mr. Digby must be raised by two years.' রামমোহনের সমাধিফলকে উৎকীর্ণ জন্ম-তারিখ যদি ভুল হয়, তাহলে সমাধিফলক রচিত হওয়ার পর সেই তারিখ অনুসারে যাঁরা রামমোহনের বয়সের হিসাব করেছেন তাঁরা ভুল করতে পারেন। কিন্তু ডিগবীর পক্ষে নিশ্চয়ই সে-ভুল করার সুযোগ ছিল না। ১৮১৭ সালে ডিগবী যখন রামমোহনের বয়সের কথা লিপিবদ্ধ করেন তখন নিশ্চয়ই সমাধি-ফলকে উৎকীর্ণ তারিখ দেখে তা হিসাব করেন নি। তাই রামমোহনের বয়স প্রসঙ্গে ডিগবীর প্রদত্ত হিসাবে কেন যে দুবৎসর যোগ করা হবে তার কোন যুক্তি মেলে না। সুতরাং রামমোহন ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

১। রামমোহন রায়—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা।

॥ তিন ॥

রামমোহন আঠার শতকের বাংলাদেশের এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষগণ নবাব সরকারে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পিতা প্রচুর বিষয়সম্পত্তির মালিক, উপরন্তু বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদের মাতা মহারাণী বিষণকুমারীর বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। সুতরাং রামমোহনের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তাঁর পরিবারের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। রামমোহনের বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, 'Rammohan received the first elements of native education at home in accordance with the system, which obtains universally among the upper classes of the native society, initiating the children into the mystries of Subhankar under the paternal roof before sending them to a public school.' একজন গুরুমশাইএর অধীনে শুভঙ্করীর পাঠ দিয়েই পিতৃগৃহে রামমোহনের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়।

সে যুগে শিক্ষার স্থান ছিল প্রধানতঃ তিনটি,—গুরুমশাইএর পাঠশালা, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠী আর মৌলভীদের মক্তব। পাঠশালার শিক্ষার মান ছিল একান্তভাবে সাধারণ। কিছু অঙ্ক আর কিছু পত্রলিখনপ্রণালীর মধ্যেই এর ক্ষেত্র ছিল সীমিত। সাধারণভাবে এই শিক্ষারই বরাদ্দ ছিল সকলের জন্য। এরপর যাঁরা ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁরা যেতেন ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে। সেখানে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হত। এছাড়া যাঁরা বিষয়ী পরিবারের সন্তান তাঁদের পক্ষে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য ছিল। তখন কোর্ট কাচারী সর্বত্রই এই উভয় ভাষার চলন। ব্যবহারিক জীবনে ছিল এর প্রচুর দাম। তাই এঁদের মৌলভীদের মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। রামমোহন বাঙালী, ব্রাহ্মণ এবং বিষয়ী পরিবারের সন্তান ; তাই পাঠশালা, চতুষ্পাঠী এবং মক্তব, এই তিনটি স্থানেই তিনি বাল্যশিক্ষা লাভ করেন।

ইতিমধ্যে রামমোহনের বিবাহ হয়। বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রথার একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগে এটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক। এই সময় রামমোহনের বয়স

ছিল প্রায় আট বৎসর। রামমোহনের এই বিবাহ সুখময় হয়নি, কেননা বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। যখন তাঁর বয়স প্রায় নয় বৎসর, তখন এক বৎসরেরও কম ব্যবধানে রামকান্ত রামমোহনের দুবার বিবাহ দেন। উইলিয়ম এ্যাডাম সাহেবের লেখায় এর উল্লেখ আছে। রামমোহনের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম শ্রীমতীদেবী। শ্রীমতীদেবীর বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার কুড়মন পলাশী গ্রামে। তাঁর তৃতীয় পত্নী উমাদেবীর পিত্রালয় কোলকাতার ভবানীপুরে। 'কোলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটের নামকরণ যাঁর নামে, সেই চন্দ্রনাথের উমাদেবী ছিলেন আপন পিসীমা।'

বিবাহ-পর্ব সাঙ্গ হলে রামকান্ত পুত্রের লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগ দেন। রামমোহন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তিনি তাঁর পিতৃবংশের প্রথা এবং পিতার ইচ্ছানুসারে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন মাতৃবংশের প্রথানুসারে। শিক্ষার স্থান সম্বন্ধে কোন উল্লেখ তাঁর লেখায় নেই। এ বিষয়ে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সহচরগণের এবং জীবনচরিতকারগণের মধ্যে উইলিয়ম এ্যাডাম, ডাঃ কার্পেণ্টার, মিস্ কলেট এবং নগেন্দ্রনাথ, সকলেরই মত হল যে রামমোহন এই সময় প্রথমে পাটনা যান, পরে বেনারস। শিক্ষা গ্রহণের সময় সম্বন্ধে এঁদের মধ্যে কিছু কিছু মতবিরোধ থাকলেও মূল প্রসঙ্গে এঁরা সকলেই একমত। তখনকার দিনে ইসলাম সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়নকেন্দ্র হিসাবে পাটনার ছিল যথেষ্ট খ্যাতি। সেখানে বহু মৌলভী বাস করতেন এবং ব্যাপকভাবে এই সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চা করতেন। আরবী ও ফারসী ভাষা তখন যথেষ্ট উন্নত ছিল। এই ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জ্ঞানবিত্তার পরিচয় পাওয়া সম্ভব ছিল। রামমোহন এখানে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং কথিত আছে, আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও এ্যারিষ্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। পাটনার পরে রামমোহনের শিক্ষাগ্রহণের স্থান হল বেনারস। বেনারস হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান। শুধু তাই নয়, ইসলাম সাহিত্য ও শাস্ত্র আলোচনার জন্য পাটনার যেমন খ্যাতি ছিল, হিন্দুধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নকেন্দ্র হিসাবে বেনারসের ছিল অনুরূপ প্রসিদ্ধি। রামমোহন এখানে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রাদির পাঠ গ্রহণ করেন।

রামমোহনের প্রথম জীবনের শিক্ষা সম্বন্ধে এটাই হল প্রচলিত মত। কিন্তু বর্তমানে এ সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল : বিষয়ী ও ধনী পরিবারের সন্তান হিসাবে রামমোহনের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁর পরিবারের আগ্রহ থাকা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক সেই আগ্রহ বৈষয়িক উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়া। ইসলাম অথবা হিন্দু সাহিত্য-শাস্ত্রে রামমোহনকে পণ্ডিত করে তোলার বাসনা নিশ্চয়ই তাঁর পরিবারের ছিল না। সুতরাং বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য অথবা মুসলমান রাজসরকারে চাকরির জন্য যতখানি আরবী ও ফারসী জ্ঞানের আবশ্যক তার জন্য পাটনা যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ঠিক একইভাবে বলা যায়, সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণ জ্ঞানের জন্য বেনারস যাওয়া অপরিহার্য ছিল না। তাছাড়া আঠার শতকের সেই সময়ে যাতায়াত সহজসাধ্য ছিল না। হুগলী জেলার রাধানগর থেকে পাটনা অথবা বেনারসের দূরত্ব অনেকখানি। এতখানি দূরে মাত্র নয়-দশ বৎসরের একটি বালককে শুধুমাত্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠানর ব্যাপারে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টিকে অন্যভাবে চিন্তা করলে এতখানি অসম্ভব লাগে না রামমোহনের পাটনা ও বেনারসে শিক্ষাগ্রহণ। রামমোহনের পূর্বপুরুষরা নবাব সরকারে চাকরি করতেন। সুতরাং তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে কেউ না কেউ হয়ত পাটনায় ছিলেন। কোন কারণে তাঁর কাছে থাকার সময় রামমোহনের পক্ষে পাটনায় আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করা অসম্ভব নয়। নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে রামমোহন প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ করে লিখেছেন, 'শৈশবকালে তাঁহার মাতামহ কিছুদিন কাশীবাস করেছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার মাতার সহিত কিছুদিন কাশীতে মাতামহের নিকট ছিলেন।' সুতরাং এই সময় সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যে পাঠ গ্রহণ রামমোহনের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব।

রামমোহনের পাটনা ও বেনারসে শিক্ষা প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছেন, 'রামমোহন তাঁহার জীবনের প্রথম ১৪ বৎসর যে প্রধানতঃ রাধানগরের বাড়ীতেই কাটাইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাড়ীতেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত সুখসাগরের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রাম নিবাসী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় হয়।'[১] নন্দকুমারের

১। রামমোহন রায়—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা।

পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। নন্দকুমার ছাড়া তাঁর অপর তিন পুত্রের নাম রামধন বিদ্যালঙ্কার, রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। কনিষ্ঠ রামচন্দ্রের সঙ্গে রামমোহনের পরবর্তী জীবনে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। নন্দকুমার ন্যায়দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। পালপাড়ায় অধ্যাপনা করতেন তিনি। ১৮৩২ সালে সত্তর বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁর জন্ম হয় ১৭৬২ সালে। অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করে তিনি নানা দেশ পর্যটন করেন। সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করার পর তন্ত্রসাধনা করে তিনি পরিচিত হন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে। নন্দকুমারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধরে ব্রজেন্দ্রনাথ যা সিদ্ধান্ত করেছেন তা ঠিক নয়। ১৪ বৎসর বয়সের সময় রামমোহনের সঙ্গে নন্দকুমারের পরিচয় হয় একথা সত্য বটে, কিন্তু সেই পরিচয়ের স্থান যে রাধানগর তার কোন উল্লেখ কোথাও নেই। গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে রামমোহনের মকদ্দমায় নন্দকুমারের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, 'he hath known the Defendent Rammohun Roy from the time that the said defendent attained the age of fourteen years and hath even since been on the most intimate terms with him.' সুতরাং রাধানগরেই যে উভয়ের পরিচয় হয় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তাছাড়া চতুর্দশ বৎসর বয়সে রামমোহন যেখানে ছিলেন, চোদ্দ বৎসরই যে তাঁকে সেখানেই থাকতে হবে, এ ধরণের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অবাস্তব। নন্দকুমার তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। রামমোহনের মাতামহবংশও তান্ত্রিক বংশ। এই সূত্রে নন্দকুমারের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া নন্দকুমার পালপাড়ায় অধ্যাপনা করতেন; সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার্থী হিসাবেও হয়ত রামমোহন তাঁর পরিচিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্মরণীয়। উইলিয়ম এ্যাডাম রামমোহন সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন, 'He seems to have been relegiously disposed from his early youth, having proposed to seclude himself from the world as a Sannayasi, or divotee, at the age of fourteen, from which he was only dissuaded by the entreaties of his mother.' রামমোহন চোদ্দ বৎসর বয়সে একবার সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জননীর নিষেধে বিরত হন। মনে হয় নন্দকুমারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার

ফলে তাঁর সন্ন্যাসজীবন কিশোর রামমোহনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং রামমোহনও সংসার ত্যাগে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

রামমোহনের পাটনা ও বেনারসের শিক্ষাপর্ব অল্পকালের মধ্যেই শেষ হয়। এর পর রামমোহনের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিকতা বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই রচনার পশ্চাতে বিশেষ কোন কারণ ছিল কিনা তা জানা যায় নি। মনে হয় হিন্দুধর্মের অসংখ্য বিধিনিষেধ এবং সংস্কারবন্ধন তাঁর চিত্তে স্বাভাবিক সংশয় জাগিয়ে তুলেছিল। সমাজজীবনে প্রচলিত আচার-আচরণ সেই সংশয়কে করেছিল আরও দৃঢ়। আঠার শতকের বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম ছিল নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং এদের মধ্যে রেষারেষি ও কলহ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এই সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে রামমোহনের চাক্ষুষ পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে মুসলমান ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে সাধারণভাবে এই পরিচয় পেয়েছিলেন যে তাঁরা একেশ্বরবাদী। তাই রামমোহন প্রতিবাদ জানালেন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। হয়ত এই প্রতিবাদ ছিল একান্তভাবে মৃদু; হয়ত এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর রায়পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজের কানে স্পষ্ট হওয়ার আগেই মিলিয়ে গেছে; তবুও এই বয়সে যে স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি এবং যে নির্ভীক তেজস্বিতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা সে-যুগে অচিন্তনীয়। সমাজের সেই একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগে প্রচলিত সংস্কারের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যই ছিল স্বাভাবিক। যা হয়ে আসছে তাই অমোঘ; যা প্রচলিত তাই অভ্রান্ত। সমাজের কোন কাজের প্রতিবাদ স্বপ্নেরও অতীত। ধর্ম সম্বন্ধে ত কথাই নেই। কেননা এখানে শুধু ইহলোকে সমাজের উদ্যত খড়্গের হিংস্র নিষ্ঠুরতা নয়, পরলোকেও কুম্ভীপাকে অনিবার্য নিমজ্জনের দুঃসহ ভীতি সদা জাগ্রত। তাই চোখ বুজে সব কিছু মেনে যাওয়াই ছিল সমাজজীবনের প্রথম ও প্রধান সর্ত। এই নিদারুণ আত্মবিলোপের যুগে রামমোহনই প্রথম জাগ্রত ব্যক্তি; এই জড় জীবনযাত্রার অন্ধ অনুবর্তনের মধ্যে তিনিই প্রথম স্পর্ধিত ব্যতিক্রম।

আঠার শতকের অন্ধকারে বাংলাদেশ তখন আচ্ছন্ন। ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আসীন সমাজপতির রক্ত চক্ষুর কাছে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। ভক্তির অন্তরালে মানুষের ভয়ই ভাবী সর্বনাশের কবল থেকে

পরিত্রাণের জন্য ধর্মের মন্দিরে নৈবেদ্য সাজাতে ব্যস্ত। স্বাধীন চিন্তা অথবা বিচার সেথা নৈব নৈব চ। তাই রামমোহনের এই রচনায় প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত যে চিন্তাধারা প্রকাশ পেল, তা তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের ভাবিয়ে তুলল। অন্য কোন বিষয়ে বিরুদ্ধমত পোষণকে রামমোহনের বয়সের কথা চিন্তা করে তাঁরা হয়ত চপলতা বলে উড়িয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু ধর্ম খেলার সামগ্রী নয়। ধর্মবিশ্বাসে সংশয় গুরুতর অপরাধ। তাই রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পরিবারস্থ অন্যান্যদের মনান্তর ঘটল। তাঁরা রামমোহনের আচরণে রুষ্ট হলেন। ফলে রামমোহনও গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন। একদিন চৌদ্দ বৎসর বয়সে যে পর্যটন স্পৃহা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, মাতৃস্নেহের টানে সেদিন যা থেকে বিরত হয়েছিলেন, আজ বিরোধ-সংঘাতের মুহূর্তে সেই পথই হল তাঁর সাথী।

এরপর রামমোহন দীর্ঘ ভ্রমণ করেন। এ সম্বন্ধে আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'I proceeded on my travels, and passed through different countries, chiefly within, but some beyond the bounds of Hindustan.' রামমোহন যে এই সময় বহু দূরদেশে পর্যটন করেন তার আরও একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁর 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' গ্রন্থের প্রথমেই তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে লিখেছেন, 'আমি পৃথিবীর বহু দূরদেশে গিয়েছি। কখনো সমতলভূমিতে, কখনো বা পার্বত্য প্রদেশের নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি।' 'তুহ্‌ফাৎ' রচিত হয় ১৮০৩-৪ সালে। এই সময়ের মধ্যে রামমোহন একমাত্র ঢাকা জালালপুরে উডফোর্ডের অধীনে কিছুদিন কাজ করেন এবং বৈষয়িক কাজে মাঝে মাঝে কোলকাতায় যান। সুতরাং 'তুহ্‌ফাৎ' গ্রন্থে রামমোহন যে বহু দূরদেশের কথা বলেছেন, যে পার্বত্যপ্রদেশের কথা উল্লেখ করেছেন তা নিশ্চয়ই এর মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া 'তুহ্‌ফাৎ' রচনাকালে ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে তাঁর যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল সে পরিচয় গ্রন্থ মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং পৃথিবীর সীমানা সম্পর্কে এবং পার্বত্যপ্রদেশের যথাযথ সংজ্ঞা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল বলেই মনে হয়। রামমোহন সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে তিনি গৃহত্যাগ করে এই সময় নানাদেশ পর্যটনপূর্বক তিব্বত যান। সেখানে লামাদের কর্মে প্রতিবাদ করার জন্য তাঁর প্রাণসংশয় ঘটে। সেই সময় তিব্বতীয় স্ত্রীলোকদের স্নেহচ্ছায়ে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থন হন।

রামমোহনের প্রায় সমস্ত জীবনচরিতকারগণই মর্যাদার সঙ্গে স্ব স্ব গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আত্মজীবনীতে এবং 'তুহ্‌ফাৎ' গ্রন্থে যদিও রামমোহন দূরদেশে ও পার্বত্যপ্রদেশে ভ্রমণের কথা বলেছেন তবুও স্পষ্ট নামোল্লেখ কোথাও নেই। 'তুহ্‌ফাৎ' গ্রন্থের শেষ থেকে জানা যায় যে এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে তিনি 'মনাজারতুন আদিয়ান' নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে ছিল নানা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা। কিন্তু সেই গ্রন্থ না পাওয়ার জন্য নানা ধর্মের মধ্যে সেখানে লামাদের সম্পর্কে কোন আলোচনা অথবা এই ভ্রমণ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল কিনা জানার উপায় নেই। তবে ডাঃ কার্পেণ্টারের লেখায় রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ প্রসঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গের বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'In these circumstances he experienced the soothing kindness of the female part of the family ; and his gentle, feeling heart lately dwelt, with deep interest, at the distance of more than forty years, on the recollections of that period which, he said, had made him always feel respect and gratitude towards the female sex'. পরবর্তী জীবনে রামমোহন স্ত্রী-জাতির প্রতি যে সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তার মূল ছিল এখানে। রামমোহন আলাপ-আলোচনাকালে একথা নিজে ব্যক্ত করেছিলেন এবং ডাঃ কার্পেণ্টার নিজে শুনেছিলেন। এ বিষয়ে পাদটীকায় তিনি লিখেছেন, 'I heard from the Rajah himself in London and again in Stapleton Grove [Bristol].' কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহ হন নি। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে পরবর্তী জীবনে রামমোহন একাধিবার ভুটানে যান।

রামকান্ত রাধানগরে পৈতৃক বাড়ীতে তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে বাস করতেন, যদিও আহার করতেন পৃথকভাবে। ক্রমশঃ এই পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাধানগরের বাড়ীতে স্থানাভাব হয়। মনে হয় সেই জন্যই ১৭৯১ সালে রামকান্ত তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করে চলে এলেন লাঙ্গুলপাড়ায়। রাধানগর থেকে লাঙ্গুলপাড়ার দূরত্ব সামান্য। রামকান্তর অবস্থা অনুযায়ী লাঙ্গুলপাড়ার এই বাড়ী ছিল বেশ বিরাট। ষোল বিঘা জায়গার উপর ইটের দোতলা পাকা বাড়ী,

ইটের রান্নাঘর, বৈঠকখানা, নাটমন্দির। বাড়ীর সংলগ্ন বিরাট বাগান। সেখানে অন্যান্য গাছের সঙ্গে ১০০টি আম গাছ, ২০০টি তালগাছ এবং ৭০০টি নারকেল গাছ ছিল। তিনটি পুকুরের মধ্যে একটির আয়তন ছিল ১৮ বিঘা। সুতরাং সব মিলিয়ে রামকান্তর লাঙ্গুলপাড়ার বাড়া এক মূল্যবান সম্পত্তি। এটি ছিল রামকান্তর নিজস্ব। এই সময় রামকান্তর অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। এই বৎসরের মে মাসে তিনি কোম্পানীর কাছ থেকে ভুরসুট পরগণা নয় বৎসরের জন্য ইজারা নেন। এই ইজারার জন্য তাঁর জামিন হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জগমোহন ইতিমধ্যেই বিষয়কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। কোম্পানী যখন তাঁকে তাঁর পিতার জামিনদার স্বীকার করে নিল তখন তিনি যে বেশ কিছু পরিমাণ সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করেছেন তা অনস্বীকার্য। ১৭৯৪ সালে মেদিনীপুরের চেতোয়া পরগণার হরিরামপুর নামে একটি বড় তালুক জগমোহনের নামে কেনা হয়।

১৭৯৪ সালে দীর্ঘ পর্যটন শেষ করে রামমোহন গৃহে ফিরে এলেন। কথিত আছে যে রামমোহনকে ফিরিয়ে আনার জন্য রামকান্ত লোক পাঠিয়েছিলেন; ফেরার পথে সেই লোকের সঙ্গে রামমোহনের দেখা হয়। রামমোহন গৃহে ফিরে পিতার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতে লাগলেন। নগেন্দ্রনাথের গ্রন্থে উদ্ধৃত রামমোহনের তিনটি চিঠি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এরপর রামকান্তর পরিবারে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর অর্থাৎ ১২০৩ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ রামকান্ত একটি দানপত্র সমাধা করেন। এই দানপত্র বাংলায় লেখা ছিল এবং খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাজীর কাছে রেজেষ্ট্রী করা হয়। দানপত্রে রামকান্ত নিজের জন্য সামান্য কিছু অংশ রেখে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। কোন্ পুত্র কোন্ সম্পত্তি পাবেন তিনি তার তালিকা করে দিলেন। রামমোহন পেলেন নিম্নলিখিত অংশ—

'শ্রীরামমোহন রায়ের অংশ

মৌজা লাঙ্গুলপাড়া :—

বসতবাটি ও বেড়, চৌহদ্দিযুক্ত, গাছ প্রভৃতি সহ
এবং খিড়কীর দরজার দিকে পুষ্করিণী ও নূতন পুষ্করিণী।

এই সকলের অর্দ্ধেক ..	...	১ দফা
গোহালবাড়ী ও বেড়, গাছ সহ ও চৌহদ্দিযুক্ত বাড়ী	...	৮ বিঘা

মৌজা কৃষ্ণনগর :—

সূর্যদাস রায়ের বেড় ধানের জমি	...	৯ বিঘা
কোঠালিয়ারকুণ্ডের ধানের জমি	...	৩ বিঘা
পরগণা চন্দ্রকোণায় পুরণচক্	...	১০ বিঘা
মৌজা কাট্যাদলে পৈতৃক বেড়ে আমার অংশ	...	১ দফা

মৌজা কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে রামকৃষ্ণ শেঠ
ও অন্যান্য লোক হইতে ক্রীত বাড়ী ও পুষ্করিণী।

চৌহদ্দিযুক্ত ...	...	১ দফা
গোপীনাথপুরে পৈতৃক পুষ্করিণীতে নিজ অংশ	...	১ দফা'[১]

রামমোহনের অপর দুই ভ্রাতা জগমোহন ও রামলোচন অনুরূপ সমান অংশই পেলেন। লাঙ্গুলপাড়ার বসতবাড়ী রামমোহন ও জগমোহনের ভাগে পড়ল। তার পরিবর্তে রামকান্তর রাধানগরের পৈতৃক বাড়ীর অংশ পেলেন রামলোচন। হরিরামপুর তালুক জগমোহনেরই রইল; রামমোহন পেলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ী। জগমোহন ও রামমোহন তাঁদের মাতামহ-প্রদত্ত জমি-জমা পেলেন, অন্যদিকে রামলোচনকেও তাঁর মাতামহ-প্রদত্ত জমি-জমা দেওয়া হল। ৺ভট্টাচার্যের কন্যা অর্থাৎ রামকান্তর দ্বিতীয় স্ত্রী তারিণীদেবী তাঁর পুত্রদের নামে যে জমি ও পুষ্করিণী ক্রয় করেছিলেন তা তিনি পেলেন। ৺রামশঙ্কর রায়ের কন্যা অর্থাৎ রামমণিদেবী যে সকল জমি ক্রয় করেছিলেন তা তাঁরই রইল। কিন্তু দানপত্রে রামকান্তর প্রথম স্ত্রী সুভদ্রাদেবীর কোন উল্লেখ নেই। তাঁকে কোন বিষয়-সম্পত্তি দেওয়া হয় নি। হয়ত তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলেই তাঁর ভাগ্যে এইরূপ

১। রামমোহন রায়—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা।

ব্যবস্থা হল। নিজের উপার্জিত আয়ের সামান্য অংশ ও বর্ধমানের বাড়ীটি রামকান্ত নিজের জন্য রাখলেন।

এই দানপত্র হতে জানা যায় যে এই সময় কাউকে কোন নগদ টাকা দেওয়া হলনা। দ্বিতীয়তঃ রামকান্তর বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ দেনা অথবা আয়ের সঙ্গে পুত্রদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তৃতীয়তঃ রামকান্তর পৈতৃক বিগ্রহসেবার ভার তিন পুত্রকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে; কিন্তু তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসেবার ভার তিনি নিজে বহন করবেন। দানপত্রের মধ্যে তিন পুত্রই স্বাক্ষর করলেন। রামমোহনও লিখলেন, 'আমি শ্রীরামমোহন রায় লিখি যে এই দানপত্রের বিবরণ অনুযায়ী বসতবাটী যাহা আপনি আমাকে দিলেন তাহা আমি গ্রহণ করিলাম। এই ভাগ অনুযায়ী সম্পত্তি আমি ভোগদখল করিব; যদি অন্য কাহারও নামে লিখিত জমি-জমাতে দাবী করি বা কেহ করে তবে তাহা মিথ্যা।'

রামকান্ত দানপত্র করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারের রূপও বদলে গেল। রামকান্ত চলে গেলেন তাঁর বর্ধমানের বাড়ীতে। তিনি মাঝে মাঝে লাঙ্গুলপাড়ায় বা রাধানগরে আসতেন এবং তাঁর পুত্রগণও তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বর্ধমানে যেতেন। কিন্তু তাঁর পত্নীরা কখনও বর্ধমানে যেয়ে বাস করেন নি। সম্পত্তি ভাগ হওয়ার ছ'মাস পরে রামলোচন জননী রামমণিদেবীকে সঙ্গে নিয়ে রাধানগরে চলে গেলেন। লাঙ্গুলপাড়ায় রইলেন জগমোহন ও রামমোহন।

পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তির অধিকারী হলেন রামমোহন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেলেন। পেলেন জীবনের পথে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হওয়ার পাথেয়। মনের মধ্যে একটি ইচ্ছা দানা বেঁধে উঠছে। একটি অনাগত বিদ্রোহের দূরাগত ধ্বনি শিরায় শিরায় কাঁপন তুলছে। কিন্তু তার জন্য শক্তি চাই, সম্বল চাই,—চাই আরও ব্যাপক প্রস্তুতি। আরও অর্থ উপার্জন করতে হবে, বাড়িয়ে তুলতে হবে বিষয়-সম্পত্তি। রামমোহন সচেষ্ট হলেন। শুরু হল জমি-জায়গা তদারক, টাকা ধার দেওয়া আর কোম্পানীর কাগজ কেনা। এ ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে সাহায্যে এল কোলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ী। কোলকাতা তখন সারা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র। নবাবী আমল শেষ হয়েছে; মুর্শিদাবাদ ম্রিয়মাণ। কোম্পানীর পূর্ণ আধিপত্যে কোলকাতা ঝলমল। সেই কোলকাতার জোড়াসাঁকোর

বাড়ী পেলেন রামমোহন। নূতন গোমস্তা নিয়ে নূতন দপ্তরখানার পত্তন হল সেখানে। সম্পত্তি পাওয়ার প্রায় নয় মাস পরে কোলকাতায় চলে এলেন তিনি। ১৭৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান র‍্যাম্‌জেকে ৭৫০০ টাকা ধার দেন। এর অনেকদিন পরে আর একজন সিভিলিয়ানকে টাকা ধার দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর নাম টমাস উডফোর্ড। ১৮০২ সালে উডফোর্ডকে ধার দেন ৫০০০ টাকা।

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ইংরাজের সম্পর্কে এলেন রামমোহন এবং তারপর থেকেই শুরু করলেন ইংরাজী শিক্ষা। ১৭৭৪ সালে যদিও সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল, তবুও ইংরাজী শিক্ষার তখন তেমন চলন ছিল না। একদিকে শিক্ষাগ্রহণের এই অসুবিধা, অন্যদিকে বিষয়ী রামমোহনের সময়ও অল্প। তাই বিষয় কর্মের ফাঁকে ফাঁকে মূলতঃ নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। এ সম্বন্ধে মিঃ ডিগবী লিখেছেন, 'At the age of twenty two he commenced the study of the English language, which not pursuing with application, he, five years afterwords, when I became acquainted with him, could merely speak it well enough to be understood upon the most common topics of discourse, but could not write it with any degree of correctness.' সুযোগ ও সময়ের অভাবের জন্য দীর্ঘ পাঁচ বৎসরেও ইংরাজী শিক্ষায় তিনি বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। বিষয়-কর্ম উপলক্ষে প্রায় তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হত। ১৭৯৯ সালের ১২ই জুলাই তারিখে তিনি দুটি বড় তালুক একই দিনে ক্রয় করেন। তালুক দুটি হল গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর। প্রথমটি জাহানাবাদ পরগণায় ও দ্বিতীয়টি চন্দ্রকোণা পরগণায় অবস্থিত। গোবিন্দপুর ক্রয় করলেন গঙ্গাধর ঘোষের কাছ থেকে ৩১০০ টাকায় এবং রামেশ্বরপুর ক্রয় করলেন ১২৫০ টাকায় রামতনু রায়ের কাছ থেকে। রামমোহনের বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে এদুটি ছিল খুব মূল্যবান। আদায় খরচ ও সদর জমা বাদ দিয়ে এগুলি থেকে আয় হত প্রায় ৫৫০০ টাকা।

বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি বড় কাজ সমাধা করে রামমোহন যেন কিছু নিশ্চিন্ত হলেন। আবার সেই পৌত্তলিকতার চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল। এখন

অর্থের সংস্থান হয়েছে সত্য, কিন্তু শুধু অর্থের জোরেই প্রতিবাদ করা যাবে না। সম্যক্‌রূপে জানতে হবে হিন্দুশাস্ত্র এবং সেই সঙ্গে একেশ্বরবাদী ইসলামশাস্ত্র। তাই রামমোহন পাটনা ও বেনারস যাওয়ার মনস্থ করলেন। ১৭৯৯ সালের শেষের দিকে রামমোহনকে এ ব্যাপারে তোড়জোড় করতে দেখা যায়। তিনি তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজীবলোচন রায়ের সঙ্গে গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুরের বিলি-বন্দোবস্ত করলেন। কারণটি হল কোলকাতা ছেড়ে অনেক দূর চলেছেন তিনি। পথে অনিশ্চয়তা। যদি প্রবাসে দৈবের বশে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে তখন উত্তরাধিকারী কে হবে? তখনও তিনি নিঃসন্তান। তাই তাঁর বাসনা, বিদেশে মৃত্যু হলে তাঁর এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে একমাত্র ভাগিনেয় গুরুদাস। রামমোহন তাই তালুক দুটি রাজীবলোচনের নামে বিক্রী কোবলা করে দিলেন। আর রাজীবলোচনও এই মর্মে লিখে দিলেন যে বিদেশে রামমোহনের মৃত্যু হলে এই সম্পত্তি গুরুদাসেরই প্রাপ্য হবে। অবশ্য এত না করেও রামমোহন এই মর্মে একটি উইল করে যেতে পারতেন। কাজ হিসাবে সেটিই হয়ত সহজ হত। কিন্তু এত করার পিছনে আরও একটি বৈষয়িক কারণ ছিল। রামমোহনের অনুপস্থিতিতে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করার লোকের প্রয়োজন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজীবলোচন এ বিষয়ে যোগ্য ছিলেন সত্য, কিন্তু সম্পত্তির মালিকানা রামমোহনের নামে থাকলে পাছে কোন অসুবিধা হয় তাই তিনি কালেক্টরের কাগজপত্রে রাজীবলোচনের নাম বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

১৭৯৯ সালের শেষের দিকে রামমোহন পাটনা ও বেনারসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই সময় তিনি ইসলাম ও হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। আরবী ও ফারসী ভাষা এবং মুসলমান ধর্মগ্রন্থে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য পরবর্তীকালে তিনি 'জবরদস্ত মৌলভী' নামে পরিচিত ছিলেন। এখানে তিনি কোরাণের একেশ্বরবাদীতার স্বচ্ছতায় চোখ মেলেন, সুফী কবিদের আনন্দময় জগতের সন্ধান পান, মোতাজেল সম্প্রদায়ের উদারতায় মুগ্ধ হন। এই সঙ্গে বেনারসে তিনি হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু রামমোহনের পশ্চিম যাত্রা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অল্পকাল পরেই তাঁকে আবার কোলকাতায় ফিরে আসতে হল।

রামমোহনের প্রথমপুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম হয় ১৮০১ সালে। ১৮০২ সালে

রামমোহন তাঁর কাজকর্মের জন্য নূতন একজন গোমস্তা নিযুক্ত করলেন। ইতিমধ্যে কোলকাতায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে। ১৮০০ সালে বাংলাদেশে একটি শুভ সূচনা দেখা দিল। প্রতিষ্ঠিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বিলাত হতে যে-সমস্ত সিভিলিয়ানরা আসতেন তাঁদের পক্ষে সরকারী কাজে সবচেয়ে বাধা হয়ে দাঁড়াত এ দেশের ভাষা ও বিবরণ। তাঁদের শিক্ষার জন্য সরকার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। অধ্যক্ষ হলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী উইলিয়ম কেরী। সঙ্গে রইলেন এদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রামরাম বসু, গোলকনারায়ণ দাস, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি। রামমোহনের কাছে এ এক অভূতপূর্ব সুযোগ। তাঁর জ্ঞান-পিপাসার সম্মুখে যেন এক প্রস্রবণের.উৎসার ঘটল। তিনি নিজেকে ঘনিষ্ঠ করে তুললেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে, তার প্রধান ফারসী মুন্সীর সঙ্গে, তার অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে। সিভিলিয়ানদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটল এবং এইখানেই ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরিচিত হলেন সিভিলিয়ান জন ডিগবীর সঙ্গে। রামমোহনের পরবর্তী জীবনে ডিগবীর ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

সিভিলিয়ান টমাস উডফোর্ডকে রামমোহন পাঁচ হাজার টাকা ধার দিলেন ১৮০২ সালে। এই সময় সম্পূর্ণ টাকা তাঁর তহবিলে ছিল না, তাই তিন হাজার টাকা তিনি জয়কৃষ্ণ সিংহ নামক এক ব্যক্তির কাছ হতে ধার করেন। এই ধার করে ধার দেওয়ার পশ্চাতে নিশ্চয়ই রামমোহনের কোন উদ্দেশ্য ছিল; কারণ এরই কিছুদিন পরে রামমোহনকে দেখি উডফোর্ডের কাছে কর্মরত।

টমাস উডফোর্ড ঢাকা জালালপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হলেন ১৮০৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। ৭ই মার্চ তারিখে ওখানকার দেওয়ান কিষেণচাঁদ স্বইচ্ছায় পদত্যাগ-পত্র পেশ করলে উডফোর্ড রামমোহনকে ঐ পদে নিযুক্ত করলেন। রামমোহনের জামিনদার হলেন তুল সিং নামে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত এক ব্যক্তি। সুতরাং মনে হয় উডফোর্ডের সঙ্গে রামমোহনও ১৮০৩ সালের জানুয়ারীর শেষাশেষি ঢাকায় যান। ঢাকায় রামমোহনের পরিচিত ব্যক্তির অভাব ছিল না, নইলে জামিনদার হিসাবে তুল সিংকে পাওয়া সহজ হত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে এটিই হল রামমোহনের প্রথম চাকরি। কিন্তু তাঁর এ চাকরি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৪ই মে তারিখে অসুস্থতার জন্য টমাস-উডফোর্ড কর্মভার হস্তান্তর করে কোলকাতা চলে গেলেন, আর ঐ একই তারিখে রামমোহনও পেশ করলেন তাঁর পদত্যাগ পত্র।

॥ চার ॥

ইতিমধ্যে রায় পরিবারে দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে।

বর্ধমানের মহারাণী বিষণকুমারী মারা গেলেন ১২০৫ সালে। ঐ বছরই বর্দা পরগণা রাজস্ব বাকীর দায়ে নীলামে উঠল। তখন জগমোহন রায় দরখাস্তে আপত্তি জানালেন যে বর্দা পরগণার মধ্যে রসিকপুর, পুরাণগঞ্জ এবং পুরুলিয়া এই তিনটি মহল তাঁর, সুতরাং ঐ পরগণা থেকে এই তিনটি মহল বাদ দিতে হবে। অন্যদিকে বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ কালেক্টরের কাছে জানালেন যে ঐ সমস্ত সম্পত্তিই তাঁর স্বর্গীয় জননী মহারাণী বিষণকুমারীর বেনামী সম্পত্তি; সুতরাং সে সম্পত্তি কেউই বিক্রী করতে পারে না। মহারাণীর মৃত্যুর পর তেজচাঁদই হলেন সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তাই সেই সম্পত্তির মালিকানার জন্য ১৭৯৯ সালের ১৩ই জুলাই তিনি বর্ধমান কোর্টে জগমোহন রায়, রামকান্ত রায় ও রামনিধি ঘোষের নামে মামলা করেন। জেলা জজ জগমোহনের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করে তেজচাঁদের পক্ষে রায় দিলেন। জগমোহন কোলকাতা প্রভিন্সিয়াল কোর্টে আপীল করলেন। আপীলে রায় হল সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রভিন্সিয়াল কোর্ট জগমোহনের দাবী স্বীকার করে নিলেন। তখন মহারাজা তেজচাঁদ এই রায়ের বিরুদ্ধে কোলকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করলেন। এবারে রায় হল তেজচাঁদের পক্ষে। রায় প্রকাশ হল ১৮০৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। রামকান্ত তখন মৃত, আর জগমোহন মেদিনীপুর জেলে।

এই মামলার পূর্বেও তেজচাঁদ রামকান্ত ও জগমোহনের নামে মামলা করেছিলেন। রামকান্ত বর্ধমানের মহারাণীর বহু জমি ইজারা নিয়েছিলেন। মহারাণীর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী তেজচাঁদ দেখলেন যে বাকী খাজনা বাবদ রামকান্তের কাছে তাঁর পাওনা প্রায় আশী হাজার টাকা দাঁড়িয়েছে। ঐ পাওনা টাকার জন্য তিনি মামলা করলেন ও ডিক্রী পেলেন। এতটাকা একসঙ্গে পরিশোধ করার সঙ্গতি না থাকার জন্য রামকান্ত ও জগমোহন পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এর ফলে এক নূতন বিপদ দেখা দিল। রামকান্ত কোম্পানীর কাছ থেকে নয় বৎসরের মেয়াদে ভুরসুট পরগণা ইজারা নিয়েছিলেন, জগমোহন ছিলেন তাঁর

জমিনদার। এই মেয়াদের শেষ তারিখ ছিল ১৮০০ সালের মার্চমাস। এই সময় তাঁদের পালিয়ে বেড়ান কোম্পানীর মনে সন্দেহ উদ্রেক করল। যদিও রামকান্ত এতদিন ঠিকমত খাজনা দিয়ে আসছিলেন, তবুও এই আকস্মিক আচরণে কোম্পানীর মনে হল হয়ত ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সমস্ত খাজনা পাওয়া সম্ভব হবে না। ১৭৯৯ সালের ১৪ই নভেম্বরের চিঠিতে বর্ধমানের কালেক্টর বোর্ড অব রেভিনিউকে একথা স্পষ্ট করে লিখে জানালেন। ভুরস্থট পরগণার মেয়াদ শেষ হল ; রামকান্তর খাজনাও বাকী পড়ল। তাই ১৮০০সালের মাঝামাঝি কোম্পানী রামকান্তকে জেলে আবদ্ধ করল। ভুরস্থট পরগণার বাকী খাজনা পরিশোধ করার ক্ষমতা রামকান্তর ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন যে এই খাজনা মিটিয়ে দিলেও জেল হতে তাঁর অব্যহতি ঘটবে না। কারণ, বর্ধমানের মহারাজা তাঁকে ছাড়বেন না। রামকান্ত যখন কোম্পনীর খাজনা পরিশোধের কোন লক্ষণ দেখালেন না কোম্পানী তখন রামকান্তর জামিনদার জগমোহনকে ১৮০১ সালের ২০শে জুন তারিখে মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ করল। এর প্রায় চার মাস পরে রামকান্ত নগদ কিছু টাকা দিলেন এবং বাকী টাকা কোম্পানী জগমোহনের সম্পত্তির কিছু অংশ নীলাম করে আদায় করল। এইভাবে ভুরস্থট পরগণার বাকী খাজনা স্বদে আসলে শোধ হওয়ার পর ১৮০১ সালে ১লা অক্টোবর রামকান্ত জেল হতে মুক্তি পেলেন। কিন্তু জগমোহনের ভাগ্যে মুক্তি ঘটল না। কারণ, ইতিমধ্যে তাঁর নিজস্ব ইজারা নেওয়া তালুক হরিরামপুরের খাজনা বাকী পড়ার জন্য কোম্পানী তাঁকে মুক্তি দিল না। রামকান্ত কোম্পানীর কাছ হতে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু তেজচাঁদ তাঁর প্রাপ্য টাকার জন্য তাঁকে আবার জেলে আবদ্ধ করলেন। প্রথমে রাখা হল হুগলী জেলে, তারপর বর্ধমান জেলে। এর পর বর্ধমানের মহারাজাকে পাঁচ শত টাকা নগদ ও বাকী টাকা এগার বৎসরে শোধ করবেন এই মর্মে একটি কিস্তিবন্দীর দলিল লিখে দিয়ে জেল হতে মুক্তি পেলেন তিনি।

ইতিমধ্যে জগমোহনের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি কোন মতেই কোম্পানীর টাকা শোধ করতে পারছেন না। ১৮০১ সালের জুন মাসে তিনি জেলে আবদ্ধ হন। সেই থেকে ১৮০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত কোম্পানী তাঁর কাছ থেকে মাত্র ১০৬৮ টাকা আদায় করতে সমর্থ হয়। মার্চ মাসে তাই জগমোহন আবেদন

করেন যে নগদ ৫০০ টাকা এবং বাকী ৫১৮০ টাকার জন্য ছয় বৎসরের কিস্তিবন্দী লিখে দেবেন—কোম্পানী যেন তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেয়। মেদিনীপুরের কালেক্টর বর্ধমানের কালেক্টরের কাছে ২৫শে মার্চ তারিখের পত্রে জগমোহনের বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজ নিতে লিখলেন। ৩০ তারিখের উত্তরে বর্ধমানের কালেক্টর জানালেন যে তিনি জগমোহনের পরিচিত এবং নিকট আত্মীয় অনেকের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন, কিন্তু, বর্ধমানের কালেক্টরের ভাষায়, 'they all agree in declaring that they believe the family although once opulent, to be now in ruined and desparate circumstances.' ১৫ই এপ্রিলের পত্রে মেদিনীপুরের কালেক্টর বোর্ড অব রেভিনিউকে সে কথা জানিয়ে দেন। তিনি স্পষ্টই লিখলেন, 'I have never been able to discover that the defaulter himself is possessed of any property.' এরপর প্রায় পাঁচ মাস এই ভাবেই কাটে। অবশেষে মেদিনীপুরের কালেক্টরের ৫ই অক্টোবর তারিখের চিঠি থেকে জানা যায় যে জগমোহন নগদ এক হাজার টাকা ও বাকী টাকার জন্য প্রতি মাসে ১০০ টাকা হিসাবে দিতে রাজী হয়েছেন এবং তাঁর এই কিস্তিবন্দীর জামিনদার থাকবেন তাঁর ভাই রামলোচন রায় ও অপর একজন শোভাচাঁদ রায়। ১৮০৫ সালের ৯ই মার্চ তারিখে এঁরা বর্ধমানের কালেক্টরের কাছে জামিননামা সই করেন। আর ঐ হাজার টাকা জগমোহন রামমোহনের কাছে থেকে ধার করেন। রামমোহনের হয়ে মেদিনীপুরের মোহন পোদ্দার ঐ টাকা দেন এবং জগমোহন সুদসমেত ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার-পত্র লিখে দেন। এইভাবে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ১৮০৫ সালের মার্চ মাসে জগমোহন যখন জেল হতে মুক্তি পেলেন, তাঁর পূর্বেই রামকান্তর মৃত্যু হয়েছে।

রামকান্ত তাঁর বর্ধমানের বাড়ীতে ১২১০ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে অর্থাৎ ১৮০৩ সালের মে-জুন মাসে মারা যান। এই সময় তাঁর পুত্রদের মধ্যে সম্ভবতঃ একমাত্র রামলোচন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। দৌহিত্র গুরুদাস সংবাদ পেয়ে পরের দিন হাজির হন। জগমোহন তখন মেদিনীপুর জেলে এবং রামমোহনের উপস্থিতি সম্বন্ধে মতদ্বৈত আছে।

•

উইলিয়াম এ্যাডাম লিখেছেন যে রামমোহন তাঁর পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং একথা তিনি স্বয়ং রামমোহনের কাছ থেকে শুনেছিলেন। এমন-

কি এই সময়কার একটি আবেগময় চিত্রও তিনি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'R. Roy, in conversation, mentioned to me with much feeling that he had stood by the deathbed of his father, who with his expiring breath continued to invoke his God—Ram! Ram!...'। ধর্মপ্রাণ এ্যাডাম সাহেবের উক্তিটি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করেছেন রামমোহনের দুজন প্রধান জীবনীকার,—নগেন্দ্রনাথ ও মিস্ কলেট। কিন্তু দীর্ঘ দিন পরে এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তিনি পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা।' পরবর্তীকালে যদিও কেউ কেউ ব্রজেন্দ্রনাথের এই মতটি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন, তবুও মনে হয় ব্রজেন্দ্রনাথের মতই ঠিক। রামমোহন ঢাকায় উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হন ১৮০৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখে। ১৪ মে তারিখে উডফোর্ড অসুস্থতার জন্য ঢাকা ত্যাগ করলে রামমোহনও ঐ তারিখে পদত্যাগ করেন। রামমোহনের পদত্যাগপত্র পাওয়া যায়নি। সুতরাং পদত্যাগের সঠিক কারণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে উডফোর্ডের কার্যভার হস্তান্তর ও রামমোহনের পদত্যাগপত্র পেশ একই দিনে হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে উডফোর্ডের সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অপর-পক্ষে রামকান্তর যে 'কঠিন পীড়া' হয়েছিল তার কোন উল্লেখ কোথাও নেই। সুতরাং 'পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া মৃত্যুর পূর্বে পিতার শয্যাপার্শ্বে তিনি উপস্থিত হইবার মানসেই কর্ম্মে ইস্তফা প্রদান করেন', [১]—এটি নিছক কষ্ট-কল্পনামাত্র। দ্বিতীয়তঃ গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে রামমোহনের যে মামলা হয় সেখানে রামমোহনের পক্ষ হতে তারিণীদেবীকে জেরা করার উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি প্রশ্নের মধ্যে একটি হচ্ছে, 'where was Rammohun Roy, as you know, have heard or do believe at the time of the death of the said Ramkanta Roy?' জগমোহন সম্বন্ধেও ঠিক এই রকম প্রশ্ন আছে। কিন্তু রামলোচন সম্পর্কে নেই। রামলোচন উপস্থিত ছিলেন তাই তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন নেই। জগমোহন অনুপস্থিত ছিলেন, কারণ তখন তিনি মেদিনীপুর জেলে; তাই তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। সুতরাং রামমোহন সম্পর্কে যখন প্রশ্ন আছে তখন স্বাভাবিকভাবে মনে হয় তিনিও অনুপস্থিত ছিলেন।

১। রামমোহন প্রসঙ্গ—প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই সমস্ত প্রশ্নের সঙ্গে রামকান্তর শ্রাদ্ধে রামমোহনের অংশ গ্রহণ সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন আছে। কিন্তু তাই বলে 'ওই প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য এই যে লাঙ্গুলপাড়ায় পিতৃশ্রাদ্ধে জগমোহন ও রামমোহনের অনুপস্থিতির পার্থক্য প্রদর্শন'—এ ধারণা করা সঙ্গত নয়। তৃতীয়তঃ ঐ মামলাতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় রায়পরিবারের কুলপুরোহিত বলেছেন, 'at the time of the death of said Ramcaunt Roy Jugmohun Roy was at Midnapore and Rammohun at some foreign place but where he this disponent doth not know…'. রাধাকৃষ্ণ স্পষ্টই বলেছেন যে রামকান্তের মৃত্যুর সময় রামমোহন উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি রায়পরিবারের অনেক বিষয় সম্পর্কে উত্তর দিতে পারেন নি, সেইজন্য তাঁর এই উক্তি কেউ কেউ অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়েব কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে জগমোহন যে মেদিনীপুরে ছিলেন এ কথা ত সত্য; সুতরাং কেবলমাত্র রামমোহনের ক্ষেত্রে তাঁকে অবিশ্বাস কেন? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রায়পরিবারের যে যে বিষয় সম্পর্কে তিনি জানতেন না তা তিনি স্পষ্টই বলেছেন, কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন, সম্ভবতঃ সেখানে কোন মিথ্যা নেই। চতুর্থতঃ ঐ মামলায় অপর একজন সাক্ষী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'that Ramcaunt Roy died about fifteen years ago at Burdwan and that the said Juggmohun Roy died about ten years ago at Langulpara said that the defendant was absent at the time of their respective deaths.' এতগুলি প্রমাণ অগ্রাহ্য করে রামকান্তর মৃত্যু সময়ে রামমোহনের উপস্থিতি কল্পনা করা তাই সঙ্গত নয়।

রামকান্তর মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধ নিয়ে বেশ গোলযোগ উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহন তখন মেদিনীপুব জেলে, তাই সেই জেলের মধ্যেই তিনি শ্রাদ্ধ করলেন। রামমোহন লাঙ্গুলপাড়ার শ্রাদ্ধে যোগ না দিয়ে কোলকাতায় পৃথকভাবে আর একটি শ্রাদ্ধ করলেন। ধর্মসংক্রান্ত প্রচলিত আচার আচরণে রামমোহনের মতবিরোধই এর কারণ। লাঙ্গুলপাড়ায় শ্রাদ্ধ করলেন কনিষ্ঠ রামলোচন। কিন্তু এক্ষেত্রেও শ্রাদ্ধের খরচের জন্য তারিণীদেবী দৌহিত্র গুরুদাসের অলঙ্কার বন্ধক দেন। পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা

কি রামলোচনের ছিল না? ১৮০৫ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে বর্ধমানের কালেক্টরের লেখা চিঠি হতে জানা যায় যে রামলোচনের ১৫৩৫ বিঘা ৫ কাঠা নিষ্কর জমি ছিল। ১৮০৩ সালে পিতৃবিয়োগের সময় রামলোচনের কি এমন কোন সম্পত্তি ছিল না যে ভাগিনেয় বালক গুরুদাসের অলঙ্কার বন্ধক দেওয়ার প্রয়োজন হল? হয়ত এর পশ্চাতে অন্য কোন কারণ ছিল।

রামকান্তর মৃত্যুর পর বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ তাঁর বর্ধমানের বাড়ীটির দখল নিলেন। ব্রহ্মোত্তর জমি যা ছিল দেবসেবায় নিয়োজিত হল; তার কর্ত্রী হলেন তারিণীদেবী। নগদ কোন টাকা রামকান্ত না রেখে গেলেও অনেকের কাছে তাঁর অনেক টাকা পাওনা ছিল। এই সমস্ত পাওনা টাকা যা তিনি মৃত্যুর পূর্বে ধার দিয়েছিলেন, জগমোহন একে একে আদায় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রামকান্তর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী বলে জগমোহন নিজেকে পরিচিত করেন এবং পিতার পাওনা টাকা আদায় করেন। রামমোহন বা রামলোচন এর সংস্রবে ছিলেন না। দীর্ঘ দিন পরে তেজচাঁদের সঙ্গে মামলায় রামমোহন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সম্পত্তির কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। শুধু রামকান্তর মৃত্যুর পরই নয়; ১৭৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রামকান্ত দানপত্র করে তিন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার পর থেকে রামমোহন জগমোহন, রামলোচন অথবা রামকান্ত কারও সঙ্গেই বিষয়গত ব্যাপারে কোন দিন যুক্ত থাকেন নি। জগমোহনের সঙ্গে রামকান্তর যোগ ছিল। তাই খাজনা বাকী পড়ার জন্য কোম্পানী এবং তেজচাঁদ রামকান্ত ও জগমোহন উভয়কেই একসঙ্গে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু সেইসময় রামমোহনের যথেষ্ট সম্পত্তি থাকা সত্বেও কেউই রামমোহনকে দায়ী করেন নি। অবশ্য দীর্ঘদিন পরে পিতৃঋণ পরিশোধ না করার জন্য তেজচাঁদ রামমোহনের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন, কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র।

॥ পাঁচ ॥

টমাস উডফোর্ড ঢাকা জালালপুর থেকে চলে এলেন ১৮০৩ সালের ১৪ই মে। ঐ বৎসরই ১১ই আগষ্ট তারিখে তিনি মুর্শিদাবাদের রেজিষ্টার নিযুক্ত হন; কিন্তু অসুস্থতার জন্য কার্যে যোগ দিতে পারেন নি। ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে বায়ু পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রোপকূলে যান। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮০৪ সালের ফেব্রুয়ারীর পর তিনি মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ই রামমোহনও তাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ যান। এই যাত্রার কারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জানা যায় নি। ঐ সময়ে কোম্পানীর অধীনে তিনি কোন চাকরি করেন নি; সম্ভবতঃ উডফোর্ডের অধীনে মুন্সী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ হতেই রামমোহনের গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির নাম 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন'; রচনাকাল ১৮০৩-৪। পুস্তকটি আকারে ক্ষুদ্র, ভূমিকাটি আরবীতে এবং অবশিষ্টাংশ ফারসীতে রচিত। ঢাকা গভর্ণমেণ্ট মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলভী ওবেদুল্লা ১৮৮৪ সালে সর্বপ্রথম ইহা Tuhfat-ul-Muwahhidin or A Gift of Deists নামে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ১৯৪৯ সালে বাংলা অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস।

রামমোহন তাঁর ষোল বৎসর বয়সে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যদিও সেটি পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ দিন ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা অথবা পুস্তক প্রণয়ন প্রসঙ্গে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নি। এখন রামমোহনের বয়স প্রায় তিরিশ। সুতরাং প্রায় দীর্ঘ বার বৎসর পরে আবার দেখা যায় রামমোহন ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় রত। শুধু এই গ্রন্থই নয়; 'তুহ্ফাৎ'-এর শেষে তিনি লিখেছেন, 'আমার আর একটি রচনা 'মানাজারুতুল্ আদিয়ান্' বা নানা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছি।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইতিপূর্বে রামমোহন আরও একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এতদিন পরে হঠাৎ এই সময় আবার ধর্ম নিয়ে আলোচনার কারণ মনে হয় রামকান্তর শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পরিবারবর্গের মতান্তর। ঐ মতানৈক্যের

জন্য তিনি কোলকাতায় পৃথকভাবে শ্রাদ্ধ করেন। রামকান্তর শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গে যে অশান্তি দেখা দেয় তা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর পুরাতন বিদ্বেষকে আরও গভীর ও জাগ্রত করে তোলে। তারই ফলে এই 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' অথবা 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার' গ্রন্থের প্রকাশ।

রামমোহন 'তুহ্‌ফাৎ' গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন 'সকল দেশের লোকেরা একটি বিষয়ে একমত যে এই জগতে সব কিছুর আদি কারণ ও তার বিধাতারূপে (governor) এক পরম সত্তা বিদ্যমান আছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে (personality) সাধারণভাবে সকলেই বিশ্বাস করে, কিন্তু সেই সত্তার বিশেষ বিশেষ স্বরূপ লক্ষণ এবং ধর্মের বিভিন্ন মত ও বিধি (halal) নিষেধের (haram) বিচিত্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে একমত নন।' মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এক অনাদি অনন্ত সত্তায় বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাস সার্বজনীন। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতগত ও কার্যগত যে বিভেদ তা অভ্যাস ও দলগত শিক্ষা থেকে উদ্ভূত। এগুলি স্বাভাবিক নয়; বাইরের জিনিষ। এই বাহ্য লক্ষণের বিভিন্নতার ফলে এক ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর ধর্মসম্প্রদায়ের ভেদ দেখা যায়। তখন একে অন্যকে অগ্রাহ্য করতে চায় এই বলে যে তাদের সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষরা যা বলে গেছেন তা নির্ভুল। কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষরাও ত ভুল করতে পারেন। তাই রামমোহন সিদ্ধান্ত করেছেন যে সকল ধর্মেই যখন এক অনন্ত সত্তার স্বীকৃতি আছে, তখন সকল ধর্মেই সত্য আছে; আবার সকল ধর্মেই যখন বিশেষ বিশেষ অমূলক মত ও বিভিন্ন বাহ্য অনুষ্ঠান রয়েছে, তখন সকল ধর্মেই অসত্য বর্তমান। তাই মানুষের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন সত্যাসত্য নির্ণয়। সত্যের অনুসন্ধানই মানুষের পরিচয়। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে মানুষ সেই অনুসন্ধান হতে বিরত। তার কারণ বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নেতাগণ নিজেদের সম্মান ও গৌরবের জন্য কতকগুলি যুক্তিশূন্য মতের সৃষ্টি করেন এবং অলৌকিকতার আড়ালে ন্যায় ও সত্যকে আবরিত করেন। রামমোহন লিখেছেন, 'তাই দেখি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী নেতারা তাদের নাম সহজে অক্ষয় করবার এবং নিজের নিজের যশ বাড়াবার জন্য, বিশুদ্ধ সত্য (pure truth) গুলিকে বিশেষ বিশেষ মতের আবরণে ঢেকে রাখেন। সেগুলিকে কোথাও বা অলৌকিকতার উপর দাঁড় করিয়ে দেন, কিম্বা মণ্ডলীর অবস্থান অনুযায়ী মন ভোলান

ভাষায়, অথবা নানা ফন্দির ভিতর দিয়ে সত্যের আকারে প্রচার করেন।' এই সকল ধর্মপ্রবর্তকেরা মানুষের স্বাভাবিক বিচারশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। তখন তারা সত্যাসত্য নির্ণয়ে উৎসাহী হয় না। যদিও বা কেউ সামান্য আগ্রহ প্রদর্শন করে তাহলে সেই ধর্মাবলম্বীরা সেই প্রচেষ্টাকে শয়তানের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে, ফলে সে সেই সন্ধানের পথ হতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। আসলে যে সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ বেড়ে ওঠে, সেই সম্প্রদায়ের মতবিশ্বাসকেই সে ধীরে ধীরে চিরন্তন বলে মানতে অভ্যস্ত হয়। রামমোহন লিখেছেন, 'এইরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার পর, এবং সেই মতের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করে নির্বিচারে বহু বৎসর বিশ্বাস করবার পর, সেই সব ধর্মমতের সত্যিকার প্রকৃতি নির্ণয় করতে মানুষ সাবালক হয়েও সক্ষম হয় না।' মানুষ সাংসারিক ব্যাপারে কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান করে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। এখানে নেতাদের ব্যাখ্যা হল যে ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কের কোন স্থান নেই, এবং ধর্মের ব্যাপারে শুধু বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর। এই সমস্ত গুরুদের প্রভাব শিষ্যদের উপর এতই গভীর যে তারা গুরুদের কথামত একটি পাথর অথবা উদ্ভিদ অথবা জন্তুজানোয়ারকেই প্রকৃত উপাস্য দেবতা বলে মনে করে। তবুও মানুষের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে যার ফলে যদি কোন সুস্থমনের মানুষ কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করে তাহলে সত্য তার সামনে উদ্ভাসিত হবেই। সমস্ত অসার বিধি নিষেধের বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে সে হবে ঈশ্বরাভিমুখী। তার মনে প্রতীতি জন্মাবে যে তার উপর এক পরম সত্তা আছেন যিনি বিশ্বের পরিচালক; সকল সুসঙ্গত ব্যবস্থার যিনি উৎস, জনসমাজের কল্যাণ যাঁর একমাত্র ইচ্ছা।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণদের একটা বিশ্বাস যে তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অমোঘ আদেশ পেয়েছেন যে তাঁরাই সব ক্রিয়া-কলাপ বরাবর করে যাবেন, এবং তাঁরাই ধর্মকে চিরকাল ধরে থাকবেন। সংস্কৃত ভাষায় এ বিষয় এমন অনেক দৈবী অনুশাসন রয়েছে। আমার মত ঈশ্বরের এই দীনতম জীবটি ঐ ব্রাহ্মণ বংশেই জন্মগ্রহণ করেছি, ঐ ভাষা শিখেছি, ও ঐ সব অনুশাসন কণ্ঠস্থ করেছি। ঐ সব দৈবী নির্দেশে

আস্থা রাখার জন্য ইসলামধর্মীরা ব্রাহ্মণ জাতির অনেক ক্ষতি করেছে ও তাদের উপর অনেক নির্যাতন করেছে, এমন কি মৃত্যুভয়ও দেখিয়েছে, তবু তারা ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারে নি। ইস্‌লামানুবর্তীরা কোরাণের পবিত্র শ্লোকের মর্মানুসারে (যথা : পৌত্তলিকদের যেখানে পাও বধ কর, ও অবিশ্বাসীদের ধর্ম-যুদ্ধ করে বেঁধে আন, এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দাও, বা বশ্যতা স্বীকার করাও) এগুলি ঈশ্বরের নির্দেশ বলে উল্লেখ করে, যেন পৌত্তলিকদের বধ করা ও নানাভাবে নির্যাতন করা ঈশ্বরাদেশে অবশ্য কর্তব্য। মুসলমানদের মতে ঐ পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই সবচেয়ে পৌত্তলিক। সেইজন্যই ইস্‌লামানুবর্তীরা সর্বদাই ধর্মোন্মাদে মত্ত হয়ে, এবং তাদের ঈশ্বরের আদেশ মানবার উৎসাহে 'বহু-দেববাদিদের' ও শেষ পয়গম্বরের ধর্মপ্রচারে অবিশ্বাসী-দের বধ করতে ত্রুটি করে নি।' কিন্তু সুস্থমনে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এই ধরণের বিরুদ্ধ মতের উপদেশ বা আদেশ ঈশ্বরের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়; এগুলি যথার্থভাবেই ধর্মানুবর্তীদের মনগড়া। সুতরাং বুদ্ধি, বিবেক ও বিচারশক্তির সাহায্যেই প্রকৃত সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে। রামমোহন লিখেছেন, 'প্রত্যেক মানুষকে যে ঈশ্বর বুদ্ধি-বৃত্তি দিয়েছেন তার মধ্যে এই ভাব নিহিত যে অন্য নিম্নস্তরের জীবের মত স্বজাতীয়ের দৃষ্টান্ত চরম অনুকরণ করা উচিত নয়। পরন্তু নিজের বুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে ভাল মন্দ এরূপভাবে বিচার করা চাই যাতে ঈশ্বরদত্ত এই মহামূল্য দান অকেজো করে ফেলা না হয়।' সেই বুদ্ধি আর অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে রামমোহন যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল: 'সর্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্মের মূলসূত্র। জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি ভালবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা।'

রামমোহন সাধারণ মানুষকে মোট চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা হলেন প্রতারক। এঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজেদের দলের জন্য ইচ্ছামত নানা মতবাদ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি বানিয়ে প্রচার করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোককে বলা যায় প্রতারিত। এঁরা কোন সত্য সন্ধান না করেই অন্যের দলে যোগ দেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোক একই সঙ্গে প্রতারক এবং প্রতারিত। এঁরা অন্যের উক্তিতে বিশ্বাস করেন এবং অন্যকেও তা বিশ্বাস করাতে উৎসাহিত

হন। চতুর্থ শ্রেণীতে যাঁরা আছেন তাঁরা প্রতারক নন, প্রতারিতও নন; তাঁরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-ধন্য। সেই সুস্থ-মনের লোকদের সত্য ও শুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেই রামমোহন তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন।

'তুহ্ফাৎ' গ্রন্থ একেশ্বরবাদের জয়গানে মুখর। কোরাণ এবং মুসলমান শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠে রামমোহনের মনে একেশ্বরবাদের ছাপ দৃঢ় হয়। কিন্তু 'তুহ্ফাৎ' গ্রন্থে একেশ্বরবাদের সঙ্গে আরও বহু বিষয়ের আলোচনা আছে। শাস্ত্র ঈশ্বরের আদেশ নয়, মানুষেরই রচনা; ধর্মসম্প্রদায়ের নেতারা মানুষের স্বচ্ছদৃষ্টিকে আবিল করে দেয়; মানুষের মঙ্গল চিন্তাই ঈশ্বর উপাসনার প্রকৃষ্ট পথ;—এই সমস্ত আলোচনার বিষয়গুলি কোরাণের মধ্যে, কিংবা হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রের মধ্যে নেই। এগুলি রামমোহন আরব দেশীয় মতাজেল সম্প্রদায় ও মুয়াহ্হিদিন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এছাড়াও রামমোহনের আলোচনার মধ্যে আঠার শতকের ইউরোপের শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের ছাপ দেখা যায়। রামমোহন ইতিপূর্বে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা শুরু করলেও এই সময়ের মধ্যে তাঁর ইংরাজী জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং মনে হয়, ঐ সমস্ত ইউরোপীয় মতবাদের সঙ্গে রামমোহন আরবী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে পরিচিত হন। 'তুহ্ফাৎ' গ্রন্থে কোরাণ ও হাফিজের বহু উদ্ধৃতি আছে এবং রামমোহনের বিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয় আছে।

'তুহ্ফাৎ' গ্রন্থে রামমোহন তাঁর ধর্মবিশ্বাসের স্পষ্ট ছাপ রেখেছেন। জগতের আদি কারণ ও তার বিধাতারূপে এক পরম সত্তা বিদ্যমান। তিনি জগতের পরিচালক। জনসমাজের মঙ্গলই তাঁর ইচ্ছা। আমাদের জ্ঞান, বিবেক ও বিচারশক্তির সাহায্যে সেই জগদীশ্বরের ইচ্ছার স্বরূপ জানা যায়। তিনি বিশেষ-কালে বা বিশেষ দেশে কোন বিশেষ শাস্ত্র দেননি। সমাজের কল্যাণ সাধনই আমাদের পরম ধর্ম। ঈশ্বর চিন্তায় ও ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে মানুষের মঙ্গল-চিন্তাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে রামমোহন নবযুগের উদ্বোধন করলেন। এই মানব-মুখিনতাই নূতন যুগের মূলমন্ত্র। এখন থেকে ধর্মের ক্ষেত্রেও যুক্তি-তর্ক, বুদ্ধি-বিবেচনা ও স্বাধীন চিন্তার অবকাশ হল। মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ ও অন্ধ-বিশ্বাসের বন্ধন হতে মুক্তি পেতে চাইল মানুষ। ধর্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী উন্মুক্ত হল মানবমুখিনতার প্রশস্ত রাজপথে। শুরু হল উনিশ শতকের নব জাগরণ।

॥ ছয় ॥

রামমোহনের মুর্শিদাবাদে বাস বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। ১৮০৫ সালের আগষ্ট মাসে টমাস উডফোর্ড অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য চাকরি ছেড়ে চলে যান। রামমোহন এই সময় সম্ভবতঃ উডফোর্ডের অধীনে মুন্সীর কাজ করেছিলেন। তাই উডফোর্ডের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও মুর্শিদাবাদে থাকার কাল শেষ হল। এবার তিনি নূতন চাকরির চেষ্টায় হাজির হলেন জন ডিগবীর কাছে।

ডিগবী রামমোহনের পূর্ব-পরিচিত। ১৮০১ সালে ডিগবীর সঙ্গে রামমোহনের প্রথম পরিচয় হয়। বিলাত হতে এসে ডিগবী যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষাগ্রহণ কবছিলেন, এ ঘটনা সেই সময়কার। মনে হয়, পূর্ব-পরিচয়ের এই সূত্র ধরেই রামমোহন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। অবশ্য এই যোগাযোগ ব্যাপারে টমাস উডফোর্ডের সহযোগিতা থাকাও অস্বাভাবিক নয়।

ডিগবীর কাছে রামমোহন যখন এলেন, ডিগবী তখন রামগড়ের রেজিষ্টার। রামমোহন তাঁর মুন্সী নিযুক্ত হলেন। এখন থেকে রামমোহন তাঁর সঙ্গেই রইলেন। ১৮০৫ সালের ৯ই মে ডিগবী রামগড়ে রেজিষ্টার নিযুক্ত হন। আগষ্টের পর রামমোহন তাঁর কাছে আসেন ও মুন্সী হিসাবে কাজে যোগ দেন। রামগড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গিলার অসুস্থতার জন্য চলে যাওয়ায় ১৮০৬ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে গভর্নর জেনারেল ডিগবীকে অস্থায়ীভাবে ঐ পদের ভার দেন। ডিগবী ১৮০৬ সালের ২১শে আগষ্ট হতে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় তিনমাস ঐ পদে বহাল ছিলেন; পরে মিঃ আর থ্যাকারের হাতে কার্যভার অর্পণ করে পুনরায় রেজিষ্টার হিসাবে কাজ করেন। এই তিন মাস রামমোহন ফৌজদারী কোর্টের সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। রামগড়ের পর ১৮০৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ডিগবী যশোরের কালেক্টর হন। তাঁর যশোরের স্থায়িত্বকাল হল ১৮০৮ সালের ৯ই জুন পর্যন্ত। রামমোহন এই সময় ডিগবীর মুন্সী হিসাবে কাজ করেন। যশোর থেকে ডিগবী যান ভাগলপুর। রামমোহনও তাঁর অনুগমন করেন। ভাগলপুরের পর রংপুর। ১৮০৯ সালের ৩০শে জুন ডিগবী রংপুরের কালেক্টর হন। ডিসেম্বর

মাসে তিনি রামমোহনকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বোর্ডের সমর্থন না পাওয়ার জন্য ১৮১১ সালের ১১ই মার্চ তারিখে রামমোহনের স্থলে নূতন লোক গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৮১৪ সালের ১৪ই জুলাই ডিগবী তাঁর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ড রওনা হন; রামমোহনও সেই সঙ্গে রংপুর ত্যাগ করে কোলকাতায় চলে আসেন স্থায়ী বসবাসের জন্য।

জন ডিগবী রামমোহনের জীবনে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই সুন্দর স্বভাবের গুণগ্রাহী বিদেশী ভদ্রলোকটির সাহচর্য রামমোহনের জীবনে প্রভূত উপকার সাধন করেছিল। রামমোহন যখন ডিগবীর কাছে চাকরির জন্য এলেন তখন প্রাচ্য-বিদ্যায় তিনি যথেষ্ট পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান। আরবী ও ফারসী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেছেন, সেইসঙ্গে ইসলাম শাস্ত্রগ্রন্থও অধ্যয়ন করেছেন গভীরভাবে। এর অল্পকাল পূর্বেই 'তুহ্ফাৎ' গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেখানে তিনি জ্ঞান-বিদ্যা, যুক্তি ও স্বচ্ছ-দৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন; একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা করেছেন। একজন হিন্দুর পক্ষে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে এ-এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। তাই প্রথম হতেই ডিগবী রামমোহনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। মনিবত্বের উচ্চাসন হতে সৌহার্দ্যের সমতলে স্বেচ্ছায় নেমে এলেন। রামমোহনের সঙ্গে ডিগবীর বন্ধুত্ব হল।

ডিগবীর কাছে আসার পর হতেই রামমোহনের ইংরাজী চর্চায় জোয়ার এল। এখানে তিনি যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পেলেন। এ সম্বন্ধে ডিগবী লিখেছেন, 'By perusing all my public correspondence with diligence and attention, as well as by corresponding and conversing with European gentlemen, he acquired so correct a knowledge of the English language to be enabled to write and speak it with considerable accuracy. He was also in the constant habit of reading the English newspapers, of which the continental politics chiefly interested him...'। এই সময়ই রামমোহন গভীরভাবে পেলেন পাশ্চাত্য আলো হাওয়ার স্পর্শ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্য দিয়ে সেখানে সর্বত্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের যে আয়োজন চলছিল

রামমোহন তার সঙ্গে সাগ্রহে পরিচিত হলেন। মানুষের মুক্তিপিপাসা তাঁকে অভিভূত করল। অন্তরে অন্তরে তিনিও উপলব্ধি করলেন তার উষ্ণ স্পর্শ।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটল, রামমোহনের জাগ্রত আত্মসম্মানের পরিচায়ক হিসাবে তা একান্তভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিগবী ভাগলপুরে বদলী হলে রামমোহনও তাঁর সঙ্গে ভাগলপুরে যান। ১৮০৯ সালের ১লা জানুয়ারী রামমোহন পাল্কী করে চলেছিলেন ভাগলপুর সহরে তাঁর বাসায়। সঙ্গে ছিল তাঁর চাপরাসী ও বরকন্দাজ। রাস্তার পাশে একটি ইটের পাঁজার উপর দাঁড়িয়েছিলেন কালেক্টর স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টন। তিনি একজন দেশীয় লোককে এইভাবে যেতে দেখে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। মুসলমান আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সামনে দিয়ে এইভাবে সাধারণের পাল্কী চেপে যাওয়ার অধিকার ছিল না। কোম্পানীর আমলে প্রথমে অনেক ইংরাজ কর্মচারী এই সম্মান আদায় করতে ভালবাসতেন। তাই ক্রুদ্ধ হ্যামিল্টন চিৎকার করে পাল্কী থামাতে আদেশ দিলেন। পাল্কী থামল না দেখে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন। রামমোহন পাল্কী হতে নেমে হ্যামিল্টনকে যথাযথ অভিবাদন করলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হ্যামিল্টন তাঁকে গালাগালি দিতে লাগলেন। রামমোহন অগত্যা পাল্কী করে নিজের গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন। পরে এই অপমানের প্রতিকারের জন্য ১২ই এপ্রিল তারিখে স্বয়ং বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কাছে আবেদন করলেন। আবেদনপত্রটি ইংরাজীতে রচিত।[১] রামমোহনের প্রাপ্ত ইংরাজী রচনার মধ্যে প্রথম হিসাবে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রচনায় লেখকের নির্ভীকতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সমস্ত ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'If natives, therefore, of caste and rank were to be subjected to treatment which must infallibly dishonour and degrade them, not only within the pale of their own religion and society, but also within the circle of the English societies of high respectability into which they have the honour of being most liberally and affably admitted, they would be virtually condemned

১। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার রামমোহন রায় গ্রন্থে উদ্ধৃত।

to close confinement within their house from the dread of being assaulted in the streets with every species of ignominy and degradation.' কোম্পানীর সেই ক্ষমতাদৃপ্ত প্রহরে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর ব্যবহারে অপমানিত হওয়ার মত আত্মসম্মানবোধ মনে হয় রাম-মোহনের মধ্যেই প্রথম প্রকাশ করল; অপমানের প্রতিকারের জন্য তিনিই প্রথম অভিযোক্তা; তাঁরই কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হল: এদেশের অধিবাসীও মানুষ, ইংরাজের ন্যায়-বিচারের সেও সমান অধিকারী, তাকে অযথা অপমান করার অধিকার কারও নেই. রামমোহন লর্ড মিণ্টোর কাছে আবেদন জানালেন ১২ই এপ্রিল। ৫ই মে তারিখে ঐ আবেদনের একটি কপি ভাগলপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাঁর রিপোর্টের জন্য পাঠান হল। ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে হ্যামিণ্টনের লিখিত বক্তব্য সংগ্রহ করে ২০শে মে তারিখে পাঠিয়ে দিলেন। হ্যামিণ্টন অভিযোগ অস্বীকার করলেন। তিনি লিখে জানালেন যে রামমোহনের পাল্কী তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি কিছুই বলেন নি। কিছুদূর চলে যাওয়ার পর একজন চাপরাসীকে রামমোহন সেলাম দিয়ে হ্যামিণ্টনের কাছে পাঠান এবং চাপরাসী তাঁকে জানান যে তিনি যে কালেক্টর এ কথা জানা থাকলে রামমোহন নিশ্চয়ই তাঁর সামনে থামতেন। এতে হ্যামিণ্টন অপমানিত বোধ করেন। তিনি ঘোড়ায় চেপে রামমোহনের কাছে যান এবং তাঁকে বলেন যে কালেক্টরকে সেলাম জানান যদি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাহলে একজন চাপরাসী না পাঠিয়ে তাঁর নিজের যাওয়াই উচিত ছিল। হ্যামিণ্টন লেখেন, 'I reproached him for his want of civility and warned him he did so again to other gentleman, lest he might find one who would not keep his temper so well as I had done.' রামমোহন বলেন যে তিনি তাঁর চাপরাসীকে পাঠান নি। হ্যামিণ্টন তখন সেই অবাধ্য চাপরাসীকে শাস্তি দিতে বলেন। এ কথায় রামমোহন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠেন, 'কেমন করে আমি তাকে শাস্তি দেব? আমি কি তার কান কেটে দেব?' শাস্তির বিষয়টি রামমোহনের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়ে হ্যামিণ্টন ঘোড়ায় চেপে চলে আসেন। সমগ্র ঘটনাটি এইভাবে ব্যক্ত করে সবশেষে হ্যামিণ্টন লিখেছেন, 'It may be necessary to observe that, previous to submitting this pitition to Government he sought redress in the Supreme Court of Calcutta, without success.'

একটি সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হ্যামিল্টন নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু ১২ই জুন তারিখে গভর্নর জেনারেলের সেক্রেটারী ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখলেন, '...from the inquiries which have been made, it does not appear that Rammohun Roy even instituted any suit against Sir Frederick Hamilton in the Supreme Court of Judicature,' এবং সেইসঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন, 'His Lordship in Council deems it however sufficient to desire that you will caution Sir Frederick Hamilton against having any similar altercation with any of the natives in future.' রামমোহনের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রইল এবং সেই সঙ্গে ইংরাজের ন্যায়নিষ্ঠ সুবিচারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা হল দ্বিগুণিত।

ভাগলপুরের পর ডিগবী যান রংপুর। এখানে তিনি রামমোহনকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বোর্ডের অনুমতি না পাওয়ার জন্য রামমোহন বেশীদিন ঐ পদে থাকতে পারেন নি। বোর্ডের অনুমতি পাওয়ার জন্য ডিগবী যে প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন তা তাঁর চিঠিপত্র হতে প্রমাণিত হয়। ১৮০৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর ডিগবী রামমোহনকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং বোর্ডকে তা জানান। ৩০শে ডিসেম্বরের পত্রে তিনি রামমোহন প্রসঙ্গে লেখেন যে পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে তিনি রামমোহনকে একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসাবেই জানেন এবং রামমোহন যে ফৌজদারী কোর্টে তিনমাস সেরেস্তাদারের কাজ করেছিলেন সে-কথার উল্লেখ করেন। ১৫ই জানুয়ারী তারিখে বোর্ড এর উত্তরে লিখে জানান যে ফৌজদারী কোর্টে অস্থায়ী সেরেস্তাদারের কাজ করলেই তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানী কাজ করার যোগ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে না। তাছাড়া প্রকৃতিগতভাবে এদুটি কাজ সম্পূর্ণ আলাদা। তাই রাজস্ব বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার জন্য পরামর্শ দিলেন। ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ডিগবী এর উত্তরে লিখলেন যে রাজস্ব বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান রামমোহনের আছে, কারণ— তিনি যখন যশোরের কালেক্টর ছিলেন তখন রামমোহন তাঁর অধীনে মুন্সীর কাজ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে, অন্য অনেক ক্ষেত্রে বোর্ড সরকারী কাজে অভিজ্ঞতাহীন লোককে যে ইতিপূর্বে কালেক্টরের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেছেন

তারও উল্লেখ করলেন তিনি। সেইসঙ্গে একথাও জানালেন যে রামমোহনের চরিত্র ও গুণবত্তা সদর দেওয়ানী আদালতের কাজী-উল-কজ্জত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান ফারসী মুন্সী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অধ্যাপকের নিকট সুপরিচিত। সবশেষে তিনি লিখলেন, 'Being thoroughly acquainted with the merits and abilities of Rammohun Roy, it would be very repugnant to my feelings, to be compelled so far to disgrace him in the eyes of the natives as to remove him from his present employment in which I have continued him as officiating in the hope that the character which will be given of him by the Natives, to whom the Board are reffered, and the knowledge of his business which I have declared him to possess, will induce them to confirm him in the appointment of Dewan of my office for which I am confident he is perfectly well qualified'. কিন্তু বোর্ডের এক কথা। ডিগবীর আবেদনে কর্ণপাত না করে বোর্ড নূতন লোক নিয়োগের জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপরও ডিগবী চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ১৬ই মার্চ তারিখে বোর্ড এবিষয়ে তাঁদের চূড়ান্ত মত জানিয়ে লিখলেন, 'The Board regret that they cannot with any degree of consistence or propriety make any alteration in their orders of 15th January and 8th February respecting the vacant office of Dewan to your Collectorship.' অতঃপর ডিগবী নূতন লোক নিয়োগ করতে বাধ্য হন।

রামমোহন মাত্র কয়েকমাস অস্থায়ীভাবে দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি 'দেওয়ান রামমোহন' নামে পরিচিত হন। এই পরিচয়ের কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে তিনি কোম্পানীর অধীনে দেওয়ানের চাকরি করেছিলেন, তিনি যে ডিগবীরও দেওয়ান ছিলেন সেটিও একটি কারণ। 'দেশীয় লোকের সহিত কাজকর্মের সুবিধার জন্য সে-কালের অনেক সাহেব বাঙালী 'বাবু' রাখতেন। ইহাদিগকে দেওয়ান বলা হইত। রামমোহনও ডিগবীর সহিত এইরূপেই সম্পৃক্ত

ছিলেন।'[১] ভাগলপুরে রামমোহন যখন হ্যামিল্টনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই ঘটনার বিবৃতিতে হ্যামিল্টন লিখেছেন, 'I turned to servant of mine and enquired who it was coming along; he replied, Mr. Digby's Dewan, Baboo Rammohun Roy.' রংপুরে আসার পূর্বেই এ ঘটনা ঘটে, এবং তখনই তিনি সাধারণের কাছে 'ডিগবীর দেওয়ান' নামে পরিচিত ছিলেন।

বোর্ডের অনমনীয় আপত্তির ফলে রামমোহন চাকরি থেকে সরে এলেন, কিন্তু তিনি রংপুরেই রইলেন। কারণ চাকরি অপেক্ষা তাঁর তখন বেশী প্রয়োজন ডিগবীর সাহচর্য। 'তুহ্‌ফাৎ' গ্রন্থ প্রকাশ এবং পরে ডিগবীর কাছে ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করে, ইংরাজী পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি হতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির জ্ঞান আহরণের ফলে তাঁর জীবনের সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র। দীর্ঘদিনের জড়তা ও অন্ধ-সংস্কারে আবদ্ধ থেকে ধর্মে যে মালিন্যের স্পর্শ লেগেছিল, সমাজজীবনে যে কলুষ-কালিমা স্পষ্ট হয়েছিল এবং ব্যক্তিজীবনে যে আত্মাবমাননা দেখা দিয়েছিল, রামমোহন তা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হলেন। বস্তুতঃ তাঁর পরবর্তী সংস্কার-জীবনের সূচনা ঘটে রংপুরেই। এখানে তিনি ছোট ছোট ঘরোয়া সভা আহ্বান করতেন। এই সমস্ত সভায় অনেকেই উপস্থিত থাকতেন; তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদারও ছিলেন। সভায় ধর্মালোচনার কালে পৌত্তলিকতার অসারত্ব ও একেশ্বরবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হত। রামমোহনের এই আলোচনার যতই প্রসার হতে লাগল, সমাজের মধ্য হতে প্রতিরোধের শক্তিও ততই দানা বেঁধে উঠল। অবশেষে শীঘ্রই এখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আত্মপ্রকাশ করলেন। এঁর নাম গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। ইনি রামমোহনের বিরুদ্ধে একটি পুস্তক রচনা করলেন। পুস্তকটি বাংলা ভাষায় রচিত; নাম 'জ্ঞানাঞ্জন'। ১২৪৫ সালে অর্থাৎ ইং ১৮৩৮ সালে সংশোধিত হয়ে ঐ পুস্তকটি কোলকাতায় প্রকাশিত হয়।[২] রংপুরে রামমোহনের কর্মপ্রচেষ্টা শুধু ধর্মালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আলোচনার

১। রামমোহন রায়—সাহিত্য-সাধক চরিতমালা।

২। 'জ্ঞানাঞ্জন'-এর একটি কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে।

প্রয়োজনে তিনি ফারসী ভাষায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন এবং পরবর্তীকালে বেদান্তের যে-অনুবাদ নিয়ে কোলকাতায় তাঁর ঐতিহাসিক আত্মপ্রকাশ, তারও রচনা শুরু হয় এই রংপুরে।

রামমোহন যখন রংপুরে তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন মারা যান। কিন্তু প্রচলিত ধারণা হল, এই সময় রামমোহন লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন ; শুধু তাই নয়, জগমোহনের স্ত্রী অলোকমঞ্জরীদেবীর সহমৃতা হওয়ার ঘটনাতেই তিনি সহমরণ নিবারণের প্রতিজ্ঞা করেন। কাহিনীটি রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক কথিত। তিনি তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসুর কাছ হতে শুনেছিলেন। নন্দকিশোর ছিলেন রামমোহনের ঘনিষ্ঠ অনুচর। সুতরাং নগেন্দ্রনাথ ও মিস্ কলেট তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে কাহিনীটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। মিস্ কলেট লিখেছেন, 'It is said that Rammohun had endeavoured to persuade her beforehand against this terrible step, but in vain, ... Rammohun unable to save her and filled with unspeakable indignation and pity, vowed within himself then and there, that he would never rest until the atrocious custom was rooted out.' নগেন্দ্রনাথ তাঁর 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' গ্রন্থে ২৬-২৭ পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের স্ত্রীর সহমরণ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতকাল বাঁচিবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা সমূলোৎপাটিত করিবেন।' নগেন্দ্রনাথ তাঁর একই গ্রন্থের একই সংস্করণের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'রামমোহনের সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় তখন রংপুরে। এই ঘটনায় সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে রামমোহন রায়ের উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়াছিল। তাঁহার জননী উহা নিবারণ করেন নাই বলিয়া তিনি বাটী আসিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। জননী বলিয়াছিলেন যে, তিনি পুত্রশোকে একান্ত কাতরা ছিলেন, সুতরাং উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মিস্ কলেট তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে পাদটীকায় নগেন্দ্রনাথের যে গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন সেই গ্রন্থেই একই সঙ্গে দুটি কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। অতএব এখন বিচার্য বিষয় হল, প্রথমতঃ জগমোহনের

স্ত্রী সহমৃতা হয়েছিলেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ জগমোহনের মৃত্যুর সময় রামমোহন কোথায় ছিলেন? প্রথমটি সম্বন্ধে জোরের সঙ্গে যেমন না বলা যায় না, তেমনি নিশ্চিতভাবে হাঁ বলাও অসম্ভব। জগমোহনের স্ত্রী যে সহমৃতা হয়েছিলেন তার একমাত্র উল্লেখ আছে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতায়। সহমরণ আইন পাশ হলে মিস্ মার্টিন রামমোহনকে অভিনন্দিত করতে যেয়ে এই ব্যাপারে তাঁর দীর্ঘ আঠার বৎসরের সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন্ ঘটনায় এই সাধনার শুরু তার কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং রাজনারায়ণ কথিত অলকমঞ্জরীর সহমৃতা হওয়ার ঘটনার সঙ্গে এই উক্তির যোগসূত্র আবিষ্কার নিছকই অনুমান মাত্র। সহমৃতা না হওয়ার পক্ষে তবু কতকগুলি পরোক্ষ যুক্তি ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ রামকান্তের কোন স্ত্রী সহমৃতা হন নি। দ্বিতীয়তঃ রামলোচনের পত্নীও সহমরণে যান নি। তৃতীয়তঃ জগমোহনের অন্য এক স্ত্রী দুর্গাদেবীও (গোবিন্দপ্রসাদের মাতা) সহমৃতা হন নি। সুতরাং মনে হয় জগমোহনের স্ত্রী অলকমঞ্জরীও সহমৃতা হন নি। তবুও এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে এই সময় রামমোহন লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন না। রংপুরে থাকার সময় বিষয়কর্ম উপলক্ষে যদিও রামমোহন মাঝে মাঝে কোলকাতায়, বর্ধমানে অথবা লাঙ্গুলপাড়ায় যেতেন তবুও এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় না যে জগমোহনের মৃত্যুর সময় তিনি লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন। বরং বিভিন্ন উল্লেখ থেকে জানা যায় এই সময় তিনি ছিলেন রংপুরে। গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে রামমোহনের যে মামলা হয় তাতে রাধাকৃষ্ণ ব্যানার্জী তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, 'Rammohun was some foreign part from home at the time of their (Ramkanta & Juggmohun) respective deaths.' রাধাকৃষ্ণের সাক্ষ্যের উপর কারও কারও বিশেষ আস্থা নেই। কারণ, রায় পরিবারের অনেক বিষয়ই জানেন না বলে ঐ সাক্ষ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন। অনেক কিছু না জানার অর্থ এই নয় যে কিছুই না জানা। রাধাকৃষ্ণ যা জানতেন না তা যখন স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, তখন যা উল্লেখ করেছেন, মনে করা যেতে পারে, তা তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন। বিশেষতঃ তাঁর সাক্ষ্যে যখন ভুল তথ্য পরিবেশনের নজীর নেই। দ্বিতীয় প্রমাণ হল, ঐ মামলায় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য। তিনি বলেছেন, 'that the defendant was absent at the time of their (Ramkanta & Juggmohun)

respective deaths.' তৃতীয় প্রমাণ হল, ঐ মামলায় তারিণীদেবীকে জেরা করার জন্য রামমোহনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল তার একটি হল, 'was not the Defendant Rammohun Roy at the time of the death of his said brother Juggmohun Roy at Rungpore?' সুতরাং উপরের আলোচনার সিদ্ধান্ত হিসাবে বলা যায় যে জগমোহনের মৃত্যুতে তাঁর পত্নী অলকমঞ্জরীদেবী সহমৃতা হয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে জগমোহনের মৃত্যুর সময় রামমোহন যে লাঙ্গুলপাড়ার পরিবর্তে রংপুরে ছিলেন, তা নিশ্চিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ব্রজেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তও একইরূপ। তিনি লিখেছেন, 'জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন পত্নী সহগামিনী হইলেও রামমোহন যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না তাহা সুনিশ্চিত।'[১]

রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহনের বিষয়-কর্ম সমানভাবেই চলছিল। এই সময় কোলকাতা ও রংপুরে উভয় জায়গাতেই তাঁর কর্মচারী ছিল। রংপুরে যিনি তাঁর হিসাব রাখতেন তাঁর নাম ভবানী ঘোষ, কোলকাতার তহবিলদারের নাম গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন রংপুর থেকে টাকাকড়ি সময় সময় কোলকাতায় পাঠাতেন। ভাগনেয় গুরুদাস রামমোহনের সঙ্গে রংপুরে থাকতেন। তিনি সম্ভবতঃ রামমোহনের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। এই সময় রামমোহন বীরকুল, কৃষ্ণনগর ও শ্রীরামপুর নামে তিনটি তালুক ক্রয় করেন। রংপুর তখন ছিল মুসলমানপ্রধান স্থান। মুসলমানদের সঙ্গে রামমোহনের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। মুসলমান শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'জবরদস্ত মৌলভী' নামে পরিচিত ছিলেন। শোনা যায় রংপুর কোর্ট থেকে প্রায় চার মাইল দূরে মিহিগঞ্জের কাছে তিনি একটি বাড়ী তৈরী করেন। জনহিতকর কার্যেও রামমোহনের নাম পাওয়া যায়। প্রচলিত আছে যে, কোর্টের কাছে বৃহৎ পুষ্করিণীটি রামমোহনই খনন করান।[২]

এরপর ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে কার্যভার হস্তান্তরিত করে জন ডিগবী ইংলণ্ড রওনা হলেন। রামমোহনেরও রংপুর বাস শেষ হল। তিনি চলে এলেন কোলকাতায় তাঁর নূতন কর্মক্ষেত্রে।

১। রামমোহন রায়—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা।

২। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত রচিত 'Rammohun Roy at Rangpur' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

ডিগবী রংপুর হতে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করলেন। কিন্তু এবার আর নূতন কোন চাকরির সন্ধান করলেন না। হয়ত এখন আর্থিক প্রয়োজনে দেশে দেশে ঘোরার তাঁর আর প্রয়োজন নেই; ইতিমধ্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছেন; প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়েছেন, তাই চাকরির প্রয়োজন তাঁর শেষ হয়েছে। তাছাড়া অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে যে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন এবং তার ফলে জীবনের যে নূতন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন সেই পথের টান অর্থের টান অপেক্ষা এখন তাঁর কাছে অনেক প্রবল। সেই টানেই তিনি রংপুর হতে এলেন কোলকাতায়। কোলকাতা রামমোহনের কাছে নূতন নয়, পুরাতন। ১৭৯১ সাল হতে কোলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। একবার নয়, ইতিমধ্যে বহুবারই তিনি কোলকাতায় এসেছেন। কিন্তু পূর্বের সঙ্গে এবারের যথেষ্ট পার্থক্য। এতদিন কোলকাতার সঙ্গে রামমোহনের যোগ ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যবসাগত। পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার পর তিনি কোলকাতায় নিজস্ব গদী করেছেন, নূতন গোমস্তা নিযুক্ত করেছেন, এখান হতে সিভিলিয়ানদের টাকা ধার দিয়েছেন, সুবিধা-সুযোগ বুঝে কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করেছেন,—অর্থাৎ এক কথায় কোলকাতাকে কেন্দ্র করে রামমোহনের ছিল অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা। কিন্তু এবারের প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন। রংপুরে থাকার সময় স্বদেশের সমস্ত রকম অজ্ঞানতা দূর করার জন্য যে সাধনার তিনি সূত্রপাত করেছিলেন, কোলকাতায় এলেন তারই পূর্ণ পরিণতির আশায়।

রংপুরে অবস্থানকালেই রামমোহন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, মনে হয়, মোটামুটি-ভাবে ঠিক করেছিলেন। তাই সেই সময় কোলকাতায় নিজের নামে দুটি বাড়ী ক্রয় করেন। একটি চৌরঙ্গীতে, অপরটি সিমলায়। চৌরঙ্গীর বাড়ীটি এলিজাবেথ ফেনউইক নামে একজন ইংরাজ ভদ্রমহিলার কাছ হতে ২০৩১৭ টাকায় কেনা হয়। আর সিমলার বাড়ীটি কেনা হয় ১৩০০০ টাকায় ফ্রান্সিস মেণ্ডেস

নামে এক সাহেবের কাছ হ'ত। যদিও জোড়াসাঁকোয় রামমোহনের নিজস্ব একটি বাড়ী ছিল তবুও সেই বাড়ীটিকে তিনি তাঁর বর্তমান কাজের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন নি। তাই এই নূতন বাড়ী দুটি ক্রয় করার প্রয়োজন হয়; এবং যতদূর মনে হয় এই সময় রামমোহন জোড়াসাঁকোর বাড়ীটি বিক্রী করেন। নূতন বাড়ীতে এসে রামমোহন নূতন জীবন শুরু করলেন। এখন হতেই শুরু হল তাঁর কর্মজীবনের বিকাশপর্ব।

রংপুরে থাকার সময় রামমোহন ঘরোয়া সভায় শাস্ত্রালোচনা করতেন। এই আলোচনাকে উপলক্ষ করে সেদিন একটি ছোটখাট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যার কেন্দ্রে ছিলেন রামমোহন। সেথায় কিছু সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। ধীরে ধীরে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন রামমোহনের সমর্থক। কিন্তু রংপুরের জীবনে ছেদ টেনে রামমোহন যখন এলেন কোলকাতায়, তখন তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল এই সমস্ত সমর্থকদের সঙ্গে। তাই নূতন পরিবেশে প্রয়োজন হল নূতন করে একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলা। রামমোহন তৎপর হলেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে সহায় হল তাঁর প্রচুর ধন-সম্পত্তি। এরই বলে অল্পদিনেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন কোলকাতার ধনী-সমাজে। তাঁর ধন-সম্পত্তি, তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি ও তাঁর পাণ্ডিত্য অনেকেই আকৃষ্ট হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের নিয়ে রামমোহন গঠন করলেন 'আত্মীয়সভা'। এখানে যাঁরা যোগ দিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই কোলকাতার গণ্য-মান্য ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর, বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার, দ্বারকনাথ ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার নব জাগরণের সেই সূচনায় সমষ্টিগত-ভাবে এঁদের নিষ্ঠা, কর্ম ও ত্যাগের নিদর্শন চিরস্মরণীয়। আত্মীয় সভার বৈঠক প্রথম হয় রামমোহনের মাণিকতলার বাড়ীতে। তারপর অন্যান্য সভ্যদের গৃহও এই সভার কার্যস্থল হয়ে উঠে। প্রধান প্রধান পর্ব দিনে সভার অধিবেশন হত। মনে হয় এর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হল, পৌত্তলিক হিন্দুদের কার্যাবলীর সঙ্গে এই সভার কার্যধারার পার্থক্য প্রদর্শন। সভার কার্যনির্বাহক ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেদপাঠ ও তার ব্যাখ্যা এবং শাস্ত্র আলোচনা ছিল সভার প্রধান অঙ্গ। শিবপ্রসাদ মিশ্র নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করতেন। সবশেষে হত ব্রহ্মসংগীত। শাস্ত্র আলোচনা যদিও ছিল

সভার মুখ্য কার্যসূচী তবুও সমাজের অন্যান্য সমস্যার আলোচনাও মাঝে মাঝে সেখানে স্থান পেত। আত্মীয় সভায় সমাবেশ এবং আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই কোলকাতার বুকে গড়ে উঠল রামমোহনের অনুরক্তমণ্ডলী।

এই সময় ১৮১৫ সালের প্রায় মাঝামাঝি রামমোহন কোলকাতা ছেড়ে বাইরে যান। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সর্বপ্রথম এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর সম্পাদিত 'প্রাচীন বাঙ্গলা পত্রসঙ্কলন' গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি পত্রে এর উল্লেখ আছে। এই পত্রগুলি হতে জানা যায় যে রংপুরে থাকার সময় ভুটান ও কুচবিহারের সীমানা সংক্রান্ত ব্যাপারে রামমোহন ডিগবীর সঙ্গে একবার ভুটান যান। এরপর আবার এই সময় ঐ সীমানা সংক্রান্ত বিবাদ মিটমাটের জন্য তিনি কৃষ্ণকান্ত বসুর সঙ্গে আর একবার ভুটান যান। কৃষ্ণকান্ত ও রামমোহন গোয়ালপাড়া হতে বিজনি এবং সেখান হতে সিভলি ও চেরঙ্গের পথে পাচু-মাচু উপত্যকা অতিক্রম করে পুনাখে পৌঁছেন। পুনাখ ভুটানের শীতকালের রাজধানী। ১৮১৫ সালের আশ্বিন মাসে লিখিত একটি পত্রে ভুটানের দেবরাজা রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান যে তাঁর উকীল রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসু মারফৎ তিনি তাঁর চিঠি ও উপহার পেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে একথাও জানান যে ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম অনুসারে কৃষ্ণকান্তকে রেখে রামমোহন ফিরে গেলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভুটানে রামমোহন দীর্ঘদিন অবস্থান করেননি। তিনি পৌঁছবার পরই প্রত্যাবর্তন করেছেন।

রামমোহনের এই ভুটান যাত্রাকে কেন্দ্র করে মিস্ কলেটের গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় কিছু নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। Supplementary Notes অংশে তাঁরা এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'It is also clear that even after the departure of Mr. Digby in 1814, from Rangpur Rammohun was employed in *official* capacity as an envoy by Mr. Scott, the next collector of Rangpur as late as in November 1815. It therefore appears certain that not long after his temporary removal from *dewanship* Rammohun was reinstated as *dewan* at Rangpur by the Board of

Revenue,'[১] এই সঙ্গে আরও লিখেছেন, 'According to the evidence of the above documents Rammohun's final return to Calcutta from Rangpur could not possibly have taken place before about the end of the year 1815.'[২] কিন্তু এ দুটি সিদ্ধান্তই সঠিক নয়। রামমোহন যে 'official capacity'তে এই কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন তার কোন উল্লেখ কোথাও নেই। সুতরাং রামমোহন যে পুনরায় রংপুরে দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন তা বলা চলে না। রামমোহন যদি এই সময় রংপুরে দেওয়ান হিসাবে সরকারী কার্যে নিযুক্ত থাকতেন তাহলে এই সীমানা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনিই হতেন প্রধান। কিন্তু এখানে তিনি কৃষ্ণকান্তের একজন সঙ্গীমাত্র; সরকারী নথিপত্রে তাঁর নামোল্লেখও নেই। পূর্ব-পরিচিত হিসাবেই দেবরাজ তাঁর চিঠিতে রামমোহনের উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ সেনের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, 'পরবর্তীকালে স্যার এসলি ইডেন ও কাপ্তেন পেম্বার্টন ১৮১৫ সালের দৌত্য প্রসঙ্গে কেবল কৃষ্ণকান্তেরই নাম করিয়াছেন, রামমোহনের নাম উল্লেখ করেন নাই। এমন কি রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিড স্কটও তাঁহার ২৬শে সেপ্টেম্বরের (১৮১৫ সাল) পত্রে একাধিক উকীলের কথা লিখেন নাই, মাত্র একজন উকীলের কথা বলিয়াছেন। তবে রামমোহন কি কৃষ্ণকান্তের সহকারী ছিলেন? অসম্ভব নহে। ভুটানের রাজার পত্রেই প্রকাশ যে মরাঘাটের সীমানা সম্পর্কীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব মীমাংসা সম্বন্ধে রামমোহন ওয়াকিবহাল ছিলেন। অথচ ডিগবি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় তিনিও উত্তরবঙ্গ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ভুটান ভ্রমণের এই সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাই, তাই তিনি হয়ত কৃষ্ণকান্তের সহকারী হিসাবেই ভুটান যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। সরকারী হিসাবে একজন উকীলই ভুটানে গিয়াছিল, সহকারীকে গণনার মধ্যে ধরা হয় নাই।'[৩] দেখা যাচ্ছে যে রামমোহন সরকারী হিসাবে নয়, সহকারী হিসাবেই ভুটান গিয়েছিলেন। ভুটান যাত্রা, দেবরাজের পত্র, সরকারী নথিপত্র—কোন কিছু হতেই একথা

১। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৪০

২। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৪১

৩। প্রাচীন বাঙ্গলা পত্র-সঙ্কলন—ভূমিকা

প্রমাণিত হয় না যে ডিগবীর চলে যাওয়ার পর রামমোহন রংপুরে পুনরায় দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন।

১৮১৪ সালের জুলাই মাসে ডিগবী রংপুর ত্যাগ করে ইংলণ্ড রওনা হন। দীর্ঘ এক বৎসরের বেশী পরে ১৮১৫ সালের আশ্বিন মাসে রামমোহন ভুটান যান এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। রামমোহনের প্রায় সমস্ত জীবনচরিতকারদের মত হল, তিনি ডিগবীর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রংপুর ত্যাগ করে কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন; অবশ্য তখন রামমোহনের ভুটানযাত্রা প্রসঙ্গ জানা ছিল না। কিন্তু যেহেতু রামমোহন ১৮১৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ভুটান যান অতএব ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে তিনি কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি, একথা বলা চলে না। বরং এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে ডিগবীর চলে যাওয়ার পরই রামমোহনও কোলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং তার দীর্ঘ একবৎসরেরও বেশী পরে কিছু দিনের জন্য কৃষ্ণকান্তের সহকারী হিসাবে ভুটান যান। ভুটান হতে ফেরার পর রামমোহন যে কোলকাতায় বসবাস করতে আসেন তার কোন উল্লেখ কোথাও নেই,—সমস্তটাই অনুমান মাত্র। কিন্তু রামমোহন যে ইতিপূর্বেই কোলকাতায় বসবাস শুরু করেছিলেন তার নানা প্রমাণ আছে। প্রথমত: Memoir of William Yates গ্রন্থ হতে জানা যায়, 'Mr. Yates became acquainted with him shortly after his arrival in India, so early as oct 25, 1815.' সুতরাং এর আগেই রামমোহনের কোলকাতার জীবন শুরু হয়েছিল এবং তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত: ১৮২৩ সালের জুন মাসে বর্ধমান মহারাজার সঙ্গে রামমোহনের যে মামলা হয় সেখানে রামমোহন বলেছেন যে তিনি 'for the last nine years lived in the town of Calcutta.' হিসাব করলে দেখা যায় রামমোহন কোলকাতায় এসেছিলেন ১৮১৪ সালে। তৃতীয়ত: গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে রামমোহনের যে মামলা হয় সেখানে গুরুদাস মুখার্জী তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, 'in the Bengali year one thousand two hundred and twenty one the defendant Rammohun Roy returned to Calcutta.' এখানেও দেখা যায় রামমোহনের কোলকাতা-আগমন কাল হল ১৮১৪ সাল। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ১৮১৪

সালে রামমোহন রংপুর ত্যাগ করে কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং পরে ১৮১৫ সালের শেষের দিকে তিনি কিছু দিনের জন্য ভুটান যান।

রামমোহন কোলকাতায় এসে আত্মীয় সভা স্থাপন করলেন। আত্মীয় সভার অধিবেশনে শাস্ত্র আলোচনা হত, বেদপাঠ হত এবং ব্রহ্ম-সংগীত গীত হত। তাছাড়া অন্যান্য সামাজিক সমস্যাও সেখানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হত। যাঁরা এখানে আসতেন তাঁরা যে প্রত্যেকে প্রথম হতেই এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আসতেন তা নয়; বিষয়ী রামমোহনের নিকট বিষয়কর্মের পরামর্শ গ্রহণ করতে এসে তাঁর এই নূতন পরিচয়ে তাঁরা মুগ্ধ হতেন এবং ক্রমে সভায় যোগদান করতেন। রামমোহনের চিন্তাধারা, তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ছিল সে যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তখনকার হিন্দুসমাজের অবস্থা সম্বন্ধে 'রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য' যা লিখেছেন তা হতে এর প্রমাণ মেলে। সেই রচনার অংশবিশেষ এইরূপ: 'রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল। ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভার ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাকহবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়াও, স্বদেশীদিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের

যশঃ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা বর্ণনা করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা বিঘ্নবিনাশপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।' [১]

দেশের এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে আত্মীয় সভা বাস্তবিকই অভিনব। এই সভার সভ্যদের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হত; তার মধ্যে প্রধান ছিল পৌত্তলিকতা বর্জন। কিন্তু এই সভা শুধুমাত্র পৌত্তলিকতা বর্জনের মধ্যে সীমিত ছিল না, বহুবিবাহ, সতীদাহ, জাতিবিচার প্রভৃতি অন্যান্য সামাজিক সমস্যাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হত। এই সভায় যোগদান যেমন শুধুমাত্র হিন্দুদের মধ্যে সীমায়িত ছিল না, তেমনি এখানকার আলোচনা কেবলমাত্র সভ্যদের মধ্যে আবদ্ধ থাকত না। বাইরের যে-কেউ সেই আলোচনায় যোগ দিতে পারতেন। কেউ প্রশ্ন পাঠালে সভার পক্ষ হতে তার জবাব দেওয়ার রীতি ছিল। এমন এক প্রশ্নকর্তার নাম উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ। উৎসবানন্দ কয়েকবার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্ন পাঠান এবং সভার পক্ষ হতে রামমোহন তার উত্তর দেন। উৎসবানন্দের সঙ্গে রামমোহনের যে শাস্ত্রবিচার হয় 'এই বিচারের উত্তর প্রত্যুত্তর সম্বলিত চারিখানি পুস্তিকা শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে; এগুলি সংস্কৃতে রচিত এবং বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত।' রামমোহন-গ্রন্থাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে রামমোহনের উত্তরের সঙ্গে উৎসবানন্দের প্রশ্নগুলিও মুদ্রিত হয়েছে।

১। নগেন্দ্রনাথের গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত।

সন ১৩২৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ ভট্টাচার্যের প্রশ্নটি আত্মীয় সভায় উপস্থাপিত করেন। রামমোহন এর যে উত্তর দেন তাতে কোন তারিখের উল্লেখ নেই। রামমোহনের উত্তরের প্রত্যুত্তর ১৯শে আশ্বিন শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দত্তের হস্তে প্রেরিত হয়। ঐ ভৈরবচন্দ্রের হস্তেই রামমোহন ৩১শে আশ্বিন এর উত্তর দেন। রামমোহনের এই উত্তরের প্রত্যুত্তর হিসাবে উৎসবানন্দ যা লেখেন তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি ; কেবলমাত্র রামমোহন লিখিত ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখের উত্তরটি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে এবং পরেও আরও কিছু উত্তর প্রত্যুত্তর রচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

উৎসবানন্দের সঙ্গে রামমোহনের শাস্ত্রবিচার হয় সন ১৩২৩ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮১৬ সালে। ‘প্রকৃতপক্ষে এই বিচারকেই রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচারগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম গণ্য করিতে হইবে।’ বিচারে রামমোহন উৎসবানন্দকে স্বপক্ষে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে উৎসবানন্দকে ব্রাহ্মসমাজে দেখা যায়।

॥ দুই ॥

রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন যে সমস্ত ঘরোয়া বৈঠক করতেন, শাস্ত্র ছিল সেখানে প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সময় তিনি গভীরভাবে হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এই অধ্যয়ন ও আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তের অনুবাদ শুরু করেন। এমনও হতে পারে যে রংপুরেই তা শেষ হয়। যাই বা হোক, কোলকাতার কর্মজীবনে বেদান্তের অনুবাদ নিয়েই রামমোহনের প্রথম আবির্ভাব। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস থেকে রামমোহনের বেদান্তের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হল। আখ্যাপত্রে লিখিত হল, 'The Bengalee Translation of the Vedant, or resolution of all the Veds; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology, establishing the unity of The Supreme Being and that he is the only object of worship, together with a preface by the translator.' রামমোহনের এই অনুবাদ হিন্দুসমাজের উপর এক প্রচণ্ড আঘাতের মত এসে পড়ল। দীর্ঘদিনের প্রশ্নহীন আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে হিন্দুসমাজ যে দুর্ভেদ্য অচলায়তন গড়ে তুলেছিল, তারই মধ্য হতে অকস্মাৎ এমন করে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হবে, এ ছিল তার আশার অতীত। যে-পৌত্তলিকতা তার ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য, রামমোহন স্পষ্ট উচ্চারণে তারই বিরুদ্ধে হানলেন তীক্ষ্ণতম প্রতিবাদ। আখ্যাপত্রে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের যা 'most celebrated and revered work' তার মূল প্রতিপাদ্য হল 'unity of The Supreme Being' এবং 'he is the only object of worship'. তেত্রিশ কোটি দেবতার নৈবেদ্য সাজিয়ে যে সমাজ পরম নিশ্চিন্তে ছিল বসে, এক মুহূর্তেই তা সচকিত হয়ে উঠল। রামমোহন ভূমিকায় স্পষ্টভাবে লিখলেন, 'লোকেতে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকো এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে একপ্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব্ব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে

জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।'

বেদ হিন্দুধর্মের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের পবিত্রতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য তার পাঠ সীমিত ছিল কেবলমাত্র বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যে। শূদ্রের পক্ষে বেদপাঠ ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারও এ শাস্ত্র পাঠ করা ত দূরের কথা স্পর্শ করারও অধিকার ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে ব্রাহ্মণরা বেদের সর্বস্বত্ব এই ভাবে তাঁদের মধ্যে সংরক্ষিত করে রেখেছিল। কিন্তু রামমোহনের অনুবাদ তাকে সেই বিশেষ গোষ্ঠীর কবল হতে মুক্ত করে সমগ্র সমাজের মধ্যে প্রচার করে দিল।

বেদান্ত একদিকে যেমন আকারে বৃহৎ, অন্যদিকে তেমনি সাধারণের বোধগম্যতার পক্ষে অপেক্ষাকৃত দুরূহ। বেদান্তের অনুবাদের পর রামমোহনের আশঙ্কা হল যে এত বৃহৎ ও দুরূহ গ্রন্থ পাঠ করে তার অর্থ উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি বেদান্তের সার সংকলন করে ঐ বৎসরেই প্রকাশ করলেন 'বেদান্তসার'। গ্রন্থশেষে লিখলেন, 'এই বেদান্তসারের বাহুল্য এবং বিচার যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা হয় তাঁহারা বেদান্তের সংস্কৃত ও ভাষা বিবরণে জানিবেন।' 'বেদান্তসার' প্রথমে বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষায় অনূদিত হয়। 'বেদান্ত' ও 'বেদান্তসার' উভয়গ্রন্থই রামমোহন নিজব্যয়ে মুদ্রিত করেন এবং দেশবাসীর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। কিন্তু তবুও সকলের মধ্যে বেদান্তের বাণী প্রচার করা সম্ভব হল না। কেননা তখন বাংলাদেশের, বিশেষ করে কোলকাতার অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ ছিল ইংরাজ সম্প্রদায়। তাই তাঁদের জন্য রামমোহন ইংরাজী অনুবাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত হল বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদ। ভূমিকায় রামমোহন লিখলেন, 'The present is an endeavour to render an abridgment of the same into English, by which I expect to prove to my European friends, that the superstitious practices which deform the Hindoo religion have nothing to do with the pure spirit of

its dictates'. ইংরাজদের কাছেও হিন্দুধর্মের মূলকথাকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল। কেননা একদিকে যেমন তাদের পক্ষে হিন্দুধর্মের প্রচলিত রূপকেই সত্য বলে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট, অন্যদিকে তেমনি হিন্দুধর্মের অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপকে লঘু করে দেখার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছেন, 'I have observed that both in their writings and conversation, many Europeans feel a wish to palliate and soften the features of Hindoo idolatry ; and are inclined to inculcate, that all objects of worship are considered by their votaries as emblematical representations of the Supreme Divinity' কিন্তু তা সত্য নয়। তাই রামমোহন দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, '......the truth is, the Hindoos of the present day have no such views of the subject, but frimly believe in the real existence of innumerable gods and goddesses, who possess, in their own departments, full and independent power, and to propitiate them, and not the true God, are temples erected and ceremonies performed.' প্রচলিত হিন্দুধর্ম একেই সত্য বলে স্বীকার করে এবং সম্মান দেয়। অথচ সত্য হচ্ছে, রামমোহনের ভাষায়, 'every rite has its derivation from the allegorical adoration of the true Deity ; at the present day all this is forgotten, and among many it is even heresy to mention it.' তাই হিন্দুধর্মের সেই সত্যস্বরূপটিকে বিস্মৃতির ধূলি-মালিন্য হতে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হলেন রামমোহন।

এক কথায়, রামমোহন ব্রতী হলেন ধর্মসংস্কারে। কিন্তু তাঁর এই সংস্কারপ্রচেষ্টার পশ্চাতে কোন দার্শনিক অথবা আধ্যাত্মিক মনের সক্রিয়তা ছিল না; এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সামাজিক কল্যাণচিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত। এখানেই রামমোহনের বৈশিষ্ট্য। তাঁর পূর্বে যাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ধর্মকে যুক্ত করে দেখেছেন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে; যেটুকু সামাজিক কল্যাণ হয়েছে, তা পরোক্ষ ফল মাত্র। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সামাজিক কল্যাণচিন্তাকে লক্ষ্য করে ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করার প্রচেষ্টা প্রথম দেখা

দিল রামমোহনের মধ্যে। তিনি মানুষকেই অবলম্বন করলেন এবং তার পার্থিব জীবনের সুখ সুবিধার প্রয়োজনে ধর্মীয় আচার-আচরণের সংস্কারে ব্রতী হলেন। এই মানবমুখিনতাই উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। এখন থেকেই শুরু হল বাঙালীজাতির আত্মচেতনার প্রথম লাবণ্য-প্রভাত। আলোয়-আশায় জড়িত অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠে রামমোহন ঘোষণা করলেন, 'My constant reflections on the inconvenient, or rather injurious rites introduced by the peculiar practices of Hindoo idolatry, which, more than any other pagan worship, destroys the texture of society, together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error…….'

বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হল ১৮১৬ সালের প্রথম দিকে। ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে গভর্নমেণ্ট গেজেট এর সম্বন্ধে মন্তব্য করল, 'The pamphlet is exceedingly curious, and whatever its intrinsic merits may be in a theological point of view, displays the deductions of a liberal, bold and intrepid mind.' এই মন্তব্যের সঙ্গে বেদান্তসারের ভূমিকাটিও মুদ্রিত হল। ভূমিকা পাঠে মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল এতই বেশী হতে লাগল যে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গভর্নমেণ্ট গেজেট সম্পূর্ণ বেদান্তসার মুদ্রিত করল। সাধারণের এই ক্রমবর্ধমান কৌতূহল রামমোহনের পরিচয়কে ভারতের সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছে দিল সুদূর ইংলণ্ডে। সকলেরই দৃষ্টি পড়ল রামমোহনের উপর; সকলেরই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলেন রামমোহন। তারই ফলে ১৮১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন হতে প্রকাশিত মিশনারী রেজিষ্টারে বেদান্তসার গ্রন্থ ও তার গ্রন্থকার সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা লিপিবদ্ধ হল। রামমোহনের বয়স, তাঁর শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা, হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, তাঁর চরিত্র, তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস সমস্ত বিষয়ে এই কয় মাসে যত সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছেছিল তার বিস্তারিত বিবরণও বেদান্তসারের বক্তব্যের সঙ্গে স্থান পেল। ১৮১৭ সালে বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হল লণ্ডন হতে; ভূমিকা লিখলেন জন ডিগবী। ঐ

বৎসরই এই পুস্তকখানি জার্মান ভাষায় Auflosung des Wedant নামে (Jena, 1817) প্রকাশিত হল।

দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল রামমোহনের প্রশংসা। কিন্তু স্বদেশে তাঁর বিরুদ্ধে ধুমায়িত হয়ে উঠল একটা চাপা আক্রোশ। পৌত্তলিক হিন্দুসমাজকে যে আঘাত তিনি দিয়েছিলেন তারই প্রতিঘাত এল তাঁর উপর। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁকে নানা দিক হতে আক্রমণ শুরু করল। এই প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছেন, 'some of them are became very ill disposed towords me,' ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটি লিখেছে, 'He is said to be very moral ; but is pronounced to be a most wicked man by the strict Hindoos.' মিশনারী রেজিষ্টার হতে জানা যায়, 'The Brahmins had twice attempted his life but he was fully on his guard.' শুধুমাত্র রক্ষণশীল সমাজের কিছু ব্যক্তি নন, রামমোহনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাও এই ব্যাপারে তাঁর উপর অত্যধিক রুষ্ট হয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে বেদান্তসারের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahmin, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong and whose temporal advantage depends upon the present system. 'রামমোহনকে কেন্দ্র করে চারিদিক হতে এই ধরণের অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠল ; এবং তারই ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ও তাঁর রচনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হল। এই প্রচারে বলা হল যে বেদান্তের অনুবাদে যা বলা হয়েছে তা প্রকৃত হিন্দুধর্মের বক্তব্য নয়, রামমোহনের নিজস্ব মত মাত্র। এই সম্বন্ধে ঈশ-উপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন, 'বেদান্তের বিবরণ ভাষাতে হইবার পরে প্রথমত স্বার্থপর ব্যক্তিরা লোক সকলকে ইহা হইতে বিমুখ করিবার নিমিত্ত নানা দুষ্প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছিলেন এখন কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয় তোমরা ইহাকে কেন পড় আর গ্রহণ কর অর্থাৎ ইহা শুনিলে অনেকের অভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া এ শাস্ত্রকে একজন আধুনিক মনুষ্যের মত জানিয়া ইহার অনুশীলন হইতে নিবর্ত্ত হইতে পারিবেন।' স্বার্থপর ব্যক্তিদের এই ধরণের 'দুষ্প্রবৃত্তির'র স্বরূপ উদ্ঘাটনের নিমিত্ত রামমোহন বেদান্তের প্রতিপাদ্যকে ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হলেন।

উপনিষদ অনূদিত হল বাংলায় এবং ইংরাজীতে। ১৮১৬ সালের জুন মাসে কেন উপনিষদ এবং জুলাই মাসে ঈশ-উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশিত হল। ঈশ-উপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন লিখলেন, 'ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে সমুদায় বেদ একবাক্যতায় বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর যে ব্রহ্ম কেবল তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন সেই সকল সূত্রের অর্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বুঝিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই ভাষ্যের অনুসারেতে ভাষাতে করিবার যত্ন করা গিয়াছে · '। রামমোহন আশা করলেন যে এই অনুবাদ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে তা সংশোধন করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করার সহায়তা করবে এবং যে-সমস্ত আচরণ সমাজের সাধারণ সুখ-সুবিধা হতে জনসাধারণকে এতদিন বঞ্চিত করে আসছিল তাদেরও বিলোপ ঘটাবে। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও নানা কুসংস্কার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পচন ক্রিয়া শুরু করেছিল। স্বার্থপর ব্রাহ্মণরা নানা নিষেধের প্রাচীর তুলে এবং নানা কৌশল অবলম্বন করে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থকে রেখেছিল গোপন করে। সুতরাং রামমোহন যখন শাস্ত্র অনুবাদ করে জনসমাজের সামনে তুলে ধরলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা রুষ্ট হলেন। রামমোহনের প্রচেষ্টা যাতে সফল না হতে পারে তার জন্য রামমোহনের অনুবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করতে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাই জনসাধারণ যাতে এই সমস্ত চক্রান্তের মধ্যে পড়ে প্রকৃত সত্য গ্রহণ করতে দ্বিধা না করে তার জন্য রামমোহন আবেদন জানালেন জনসাধারণের শুভবুদ্ধির দ্বারে। তিনি লিখেছেন, 'I may conclude this subject with an appeal to the good sense of my countrymen, by asking them "whose advice appears the most disinteresed and most rational—that of those who, concealing your scriptures from you, continually teach you thus, 'Believe whatever we may say—don't examine or even touch your scriptures, neglect entirely your reasoning faculties—do not only consider us, whatever may be our principles, as gods on earth, but humbly adore and propitiate us by sacrificing

to us the greater part (if not the whole) of your property :' or that of the man who lays your scriptures and their comments as well as their translations before you, and solicits you to examine their purport, without neglecting the proper and moderate use of reason ; and to attend strictly to their directions, by the rational performance of your duty to your sole Creator, and to your fellow creatures, and also to pay true respect to those who think and act righteously.' '[1]

চোখ বুজে বিশ্বাস করা নয়, চোখ চেয়ে যুক্তি-বিচারের সাহায্যে সত্য গ্রহণ করার জন্য রামমোহন জনসাধারণকে ডাক দিলেন। ফলে তৎপর হয়ে উঠলেন হিন্দুসমাজের কর্ণধারগণ। আরম্ভ হল মসীযুদ্ধ। ইতিপূর্বে রামমোহন মৌখিক তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। রংপুরে ঘরোয়া বৈঠকে নানা আলোচনা করেছেন, কোলকাতায় আত্মীয়সভার বৈঠকেও এই ধরণের আলোচনা হয়েছে। ডিগবীকে লিখিত পত্রে 'verbal argument'-এ নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন রামমোহন। কিন্তু মসীযুদ্ধ এই প্রথম। ছাপাখানার মাধ্যমে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে জনমত গঠন উনিশ শতকের ভারতবর্ষে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করল।

১৮১৬ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা রামমোহনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে একটি আলোচনা প্রকাশ করে। ২৬শে ডিসেম্বর 'মাদ্রাজ কুরিয়র'-এ মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট স্কুলের প্রধান ইংরাজী শিক্ষক শঙ্কর শাস্ত্রী স্বাক্ষরিত একটি পত্র মুদ্রিত হয়। এই পত্রে রামমোহনের এবং তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের সমালোচনা করা হয়। ১৯শে তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেট' রামমোহনকে 'a discoverer and reformer,' হিসাবে বর্ণনা করে। শঙ্কর শাস্ত্রীর বক্তব্য হল যে বেদ বেদান্তে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা আছে, উহা রামমোহনের নিজস্ব মত নয়। সুতরাং তাঁকে ধর্মসংস্থাপক অথবা ধর্মসংস্কারক আখ্যা দেওয়া যায় না। তাছাড়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা বেদসম্মত হলেও দেব-দেবীর উপাসনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এই সম্বন্ধে উপমা দিয়ে

১। Preface—Ishopanishad.

তিনি লিখলেন যে সাধারণের পক্ষে কোন রাজার নিকট যেতে হলে যেমন রাজকর্মচারীর সাহায্য আবশ্যক হয়, তেমনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার অধিকারী হওয়ার পূর্বে দেব-দেবীদের উপাসনাও একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

শঙ্কর শাস্ত্রীর পত্র ইংরাজীতে লিখিত, সেইজন্য রামমোহনও তার জবাব হিসাবে ইংরাজীতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। পুস্তিকাটির নাম, 'A defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for idolatry at Madras.' 'মাদ্রাজ কুরিয়র' পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রটিতে শঙ্কর শাস্ত্রীর নাম স্বাক্ষরিত থাকা সত্ত্বেও, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করার জন্য রামমোহন পত্রলেখকের আসল পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর মত হল, 'the letter in question is the production of the pen of an English gentleman….' যাই বা হোক, শঙ্কর শাস্ত্রীর অভিযোগের উত্তরে তিনি লিখলেন যে নূতন ধর্মমতের সংস্থাপনকর্তা হিসাবে তিনি নিজেকে কোথাও কোনভাবেও প্রকাশ করেননি। পৌত্তলিক পূজা সম্বন্ধে শঙ্কর শাস্ত্রী যা লিখেছিলেন রামমোহন তার উত্তরে শাস্ত্র হতে প্রভূত শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রমাণ করলেন যে উক্ত মত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। ব্রহ্ম ও অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে রাজা ও রাজকর্মচারীদের যে তুলনা শঙ্কর শাস্ত্রী করেছিলেন তার উত্তরে রামমোহন লিখলেন, 'I must observe, however, in this place, that the comparison drawn between the relation of God and those attributes and that of a king and his ministers, is totally inconsistent with the faith entertained by Hindoos of the present day; who, so far from considering these objects of worship as mere instruments by which they may arrive at the power of contemplating the God of nature, regard them in the light of independent gods, to each of whom, however absurdly, they attribute almighty power, and a claim to worship, solely on his own account.'

রামমোহনের Defence of Hindoo Theisn গ্রন্থের প্রতিবাদে আর কোন

রচনা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু শঙ্কর শাস্ত্রীর বেনামীতে যে ইংরাজ ভদ্রলোক কলম ধরেছিলেন, মনে হয়, তিনিই কিছুদিন পরে অন্যভাবে রামমোহনকে আক্রমণ করলেন। এই ইংরাজ ভদ্রলোকের নাম এলিস। ইনি মাদ্রাজ লিটারারী সোসাইটির সভ্য ছিলেন। ১৮১৭ সালের ৬ই আগষ্ট চৌরঙ্গীতে এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভা হয়; সভাপতি ছিলেন মিঃ হ্যারিংটন। সভায় মিঃ এলিস লিখিত একটি রচনা পঠিত হয়। এই রচনায় রামমোহনের নামে প্রতারণার অভিযোগ উত্থাপিত করা হয়। Robertus De Nobilibus নামে এক ব্যক্তি আনুমানিক ১৬২০ সালে মাদুরায় একটি মিশন তৈরী করেন। তিনি বেদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছিলেন। মিঃ এলিসের বক্তব্য হল যে রামমোহনের রচনা সেই আলোচনা হতে আহরিত। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন, 'The whole scope of the Pseudo-Vedes is evidently the destruction of the existing belief of the Hindoos, without regarding consequences or caring whether a blank be substituted for it or not. The writings of Rammohun Roy seem to be precisely of the same tendency as the discussion of Robertus De Nobilibus.'

এশিয়াটিক সোসাইটির উক্ত সভার বিবরণ এবং এলিসের অভিযোগ Calcutta Monthly Journal-এ প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকাই পরবর্তী সংখ্যায় এলিসের অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করে। এলিসের অভিযোগটি উল্লেখ করে পত্রিকা এ সম্বন্ধে লিখল যে রামমোহন হিন্দুর ধর্ম ও বিশ্বাস ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করছেন না। হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে যে সমস্ত অপ্রামাণ্য বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং শাস্ত্র-গ্রন্থ সম্পর্কে যে সমস্ত অপব্যাখ্যার প্রচলন ঘটেছে, রামমোহন সেগুলি তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে তুলে ধরছেন। পত্রিকা লিখল, 'The Pseudo-Vedes alluded to by Mr. Ellis was written, it seems, to refute the doctrine as well as to show absurdities of ceremonies inculcated by the Bramins. Now if we understand the writings of Rammohun, they are not intended to refute doctrines in their genuine language and there by

to show, that many of the ceremonies of the present day, are neither enjoyed by these doctrines, nor consistant with the pure system of Hindoo worship, which acknowledges only one God' পত্রিকার এই প্রতিবাদ এলিসের অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। এ সম্বন্ধে রামমোহনকে আর কিছু লিখতে হয়নি। এলিসও এর উত্তরে আর কিছু লেখেন নি।

পৌত্তলিকতার সমর্থনে শঙ্কর শাস্ত্রীই প্রথম রামমোহনের প্রতিবাদ করেন। এর কিছুদিন পরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্তসার'-এর প্রতিবাদে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' প্রকাশ করলেন। 'মৃত্যুঞ্জয় প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত এবং পরে (১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি) স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকনটেনের অধীনে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত হন।' মৃত্যুঞ্জয়ের বেদান্তচন্দ্রিকা বাংলা এবং ইংরাজী উভয় ভাষাতে রচিত। সুতরাং রামমোহনও এর প্রত্যুত্তর বাংলা এবং ইংরাজী উভয় ভাষাতেই দিলেন। রামমোহনের বাংলা পুস্তকটির নাম 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'; ইংরাজী পুস্তকটির নাম, 'A second defence of the monotheistical system of the Vedes; in reply to an apology for the present state of Hindoo worship.' বাংলা পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৩৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮১৭ সালের মে-জুন মাসে। এর কয়েক সপ্তাহ পরেই ইংরাজী পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। রামমোহন শাস্ত্র হতে প্রচুর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে এবং শাস্ত্রসম্মত যুক্তি দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ের মত খণ্ডন করেন। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর গ্রন্থে রামমোহনকে নানাভাবে বিদ্রূপ করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি নানা কটুভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। রামমোহন এই প্রসঙ্গে লিখলেন, 'আমাদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের এমত রীতিই নহে যে, দুর্ব্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই। অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।' রামমোহনের এই উক্তি তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতি ও উন্নত রুচির পরিচায়ক।

মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে রামমোহনের বাদ-প্রতিবাদ হয় ১৮১৭ সালের মে-জুন মাসে।

রামমোহন ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে কঠোপনিষদের এবং অক্টোবর মাসে মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদ প্রকাশিত হওয়ার পর Calcutta Monthly Journal-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় রামমোহনের আর এক দফা প্রশস্তি মুদ্রিত হয়। এই প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকার মন্তব্য হল, 'If the labours of Luther in the western world are entitled to be commemorated by christians—the Herculean efforts of the individual, we have alluded to, must place him high among the benefactors of the Hindoo portion of mankind.' এরপর রামমোহন অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে।

মৃত্যুঞ্জয়ের পর রামমোহনের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করলেন জনৈক গোস্বামী। 'পরিপূর্ণ ১১ পত্রে' তিনি যা লিখেছিলেন রামমোহন তার উত্তর দিলেন দীর্ঘ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পুস্তকে। পুস্তকটির নাম, 'গোস্বামীর সহিত বিচার'। এটি রচিত হয় ১২২৫ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে; অর্থাৎ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। গ্রন্থের প্রথমে রামমোহন লিখেছেন, 'অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপি যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্যে ভগবদ্গৌরাঙ্গ-পরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন।' গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন তাঁর গ্রন্থে যা প্রতিপন্ন করলেন তা হল, 'বেদার্থ নির্ণয়পক্ষে স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেরই প্রাধান্য। ভাগবত শাস্ত্র বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহে।' গোস্বামীর সঠিক পরিচয় জানা যায়নি। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হতে প্রকাশিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয়ের অনুমান হল, 'তিনি রামগোপাল শর্ম্মণঃ।' এই প্রসঙ্গে তাঁরা লিখেছেন, "কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) পরিশিষ্টে মুদ্রিত পুস্তক-তালিকার বাংলা-বিভাগে রামমোহনের একখানি পুস্তিকার এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি :—Reply to a Ms. of Ram-Gopala Sormono. ইহাই 'গোস্বামীর সহিত বিচার' হওয়া সম্ভব।'

গোস্বামীর পর এগিয়ে এলেন কবিতাকার। কবিতাকার নামের আড়ালে যিনি কলম ধরেছিলেন তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। কবিতাকার শুধুমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি, সেই সঙ্গে রামমোহনকে ও তাঁর অনুগামীদের নানাভাবে আক্রমণ করেছেন। রামমোহন তাঁর 'কবিতাকারের সহিত বিচার' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানা প্রকার কটূক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় দ্বেষ প্রযুক্ত কেবল আমাদের প্রতি দুর্ব্বাক্য কহিতে কবিতাকারের সম্পূর্ণ বাসনা ছিল কিন্তু শিষ্ট লোক সকল হঠাৎ নিন্দা করিবেন এই আশঙ্কায় শুদ্ধ গালি না দিয়া গালি ও তাহার মধ্যে ২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন……।' কবিতাকার লিখেছিলেন যে রামমোহন পুস্তক প্রকাশ করে ঘরে ঘরে জ্ঞান বিতরণ করতে চান; তাঁর মত প্রকাশ হওয়ায় দেশে অমঙ্গল, মারীভয় ও মন্বন্তর দেখা দিয়েছে; তাঁরা নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞানী বলে পরিচয় দেন, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানীরা স্বভাবতঃ মৌনী হন; তাঁরা যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করে দরবারে যান। এ ছাড়াও কবিতাকার রামমোহনকে পাষাণ্ড, নাস্তিক প্রভৃতি শব্দে চিহ্নিত করেন। রামমোহন কবিতাকারের প্রতিটি মন্তব্যের যথাযথ উত্তর দিয়ে পরিশেষে লিখেছেন, 'কবিতাকারের প্রতি ক্রোধ না জন্মিয়া আমাদের দয়া মাত্র জন্মে কারণ কুপথ্যাশী রোগী কিম্বা বালককে ঔষধ সেবন করিতে কহিলে অথবা কুপথ্য হইতে নিষেধ করিলে ক্রোধ করে এবং প্রায় দুর্ব্বাক্য কহিয়া থাকে সেইরূপ অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান অন্ধকারে যাহার দৃষ্টির অবরোধ হয় তাঁহাকে অন্যব্যক্তির জ্ঞানোপদেশ অবশ্যই দুঃসহ হইবেক সুতরাং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেই পারেন……।' রামমোহন দীর্ঘ আলোচনা করে লিখেছেন, 'আমাদের সকল পুস্তকের তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে নশ্বর নামরূপ তাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত হয় বর্ণাশ্রমাচার এরূপ সাধনের সহকারি বটে কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক নহে……।' রামমোহনের এই পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮২০ সালে।

ঐ বৎসরই আর একজন তর্ক উত্থাপন করলেন, তিনি সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। রামমোহন

এই তর্কের উত্তর দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায়, বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় এবং ইংরাজীতে An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances নামে ১৮২০ সালে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হতে ছাপিয়ে প্রকাশ করলেন। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী লিখেছিলেন যে বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নয়। যেহেতু শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, তাই তার ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নেই। তাছাড়া বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান না করলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অসম্ভব। 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' পুস্তিকায় রামমোহন প্রতিপন্ন করলেন যে বর্ণাশ্রমকর্মহীন ও বেদাধ্যয়নহীন ব্যক্তিদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। এই ভাবে তিনি স্ত্রীজাতি ও শূদ্রের পরমার্থিক ও সামাজিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে দিলেন।

রামমোহন যখন হিন্দুসমাজকে নানা দিক হতে আঘাত দিতে শুরু করেন তখন রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় শাস্ত্রবিচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে রামমোহনকেও আক্রমণ করেন। ১৮২২ সালে ৬ই এপ্রিল তারিখে সমাচার দর্পণে 'ধর্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' প্রেরিত 'চারি প্রশ্ন' মুদ্রিত হয়। এই সকল প্রশ্নে রামমোহনের কোন কোন মত বা ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছিল। এই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর স্বরূপ রামমোহন ঐ বৎসর মে মাসে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকার ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন, 'চৈত্র মাসে সম্বাদ লিপিতে ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছেন যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না তথাপি সাধারণ নিয়মানুসারে চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে লিখিলাম…'। প্রশ্নকর্তা যেমন নিজের নাম প্রকাশ করেন নি, রামমোহনও তেমনি এই ভূমিকার শেষে নাম স্বাক্ষরের স্থানে লিখলেন, 'সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট'। প্রশ্নকর্তা নিজের নাম উল্লেখ না করলেও রামমোহনের লেখা হতে জানা যায় যে তিনি কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন। কাশীনাথ এই সময়ে কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৮২১ সালে 'ন্যায়দর্শন' প্রকাশ করেন এবং কলেজ-লাইব্রেরীকে দশখণ্ড বিক্রী করেন। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে রামমোহন লিখেছেন, 'আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছসেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায়দর্শন ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে

তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর এবং দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়।' ধর্মসংস্থাপনাকাক্ষীর প্রশ্নগুলির মধ্যে স্বজাতীয় ধর্ম-কর্ম পরিত্যাগ করে বিজাতীয় ধর্ম-কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, ম্লেচ্ছের সাথে মেলামেশা করা, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম করে যজ্ঞোপবীত ধারণ করা, ভোজনের নিমিত্ত ছাগলাদি প্রাণীবধ করা, বৃথা কেশচ্ছেদন করা, সুরাপান করা প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল। রামমোহন একে একে এই সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করেন।

'চারি প্রশ্নের উত্তর' প্রকাশিত হলে ধর্মসংস্থাপনাকাক্ষী সন্তুষ্ট না হয়ে প্রত্যুত্তর হিসাবে 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশিত হয় সন ১২২৯ সালের ২০শে মাঘ, অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। এটিরও রচয়িতা কাশীনাথ তর্ক-পঞ্চানন ; নির্দেশক নন্দলাল ঠাকুর। ইনি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র। 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থে দীর্ঘ ২৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় ধর্ম-সংস্থাপনাকাক্ষী রামমোহনের উত্তরের প্রত্যুত্তর দেওয়ার ছলে তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। রামমোহনকে পাষণ্ড, নাস্তিক, নরাধম, নগরান্তবাসী প্রভৃতি বিশেষণে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও এই গ্রন্থ নানা অশালীন মন্তব্যে পূর্ণ। পাষণ্ডপীড়নের উত্তর হিসাবে রামমোহন 'পথ্যপ্রদান' প্রকাশ করলেন। এটি প্রকাশিত হয় পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে। সমগ্র গ্রন্থটি ২৬১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এটি রামমোহনের সকল বিচার গ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ। পাষণ্ডপীড়নের প্রতিটি মন্তব্য পর পর উল্লেখ করে রামমোহন তার যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। সবশেষে লিখেছেন, 'এই দ্বিতীয় উত্তরের সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই যে পরমেষ্ঠীগুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পরমার্থ সাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হয় এবং নিন্দক মৎসরেরা সর্ব্বথা উপেক্ষনীয় হইয়াছে।' নন্দলাল ঠাকুর পথ্য-প্রদানের কোন প্রত্যুত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নি। এর দীর্ঘদিন পরে ১৭৮০ শকে নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য পাষণ্ডপীড়ন ও পথ্যপ্রদান পুস্তকের মতামত বিচার করে 'বিবাদভঞ্জর্ণব' পুস্তক প্রচার করেন। তখন রামমোহন ও নন্দলাল উভয়েই মৃত।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এই বিচার বিষয়ক আর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এটির

নাম 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার'। রচয়িতা হিসাবে রামচন্দ্র দাসের নাম আছে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের প্রতি শাস্ত্রানুসারে মদ্যপানের যে নির্দেশ আছে এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। রামমোহন তাঁর আলোচনার শেষে লিখেছেন, 'এখন এই প্রতীক্ষায় রহিলাম যে ঐ কায়স্থ মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র লিখিবেন, কিম্বা নিন্দা হইতে বিরত হইবেন।' কায়স্থ মহাশয়ের কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নি, সুতরাং মনে হয় তিনি নিন্দা হতে বিরত হয়েছিলেন।

॥ তিন ॥

রামমোহনের শাস্ত্র আলোচনা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুধুমাত্র ব্রহ্ম উপাসনার মধ্যেই সীমিত ছিল না, সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর রচনায় ও আলোচনায় সর্বত্র এই মতই ব্যক্ত করেছেন যে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও নানা কুসংস্কার সমাজের রূপ নষ্ট করে দিয়েছে, সাধারণ মানুষকে সামাজিক সুখ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করেছে এবং নিজের ও অন্যের প্রতি নিবিচারে অত্যাচার ও অবিচার করায় উৎসাহিত করেছে। ধর্মের নামে সমাজ তার সকল শুভবুদ্ধির কণ্ঠরোধ করেছিল ; সেদিন সে ছিল বিকৃত, অসুস্থ। সেদিনের বর্ণনা দিতে যেয়ে ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন, 'to know the Hindoo idolatry, as it is, a person must wade through the feth of these thirty six poorans, and other popular books—he must read and hear the modern popular poems and songs—he must follow the brahman through his midnight orgies, before the image of kalee and other goddess or he must accompany him the nightly revels, the yatras etc. and listen to the filthy dialogues which are rehearsed respecting krishna and the daughter of the milk-men, or he must watch him at midnight, choaking with mud and water of the Ganges, a wealthy relation while in the dilirium of a fever, or he must watch him at the same hour which he is murdering in secret an unfaithful wife, or a supposed domestic enemy, burning the body before it is cold, and washing the bloods from his hands in the secred stream of Ganges, or he must look at the brahman, hurrying the trembling half-dead widow round the funeral pile, and throwing her like a log or wood, by the dead body of her husband, tying her, and then holding her

with bamboo levers, till the fire has deprived her of the power of getting up and running away.' ১

মানুষের জীবনকে ধর্মের নামে নৃশংসভাবে বলি দেওয়া সেদিনের সমাজে ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। গঙ্গাবক্ষে, সাগরে, জগন্নাথের রথের নীচে সর্বত্রই এই আত্মহননের দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত প্রথার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল সতীদাহ এবং সবচেয়ে বেশী প্রচলনও ছিল সতীদাহ। একটি সুস্থ, সবল, জীবন্ত মানুষকে একটি মৃত মানুষের সঙ্গে এক চিতায় তুলে পুড়িয়ে মারার মত নিদারুণ নৃশংসতার কথা আজ আমরা চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু একদিন ছিল, খুব বেশী নয়, দেড়শ বৎসর আগেও, যখন ভাগিরথীর তীরে এমনি করে অনেক চিতা সাজান হত। সদ্যবিধবাকে আলতা-সিঁদুরে সাজিয়ে তোলা হত চিতায়; তারপর যখন আগুন উঠত জ্বলে, তখন পাছে প্রাণের মায়ায় সেই বিধবা ধর্মকার্যে বিঘ্ন ঘটিয়ে বসে, তাই চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হিতাকাঙ্ক্ষীরা বাঁশের লাঠির নির্দয় প্রহারে দূর করে দিত তার সকল ভবযন্ত্রণা; সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা আর হাজার কণ্ঠের হরিধ্বনির পৈশাচিক উল্লাসে চাপা পড়ে যেত এক অসহায় সদ্যবিধবার বেঁচে থাকার অন্তিম প্রার্থনা। শুধু সেই চিতাগ্নিতে এক নিরুপায় নারীর সঙ্গে প্রতিবার নূতন করে পুড়ত হিন্দুর মনুষ্যত্ব।

এই অমানুষিক প্রথা শুধু বাংলাতেই নয়, একদিন ছড়িয়ে ছিল সারা ভারতবর্ষে। মোঘল সম্রাট আকবর একবার চেষ্টা করেছিলেন এর অবসান ঘটাতে, কিন্তু সফল হননি। জাহাঙ্গীর এই প্রথার সাহায্যকারী ও প্ররোচকদের জরিমানার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবু এর শেষ হল না। আওরংজীবের অন্তরও কাফের হিন্দুদের এই নৃশংসতায় শিউরে উঠেছিল, কিন্তু তবুও চিতার আগুন নিভল না। তারপর পর্তুগীজ, ফরাসী, ডাচ সকলেই তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কিছু কিছু চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক বৃহৎ সীমানার যারা মালিক সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনেকদিন যাবৎ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত রইল। পাছে হিন্দুদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করলে তাদের স্বার্থে আঘাত আসে, তাই এ সম্বন্ধে কোন

১। W. Ward রচিত Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত।

ব্যবস্থা গ্রহণে তারা বিরত হল। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারীভাবে তারা গ্রহণ করল সম্পূর্ণ নিরাসক্তির সংকল্প।

কোম্পানী এ সম্পর্কে চিন্তা না করলেও অন্যদিকে সতীদাহের বিরোধিতা দানা বেঁধে উঠতে লাগল। এঁরা হলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়। কেরী এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যেমন হিন্দুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন, অন্যদিকে এ সম্বন্ধে সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ হল তাঁদের কর্মসূচীর অন্যতম। ধর্মের নামে সমাজের যূপকাষ্ঠে যে-সব স্ত্রীলোকদের এইভাবে বলি দেওয়া হত তাদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ এবং সেই তথ্য প্রকাশ করা হল তাঁদের প্রথম কাজ। তাই প্রথমে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ত্রিশ মাইলব্যাপী জায়গায় মোট সতীদাহের সংখ্যা গণনার জন্য ১৮০৩ সালে তাঁরা লোক নিয়োজিত করলেন। এর ফলে দেখা গেল যে এক বৎসরে মোট সংখ্যা হল চারশরও অধিক। এ সম্বন্ধে আরও সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এরপর তাঁরা বিভিন্ন এলাকা ভাগ করে সেখানে পৃথক পৃথক লোক নিয়োগ করলেন। এর দ্বারা ছয়মাসে প্রায় তিনশ দৃষ্টান্তের খবর পাওয়া গেল। এইভাবে সতীদাহের সংখ্যা গণনার সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়ম কেরী আরও একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। হিন্দুশাস্ত্রে যে সব অংশে সহমরণ প্রসঙ্গ লিখিত আছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি সেই সমস্ত অংশগুলি সংগ্রহ করে কাউন্সিলের সভ্য মিঃ উডনীর হস্তে সমর্পণ করেন। উডনী সতীদাহের সংখ্যা এবং এই সকল শাস্ত্রবচনগুলির সাহায্যে একটি আবেদন প্রস্তুত করে লর্ড ওয়েলেসলী ও সুপ্রীম কোর্টের নিকট পেশ করেন। এই আবেদনে উডনী সতীদাহ প্রথার নৃশংসতার ও ব্যাপকতার উপর জোর দেন। এই প্রসঙ্গে হিন্দুদের ধর্মে কোম্পানীর হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে পূর্ব-প্রসঙ্গের তিনি উল্লেখ করেন। বেনারসে ব্রাহ্মণদের মধ্যে আত্মীয়া এবং রাজকুমারদের মধ্যে কন্যাসন্তান হত্যার যে প্রথা প্রচলন ছিল কোম্পানী ১৭৯৫ সালে আইন করে তা বন্ধ করে দেয়। ১৮০২ সালের আইনে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনও নিষিদ্ধ হয়। তাছাড়া কেরী কর্তৃক সংগৃহীত শাস্ত্রবচনগুলি হতে জানা যায় যে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা ব্রাহ্মণদের দ্বারা

যতখানি আকারপ্রাপ্ত হয়েছে, শাস্ত্রদ্বারা ততখানি নির্দেশিত হয়নি। সুতরাং এই নিষ্ঠুর বর্বর প্রথার উচ্ছেদ সাধন সরকারের পক্ষে আশু কর্তব্য। এই সময় ১৮০৫ সালে বিহারের ম্যাজিস্ট্রেট এলফিনষ্টোন একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে সহমৃতা হতে বাধা দেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি গভর্নর জেনারেলকে পত্রে জানান যে অপ্রাপ্তবয়স্কা এই স্ত্রীলোকটির আত্মীয়রা তাকে নেশা করিয়ে তার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়েছিল।

সতীদাহে সাধারণতঃ এইভাবে নেশা করিয়ে অথবা বলপ্রয়োগ করে স্ত্রীলোকদের বাধ্য করা হত। মরতে কেউই চায় না, এটাই স্বাভাবিক। তাই জ্বলন্ত চিতায় নিজের জীবন্ত দেহটিকে ভস্মীভূত করার সংকল্প সুস্থ মস্তিষ্কে কারও পক্ষে গ্রহণ করা স্বাভাবিক নয়। অবশ্য স্বইচ্ছায় কেউই যে চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেননি, তা নয়। কিন্তু তবুও এর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য, হয়ত হাজারের মধ্যে একজন, হয়ত তাও নয়। অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগই ছিল সাধারণ নিয়ম। 'The use of force by means of bamboos is, we believe, universal through Bengal'—জে. পেগস্ তাঁর Suttee's cry to Britain গ্রন্থে নানা করুণ ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন। ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থেও এই ধরণের বহু উল্লেখ আছে। ফ্যানী পার্কস্ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তেও অনেক ভয়াবহ ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

কোম্পানী মিশনারীদের কাছ থেকে সতীদাহের সংখ্যা এবং এলফিনষ্টোনের কাছ থেকে এই বাধ্য করার বিবরণ পেয়ে একটু বিচলিত হল। ফলে এ সম্বন্ধে প্রথম সরকারী চিন্তা শুরু হল। ১৮০৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলীর আদেশ অনুসারে বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ ডাওডেস্‌ওয়েল নিজামত আদালতের গুড্ সাহেবের কাছে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্রে তিনি এই প্রথা সম্বন্ধে শাস্ত্র-নির্দেশ জানতে চান। নিজামত আদালতে কতকগুলি বেতনভোগী হিন্দুপণ্ডিত এবং মুসলমান মৌলভী থাকতেন। হিন্দু অথবা মুসলমান আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা সরকারকে সাহায্য করতেন। এবিষয়ে অনুসন্ধান করে নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা লিখলেন যে, শিশুসন্তানবতী, গর্ভবতী, ঋতুমতী ও অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকগণ সহমৃতা হওয়ার যোগ্য নয়।

শিশুসন্তানের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে পারলে সহমৃতা হওয়ার বাধা নেই। কোন উৎকট ওষুধ বা মাদকদ্রব্য সেবন কবিয়ে কোন স্ত্রীলোককে সহমরণে রাজী করান অশাস্ত্রীয়। আর যারা সহমৃতা হয় তারা মানুষের দেহের সাড়ে তিন কোটি লোমের সমপরিমাণ বৎসর স্বামীর সঙ্গে স্বর্গবাস করে।

ঘনশ্যাম শর্মা যা লিখলেন তাতে মোটামুটিভাবে সতীদাহের সমর্থনই ছিল, তাই গভর্নমেণ্ট আবার নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ল। ১৮০৫ থেকে ১৮১২ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হল না। ১৮১২ সালের ৫ই ডিসেম্বর নিজামত আদালতের রেজিষ্টার টার্নবুল গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারীকে লিখে জানালেন যে এই প্রথার প্রতি সাধারণের অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এত বেশী যে এ প্রদেশের সকল বর্ণের হিন্দুগণই এই প্রথা প্রচলিত রাখার জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল। সুতরাং এবিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। ১৮১৭ সালে ৫ই অক্টোবর ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশদের নির্দেশ দেওয়া হল, 'to allow the suttee in those cases where it is countenanced by their religion, and to prevent it in others in which it is prohibited by the same authority.'

ফল হল সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ সহমরণের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার পরিবর্তে বাড়তে লাগল। কারণ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সহমরণকে নিষিদ্ধ করার অর্থ হল বাকী সমস্ত ক্ষেত্রে সেই প্রথাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নেওয়া। সুতরাং গভর্নমেণ্ট যখন পরোক্ষভাবে সহমরণ প্রথাকে স্বীকার করে নিল, তখন সহমরণের সমর্থকগণ আরও উৎসাহ পেল। সরকারী কর্মচারীদের সামনেই তারা এই বর্বর আচরণ অকুতোভয়ে পালন করতে লাগল। অথচ গভর্নমেণ্টের পক্ষে এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কোর্ট অব ডিরেক্টরস গভর্নর জেনারেলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'It is undoubtedly the policy of our Government to abstain from interference with the religious opinions and prejudices of the Natives.' তাই গভর্নর জেনারেলও তাঁর আদেশে সরকারী কর্মচারীদের এই কথা মনে করিয়ে দিলেন, 'It is not the intention of the Government to check or forbid

any act authorised by the tenants of the Religion of the inhabitants of their dominion.'

গভর্নমেণ্ট যে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ চায়নি, একথা এখানে স্পষ্ট। তাই সেদিন এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য একমাত্র পথ ছিল জনমত গঠন; এবং সেই জনমতের চাপে সরকারকে এ সম্বন্ধে একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করা। কিন্তু সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা সেদিন সহজ ছিল না। সমস্ত হিন্দু, তা সে যে কোন বর্ণের হোক না কেন, যখন সহমরণের সপক্ষে তখন সেই সমুদ্র প্রমাণ বিরোধিতার সামনে দাঁড়াতে চাই শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা; চাই জ্ঞান, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য। এগিয়ে এলেন রামমোহন। এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন, অমানুষিক পরিশ্রম করলেন, তবেই এত বড় একটি বিভীষিকার অবসান ঘটল। আজ তাই আমরা রামমোহন ও সতীদাহপ্রথা-উচ্ছেদ এই দুটি কথা একই সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকি; চেষ্টা করে নয়, একটি উচ্চারণ করতে গেলে অপরটি আপনা হতেই উচ্চারিত হয়ে পড়ে।

সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহন যদিও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ১৮১৮ সালে তবুও ইতিপূর্বে তিনি এ সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন, এবং সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ প্রসঙ্গে এবং আত্মীয় সভার অধিবেশনে সর্বত্রই এই নিষ্ঠুর প্রথা তাঁর আলোচনাভুক্ত হয়েছিল এবং তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ১৮১৮ সালের প্রথম দিকে আত্মীয়সভার সেক্রেটারী বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সতীদাহের বিরোধিতা করে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এটি বাংলা এবং ইংরাজী উভয় ভাষায় রচিত। পুস্তিকাটি কোলকাতায় ও তার আশেপাশে সর্বত্র বিতরণ করা হয়েছিল; এবং বিভিন্ন কোর্টের জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পণ্ডিতদের কাছে পাঠান হয়েছিল। যদিও পুস্তিকাটির রচয়িতা হিসাবে বৈকুণ্ঠনাথের নাম ছিল, তবুও সঙ্গত কারণে অনুমান করা যায় যে এটি রামমোহনের রচনা। যদি একান্তই তা না হয় তবুও এর পরিকল্পনায়, প্রেরণায়, রূপায়ণে এবং প্রচারে যে রামমোহনের অনেকখানি সহযোগিতা ছিল তা নিসন্দেহে সত্য।

এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হলে সতীদাহ সমর্থকদের মধ্যে একটি আলোড়ন জাগে এবং তাঁরা এর উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তার পরেই সব চুপচাপ। তাই মনে হয় রামমোহনের নির্দেশেই হরিহরানন্দ ১৮১৮ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে ইণ্ডিয়া গেজেটে একটি পত্র লেখেন। ঐ পত্রে এই পুস্তকের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখলেন, 'It is reported too, that consequent to the appearance of that publication, some Brahmins of learning were requested by their wealthy followers to reply to that treatise, and I was therefore in sanguine expectation that the subject would undergo a thorough investigation.'

তবুও উত্তর এল না। এদিকে সতীদাহের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে; নিপীড়িত মনুষ্যত্বের কান্নায় বাংলার আকাশ-বাতাস ব্যথিত। তাই রামমোহনের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব হল না। প্রবর্তক ও নিবর্তকের কাল্পনিক কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি আলোচনার সূত্রপাত করলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম পুস্তক 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রকাশিত হল ১৮১৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। কয়েক সপ্তাহ পরে এর একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সতীদাহ সম্পর্কে অধিকাংশ ইংরাজদের মনে একটি ধারণা ছিল যে এই প্রথা হিন্দুশাস্ত্র অনুমোদিত; সেইজন্যই গভর্নমেণ্টের পক্ষ হতে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। রামমোহন এই ভুল ধারণা সম্বন্ধে ভূমিকায় লিখলেন, 'An idea that the arguments it contains might tend to alter the notions that some European gentlemen entertain on this subject, has induced the writer to lay it before the British public also in its present form.'

সহমরণের প্রবর্তক ও নিবর্তকের কাল্পনিক কথোপথনের মধ্য দিয়ে রামমোহন তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলেছেন। প্রবর্তক তার মত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রথমে শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখ করেছে; পরে সেখানে পরাস্ত হয়ে পাপ ও নিন্দার কথা বলেছে। সেখানেও সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে রুষ্ট হয়ে

আসল সত্যটি প্রকাশ করেছে। সে নগ্নভাবেই ঘোষণা করেছে, 'এরূপ সহমরণে ও অনুমরণে পাপই হউক কিম্বা যাহা হউক আমরা এ ব্যবহারকে নিবর্ত্ত করিতে দিব না ·'। কারণ হিসাবে সে উল্লেখ করেছে, 'ইহার নিবৃত্তি হইলে হঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলে নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন…'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রামমোহন এই কাল্পনিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এই নিষ্ঠুর প্রথার সপক্ষে ব্রাহ্মণরা যতই শাস্ত্রবাক্যের দোহাই দিক না কেন, আসলে এক অমূলক 'লৌকিক আশঙ্কা'ই দেশব্যাপী এতবড় নৃশংসতার মূল কারণ।

রামমোহনের পুস্তক প্রকাশিত হলে ১৮১৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ক্যালকাটা গেজেট লিখল, 'The Sanskrit authority which are said to enjoy the sacrifice of widows on the funeral pile of their deceased husbands, have lately undergone a free examination by a learned and philosophical Hindoo. The question itself is of the highest importance, and the true interpitation of the religious law which has stained the domestic history of India for so many ages with blood, will no doubt diminish, if not extinguish the desire for self-immolation. The safest way of comming to a right understanding on a point so interesting to humanity, is a rigid isvestigation of the rules of conduct laid down in the books which are considered sacred by the Hindoos. They appears to have been done with great assiduity, anxiety and care, and the consequence has been a decision hostile to the ancient custom'. পরের দিন ক্যালকাটা জার্নাল লিখল,…'if any thing is likely to influence the opinion or the practice of the Hindoos in this perticular, nothing is more calculated to effect it

than argument drawn from their own sacred books to prove that it is not necessary to future happiness.' এর পরের দিন অর্থাৎ ২৬শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুরের সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' লিখল, 'কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।'

রামমোহনের পুস্তক প্রকাশিত হলে হিন্দুসমাজে যে আলোড়ন জেগেছিল তার একটি দৃষ্টান্ত হল ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ রচিত 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' নামে একটি পুস্তকের প্রকাশ। ঐ বৎসরের জুলাই সংখ্যায় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এই পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করে লিখেছে, 'a small work in defence of this practice just published in quarto without name or date ; but a manuscript note on the first blank leef informs us that it is published by Cassee-nath-turkubagish ; by the desire of Cala-chund-bhose. It is in the form of a dialogue written in Bengalee with an English Translation.' 'কলিকাতার ঘোষাল বাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠী ছিল। কালাচাঁদ বসুর পিতা গুরুপ্রসাদ বসু প্রধানতঃ এই চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিতেন।'

কাশীনাথের উত্তরের প্রত্যুত্তর হিসাবে রামমোহন ১৮১৯ সালের নভেম্বর মাসে 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে নিবর্ত্তকের জবানীতে তিনি লিখলেন, 'প্রায় এক বর্ষ ব্যতীত হইলে যে উত্তর তুমি প্রস্থাপন করিয়াছ, তাহা অবগত হইয়াছি, তাহাতে যে সকল আমারদের বাক্যকে পুনরুক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরের সুতরাং প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা অন্যথা করিয়া অশাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর শুনিতে প্রণিধান করুন।' প্রবর্ত্তকের পক্ষ অবলম্বন করে কাশীনাথ আপন সুবিধা অনুসারে শাস্ত্রবাক্যের যে-সব অর্থ করেছেন রামমোহন একে একে তার প্রত্যেকটি খণ্ডন করেন। রামমোহনের বিশ্লেষণ শুধুমাত্র তাঁর ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান নয়, তর্কশাস্ত্রের উপর তাঁর

অতুলনীয় অধিকারের পরিচয় বহন করে। তাঁর আলোচনার একটি অংশ হল: 'হারীত ও অঙ্গিরার বচনে প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রবিবেশ হুতাশনং। অর্থাৎ অগ্নিতে বিধবা প্রবেশ করিবেক। সমারোহেদ্ধুতাশনং। অর্থাৎ বিধবা অগ্নিতে আরোহণ করিবেক। ইহার তাৎপর্য্য আপনি ব্যাখ্যা করিবেন, যে চিতা হইতে অনেক দূরে অগ্নি থাকিবেক, আর সেই অগ্নিসংযুক্ত রজ্জু কিম্বা তৃণাদি চিতা-সংলগ্ন হইবেক, এরূপ চিতা যাহাতে অগ্নির লেশামাত্র নাই তাহাতে আরোহণ করিলে অগ্নি প্রবেশ করা ও অগ্নিতে আরোহণ করা সিদ্ধ হয়, কিন্তু কি ভাষাতে কি সংস্কৃতে প্রবেশ শব্দের শক্তি বস্তুন্তরের অন্তর্গমনে রূঢ় হয়, যেমন এই গৃহেতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, এ প্রয়োগ গৃহমধ্য গমন ব্যতিরেক কদাপি হইতে পারে না; যদি সেই গৃহলগ্ন হইয়া একটি দীর্ঘ কাষ্ঠ থাকে, আর সেই কাষ্ঠ এক রজ্জুর সহিত সংযুক্ত হয়, আর কোন ব্যক্তি ঐ কাষ্ঠকে অথবা রজ্জুকে স্পর্শ করে, তৎকালে সে ব্যক্তি গৃহ প্রবেশ করিলেক, এ প্রয়োগ কি ভাষাতে, কি সংস্কৃতে কেহ করিবেক না।' তিনি অন্যত্র লিখেছেন, 'আপনকার বক্তব্য এই হইয়াছে যে চিতায় অগ্নি দিলে অগ্নির উত্তাপের ভয়ে কিম্বা অগ্নিস্পর্শ শরীরে হইলে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত কি জানি যদি বিধবা চিতা হইতে পালায়; সে আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দাহকেরা চিতার উপর স্ত্রীর শরীরকে বন্ধন করেন না, কিন্তু স্ত্রীর মৃত শরীরের খণ্ড ২ দাহকালে চিতা হইতে কি জানি যদি ইতস্তত পড়ে, এ নিমিত্ত দাহকেরা জীবদ্দশাতেই চিতাতে বন্ধন করেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, যে লৌহরচিত বজ্জু দিয়া এরূপ বিধবাকে বন্ধন করিয়া থাকেন, কি সামান্য প্রসিদ্ধ রজ্জু দিয়া বন্ধন করেন? কারণ লৌহযন্ত্রে শরীরকে প্রবিষ্ট করিয়া দাহ করিলে তাহার খণ্ড ২ ইতস্তত পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। অন্যথা সামান্য রজ্জু দিয়া যদি বন্ধন করেন, তবে সে রজ্জু শরীর দাহের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ সময়ে দগ্ধ হয়, অতএব সে দগ্ধ রজ্জু দ্বারা শরীরের ইতস্তত পতন কোনরূপে বারণ হইতে পারে না। অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পণ্ডিত লোকেরও এ পর্য্যন্ত অনবধানতা হয়, যে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে রজ্জু থাকিয়া দগ্ধ হয় না, এবং অন্যকে অগ্নি হইতে ইতস্তত পতনে নিবারণ করে, এরূপ বাক্য লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত লিখেন, অতএব বিজ্ঞ লোকে বিবেচনা করিবেন, যে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিবার হেতু যাহা আপনি লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে কিনা?'

কাশীনাথ বিধায়কের জবানীতে যে অংশে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে তারা স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, রামমোহন সেই অংশের প্রতিবাদে আশ্চর্য যুক্তি-প্রমাণ ও বাস্তব বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের দুর্ভাগ্যের কথা যে গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধের সঙ্গে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা তুলনারহিত। কাশীনাথ স্ত্রীলোক সম্পর্কে যে সমস্ত অপবাদ দিয়েছেন রামমোহন এক এক করে প্রত্যেকটির উত্তর দেন। অবশেষে তাদের ধর্মভয়শূন্যতার প্রতিবাদ করার সময় তিনি এক প্রচণ্ড আবেগ অনুভব করেছেন এবং এতখানি আবেগের বহিঃপ্রকাশ রামমোহনের সমস্ত রচনার মধ্যে মনে হয় আর কোথাও নেই। সুগভীর দরদের সঙ্গে তিনি সমাজে নিরন্তর নিপীড়িত নারীজাতির দুঃখ-দুর্দশার যে করুণ চিত্র এঁকেছেন তা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি বাস্তব। তিনি লিখেছেন, 'তাহারদের ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্যবর্ণের মধ্যে যাহারা আপন ২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি ২ দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন ২ নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাইসকল ও অমাত্য-সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহারদের অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে

তাহারদের স্বামী-শাশুড়ী দেবর প্রভৃতি কি ২ তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর-পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে ২ কোন কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী যে পর্য্যন্ত দরিদ্র থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এসকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই ২ পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পরিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।'

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকাটি যে অতীব করুণ, সে যে অতিমাত্রায় অবহেলিত ও উপেক্ষিত, সমাজের কাছ হতে অত্যাচার আর অবিচার যে তার

নিত্য পাওনা, এই নির্মম সত্যটি রামমোহনের রচনার প্রতিটি ছত্রে আশ্চর্য-ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার সে যুগের নারীসমাজের দুঃখ-দুর্দশার এমন বাস্তবানুগ চিত্র আর কারও রচনায় ফুটে ওঠেনি।

রামমোহন তাঁর এই রচনায় সমাজের সর্বত্র অবহেলিত স্ত্রীলোকদের প্রতি একটি সর্বজনীন সহানুভূতি জাগাতে চেষ্টা করেছেন। সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা সে প্রশ্ন ছাড়াও তিনি 'নানা দুঃখে দুঃখিনী' নারীজাতির জন্য সাধারণের 'কিঞ্চিৎ দয়া' প্রত্যাশা করেছেন। তাই ১৮২০ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী যখন এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হল তখন সেটি উৎসর্গ করলেন, 'To the most noble The Marchioness of Hastings, Countess of Loudoun, &c &c' এবং উৎসর্গ পত্রে লিখলেন, 'The following tract....as an appeal to reason in behalf of humanity, I take the liberty to dedicate to your Ladyship ; for to whose protection can any attempt to promote a benevolent purpose be with so much propriety committed ?' সমস্ত নির্যাতীত স্ত্রীলোকদের পক্ষ হয়ে রামমোহন আবেদন জানালেন আর একটি স্ত্রীলোকের সহানুভূতির দ্বারে। রামমোহন হয়ত ভেবেছিলেন যে মেয়েদের ব্যথা মেয়েদের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হবে এবং হেষ্টিংস-পত্নীর সহানুভূতির উদ্রেক হলে স্বয়ং গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংস সরকারী-ভাবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কিন্তু এত সহজে তা সম্ভব হল না। রামমোহনকে আরও দীর্ঘ নয় বৎসর অপেক্ষা করতে হল ; এবং ততদিনে এই নিষ্ঠুর চিতাগ্নিতে নির্মমভাবে পুড়ে ছাই হল আরও কয়েকশত অসহায় নারীজীবন।

নারীজাতির দুঃখে রামমোহনের সমবেদনা ছিল সুগভীর। তাই 'নানা দুঃখে দুঃখিনী' এদেশের স্ত্রীলোকদের দুঃখকষ্টের মূল অনুসন্ধানে তিনি ব্রতী হন। সেদিন সতীদাহের মত নিষ্ঠুর প্রথার হাতে কোন কোন স্ত্রীলোক স্বইচ্ছাতেই আত্মসমর্পণ করত। রামমোহন সমগ্র পরিস্থিতি বিচার করে দেখলেন যে শুধুমাত্র পরলোকে অক্ষয় স্বর্গসুখ কামনাই এর মূল কারণ নয়, সমাজের অবহেলা এবং উপেক্ষা এর জন্য অনেকখানি দায়ী। রামমোহনের মতে, হিন্দু-দায়াধিকার ও বহু-বিবাহ এদেশে সহমরণের সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ। রামমোহন

তাই ১৮২২ সালে ইংরাজীতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। পুস্তিকাটির নাম, 'Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance.' এই পুস্তিকায় রামমোহন শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি-বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করলেন যে স্ত্রীলোকদের দায়াধিকার সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে যে প্রথা সেদিন প্রচলিত ছিল তা প্রাচীন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শাস্ত্রানুসারে মৃত পতির সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায় পত্নীরও সমান অধিকার; কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুরমণীদের সেই অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। এরই ফলে একদিন যে ছিল গৃহের কর্ত্রী, বিধবা অবস্থায় সেই হল সংসারে সবচেয়ে অনাথা। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় পুত্র অথবা পুত্রবধূর করুণার উপর নির্ভর করা ছাড়া তার আর উপায় রইল না। পুত্র যদি অসৎ হয় অথবা সপত্নীগর্ভজাত হয় তাহলে ত দুর্দশার অন্ত নেই। বিধবা অবস্থায় বেঁচে থেকে সংসারে নিরন্তর নির্যাতন ভোগ করে তিল তিল করে মরার চেয়ে তাই তারা নিরুপায় হয়ে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে রাজী হত। এ সম্বন্ধে রামমোহন লিখেছেন, 'It is not from religious prejudices and early impressions only, that Hindoo widows burn themselves on the piles of their deceased husbands, but also from their witnessing the distress in which widows of the same rank in life are involved, and the insults and slights to which they are daily subjected, that they become in a great measure regardless of their existence after the death of their husbands : and this indifference accompanied with the hope of future reward held out to them, leads them to the horrible act of suicide.'

স্বামীর সম্পত্তি হতে বিধবাকে বঞ্চিত করার ফলেই সমাজে বহুবিবাহের পথ সুগম হয়ে উঠল। বিবাহিত পত্নীকে যখন সম্পত্তির ভাগ দিতে হল না, এমন কি তার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল না, তখন সন্তান উৎপাদনের জন্য অথবা শুধুমাত্র প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য অনেকেই বহু বিবাহে ব্রতী হল। ফলে সমাজ ভরে উঠল শত শত বিধবার বেদনাবিধুর মুখচ্ছবিতে। শাস্ত্রে অবশ্য পুরুষের পক্ষে

এক স্ত্রী জীবিত থাকায় দ্বিতীয়বার বিবাহের নির্দেশ আছে ; কিন্তু তা মাত্র কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে সমাজ সেই সীমারেখা মুছে দিল। সমাজের এই স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযত করার জন্য রামমোহন একটি প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, গভর্নমেণ্ট যদি এমন একটি ব্যবস্থা করে যে, কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে ইচ্ছা করলে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কোন অফিসারের কাছ হতে অনুমতি গ্রহণের জন্য প্রমাণ করতে হবে যে তার স্ত্রীর শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোন দোষ আছে, তাহলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হবে। কেননা বহু বিবাহের ক্ষেত্র সীমায়িত হলে সমাজে বিধবার সংখ্যা হ্রাস পাবে, ফলে সতীদাহের সংখ্যাও কমে যাবে। এই প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছেন যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে সতীদাহের 'সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, এবং তার একটি বিশেষ কারণ হল বহু-বিবাহ-প্রথা। তিনি লিখেছেন, 'we may safely attribute this disproportion chiefly to the greater frequency of a plurality of wives among the natives of Bengal, and to their total neglect in providing for the maintenance of their females.'

নারীজাতির প্রতি সমাজের অবিচার প্রসঙ্গে রামমোহন আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, তা হল কন্যাপণ বা কন্যাবিক্রয়। নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থদের মধ্যে ছিল এই প্রথার প্রচলন। যে ব্যক্তি বেশী অর্থ দিতে সক্ষম হবে তার হাতেই এরা কন্যা সমর্পণ করত। অর্থই ছিল পাত্রের একমাত্র যোগ্যতা ; তাই বৃদ্ধ, রুগ্ন সকলেই অর্থের বিনিময়ে সুপাত্র হিসাবে বিবেচিত হত। কিন্তু এর ফলে বিবাহিতা কন্যার বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হতে বিলম্ব ঘটত না। তাই আবার সেই অপমানে, লাঞ্ছনায় দিনযাপনের ভীতি ; আবার সেই সহমরণের সংখ্যাবৃদ্ধি। রামমোহন শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে এ প্রথা শাস্ত্র-সম্মত নয়। সবশেষে তিনি সমাজে নারীজাতিকে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, তাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান করার জন্য, তাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং সেই সঙ্গে সতীদাহের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য—সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'Both common sense, and the law of the land designate such a practice as an

actual sale of females ; and the humane and liberal among Hindoos, lament its existence, as well as the annihilation of female rights in respect of inharitance introduced by modern expounders, They, however, trust, that the humane attention of Government will be directed to those evils which are chief sources of vice and misery and even of suicide among women'.

॥ চার ॥

রামমোহন হিন্দুসমাজের প্রচলিত জীবনধারার স্পর্ধিত ব্যতিক্রম ; তাই সমাজ তাঁকে সেদিন সহ্য করতে পারে নি। ব্যক্তি-মানুষের কাছে সমাজের দাবী প্রশ্নহীন আনুগত্য। যেখানে এর অন্যথা, যেখানে বিদ্রোহ, সমাজ সেখানে খড়্গহস্ত। তাই রামমোহন যখন কোলকাতায় এসে বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতাকে আঘাত করতে শুরু করলেন, যখন সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেন, তখন হিন্দুসমাজ তাঁকে সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে গ্রহণ করল। তাই সে-সমাজ একদিকে যেমন তাঁর সংস্রব এড়িয়ে চলতে লাগল, অন্যদিকে শুরু করল তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার। সুতরাং সমাজের সঙ্গেও রামমোহনের কোন যোগ রইল না। এইসময় আত্মীয় সভার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক সমর্থকের সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন, এবং এঁরাই ছিলেন সেদিন তাঁর সঙ্গী, বন্ধু ও প্রেরণা। এছাড়াও যাঁরা সেদিন রামমোহনের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা হলেন শাসক সম্প্রদায়ের লোক। তাঁদের সাহচর্যও ছিল রামমোহনের জীবনে এক পরম সম্পদ। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'I, however, in the beginning of my pursuits, met with the greatest opposition from their self-interested leaders, the Brahmins, and was deserted by my nearest relations ; and I consequently felt extremely melancholy. In that critical situation, the only comfort that I had was the consoling and rational conversation of my European friends, specially those of Scotland and England.'

কোলকাতায় আসার আগে ভাগলপুরে ইট-পাঁজার ধারে হ্যামিল্টনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরও রামমোহন ইংরাজ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হতে পারেন নি ; কারণ হ্যামিল্টনের পাশাপাশি তিনি দেখেছিলেন জন ডিগবীকে। ডিগবীর সাহচর্য ছিল তাঁর কাছে অমূল্য। তিনি ডিগবীর কাছ থেকে পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে বহির্জগতের যে আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন, তাতে স্পষ্ট জেনেছিলেন যে উনিশ শতকের প্রথমে বাংলার সেই আকাশজোড়া ঘনান্ধকারের পক্ষে সে আলোর

প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই ইংরাজের সংসর্গ প্রয়োজন; প্রয়োজন তাঁদের বন্ধুত্ব; কেননা তাঁদের কাছ হতে নেওয়ার আছে অনেক। তাছাড়া মনে হয় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সমগ্র জাতি যেভাবে হতচেতন হয়ে রয়েছে সে অবস্থায় এর উন্নতির জন্য গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে। গভর্নমেণ্টকে রাজী করাতে হলে শাসক সম্প্রদায়ের লোকদের সমর্থন পাওয়া দরকার। তাই ইংরাজের বন্ধুত্ব আবশ্যক। এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেই রামমোহন ইংরাজের সঙ্গে করমর্দনের জন্য তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

রামমোহন কোলকাতায় বাড়ী কিনে তাকে সাজিয়েছিলেন ইংরাজী কায়দায়। ঐ বাড়ীতে তিনি ইংরাজদের নিমন্ত্রণ করে ভোজ দিতেন। রামমোহন তাঁর প্রায় সমস্ত রচনা ইংরাজীতে অনুবাদ করতেন এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে বিতরণষ করতেন। রামমোহনের রচনা পাঠ করে তাঁরা মুগ্ধ হতেন। রামমোহনের পাণ্ডিত্য, তাঁর যুক্তি-বিচার, তাঁর ঔদার্য তাঁদের অভিভূত করত। অবশেষে Col. Fitzclarence-এর মত তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হতেন, 'he is in many respect a most extraordinary person,'

রামমোহন যখন কোলকাতায় এসে সংস্কার কার্য শুরু করলেন তখন এই ধরনের একটি প্রচেষ্টা বিদেশীদের মধ্য হতে চলছিল। এঁরা হলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় এবং এঁদের কেন্দ্রে ছিলেন উইলিয়ম কেরী ও যশুয়া মার্শম্যান। এই মিশনারীরাও হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ও তাদের অন্যান্য কুসংস্কারের প্রতিবাদ করছিলেন। যদিও উদ্দেশ্যের দিক হতে রামমোহনের সঙ্গে এঁদের প্রচেষ্টার এক বিরাট ব্যবধান ছিল তবুও কর্মের বহিরঙ্গ বিচারে এঁরা ছিলেন সমপথিক। তাই উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাছাড়া আর একটি দিকেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ছিল। রামমোহনকে যেমন প্রতিপদে হিন্দুসমাজের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, মিশনারীদের কার্যও তেমনি গভর্নমেণ্ট দ্বারা অনেকখানি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিশনারীদের ভাল চক্ষে দেখে নি। '...as a soverign power, the East India Company not only did not attempt to preach their religion themselves, but threw every possible obstacle in the way of missionaries to settle in their

territories.'[১] কারণ কোম্পানীর আসল উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার আর অর্থ উপার্জন। ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করার অবকাশ ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। বরং ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার হতে দূরে সরে থাকতে পারলেই তাদের লাভ। তাদের ধারণা ছিল এদেশে যদি খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হয় এবং তার মাধ্যমে এদেশে জনসাধারণ আলোর সন্ধান পায়, তাহলে নিরঙ্কুশ শোষণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এদেশ-বাসীদের ধর্মে আঘাত দিলে হয়ত বিরাট বিদ্রোহ সূচিত হতে পারে, এমনকি কোম্পানীর অধিকারচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। তাই কোম্পানী মিশনারীদের আমল দেয়নি। ১৭৯৩ সালে কেরী যখন প্রথম কোলকাতায় এলেন তখন প্রায় চোরের মত সঙ্গোপনে তাঁকে কাজ শুরু করতে হয়েছে। মিশন প্রতিষ্ঠা করার কোন অনুমতি তিনি পান নি। তাই কেরী আর মার্শম্যান কোম্পানীর অধিকার ছেড়ে ডাচ অধিকৃত শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৮ সালের যুদ্ধের পর শ্রীরামপুর যখন ইংরাজ অধিকারে এল তখনও মিশন হতে প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকাদি প্রচারের জন্য ফোর্ট উইলিয়মের অনুমোদন প্রয়োজন হত। অবশেষে ১৮১৩ সালে মিশনারীদের উপর হতে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

রামমোহনের সঙ্গে মিশনারীদের এই সাদৃশ্য উভয়কে অনেকখানি কাছে এনেছিল। তাই রামমোহন কোলকাতায় এসে কাজ শুরু করার পরই ১৮১৫ সালে ২৫শে অক্টোবর শ্রীরামপুরের একজন মিশনারী উইলিয়ম ইয়েটস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই সাক্ষাতের বিবরণ তাঁর জার্নালে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে রামমোহন অঙ্কশাস্ত্র ও গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষা অল্প অল্প জানতেন। ইংরাজী বলতে পারতেন অবাধে। ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় দুঘণ্টা তাঁর সঙ্গে রামমোহনের আলোচনা হয়। ইয়েটসের আগমনে রামমোহন অত্যন্ত প্রীত হন। তিনি ইয়েটসের কাছ হতে তাঁর ঠিকানা জেনে পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এই ভাবে উভয়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। রামমোহন শ্রীরামপুরে যেতেন এবং কোলকাতায় এলেই ইয়েটসও তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

১। History of Hindu Civilization in British rule—P. N. Bose

রামমোহন শ্রীরামপুরে যেয়ে ব্যাপটিষ্ট মিশনের সঙ্গে পরিচিত হন। শুধু মাত্র ইয়েটস নন, কেরী, মার্শম্যান, প্রত্যেকেই তাঁকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। কেরী তাঁর আলাপ-আলোচনায় মুগ্ধ হন। রামমোহন কেরীর পারিবারিক প্রার্থনায় যোগদান করেন। কেরী প্রীত হয়ে রামমোহনকে ডঃ ওয়াট রচিত একটি বাইবেল উপহার দেন। রামমোহন মিশনের কার্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেন ; বিশেষতঃ, শিক্ষাবিস্তারে মিশনের প্রচেষ্টাকে তিনি অভিনন্দন জানান। এবং তাঁর এই আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ কেরীকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জমি উপহার দেন। এই ভাবে আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে রামমোহন অল্পদিনেই মিশনারীদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। রামমোহন যেমন তাঁদের কার্যাবলীর প্রশংসা করলেন, তাঁরাও তেমনি রামমোহনের সংস্কার-প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেন। ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির ১৮১৬ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে এর উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে লিখিত হল যে রামমোহন রায় কোলকাতার একজন ধনী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। ফারসী ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য হেতু তাঁকে মৌলভী রামমোহন রায় বলা হয়। তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজী লেখেন এবং ঐ ভাষায় গণিত ও মনোবিজ্ঞানের পুস্তক পাঠ করেন। তিনি দু'একটি শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত হতে বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং আশা করেন যে ঐ গ্রন্থগুলি পৌত্তলিকতা বর্জনে তাঁর স্বদেশবাসীদের সাহায্য করবে। ইউরোপীয়গণ তাঁর বাড়ীতে পৃথক টেবিলে ইংরাজী কায়দায় খাওয়া-দাওয়া করেন। তিনি সৎ ব্যক্তি, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে অত্যন্ত দুষ্ট ব্যক্তি বলে অভিহিত করে।

মিশনারীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রামমোহনের যথেষ্ট উপকার হয়। এঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাঁর কর্মপন্থা যাচাই করার সুযোগ পান। তাছাড়া হিন্দুসমাজের প্রবল বিরুদ্ধতার সেই দুর্দিনে এঁদের উৎসাহ ও সমর্থন ছিল তাঁর কাছে অনেকখানি। রামমোহনের সবচেয়ে সাহায্যকারী হয়েছিল মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা। ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস সেদিন রামমোহনের বিতর্কমূলক পুস্তকগুলি বিনা দ্বিধায় মুদ্রিত করে। এ ছাড়া মিশনারীদের সাহচর্য রামমোহনের জীবনে আর এক বিরাট উপকার করেছিল। শ্রীরামপুরের এই মিশন সেদিন রামমোহনের পরিচয়কে, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে কোলকাতার ক্ষুদ্র সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র

পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁদেরই চেষ্টায় সাগরপারের দেশেও রামমোহন সম্বন্ধে প্রচণ্ড কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল এবং রামমোহন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে সেখানে আদৃত হয়েছিলেন।[১] উনিশ শতকের প্রথমদিকে আর কোন বাঙালী অথবা কোন ভারতবাসী এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হতে পারেননি।

১৮১৭ সালে রামমোহনের বেদান্তসার ও কেন-উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের একটি সংস্করণ লণ্ডন হতে প্রকাশিত হয়। ঐ সংস্করণের ভূমিকায় জন ডিগবী রামমোহনের একটি পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, রামমোহনের ইংরাজীভাষাশিক্ষার প্রচেষ্টা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রভৃতি বিষয় তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটাই বিদেশে রামমোহনের প্রথম পরিচিতি নয়। এর পূর্বে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় রামমোহন ও তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইংলণ্ডে পৌঁছেছিল। ১৮১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চার্চ অব ইংলণ্ডের মিশনারী রেজিষ্টারে রামমোহন সম্বন্ধে নানা বিস্তৃত এবং কৌতূহলোদ্দীপক উল্লেখ দেখা যায়। ঐ পত্রিকা লিখেছে, 'of Rammohan we have received reports from several friends.' এই সমস্ত সংবাদে রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবুদ্ধির প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের ছোট ছোট পরিচয়। সবক্ষেত্রেই যে নিছক সত্যের গণ্ডীর মধ্যে এই বিবরণ সীমাবদ্ধ রয়েছে তা নয়, সংগ্রাহকের কৌতূহল ও কল্পনার স্পর্শও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। একটি বিবরণে বলা হয়েছে যে তিনি একজন ব্রাহ্মণ, বয়স প্রায় বত্রিশবৎসর; তাঁর ভূসম্পত্তি সুবিস্তৃত, তাঁর সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি প্রচুর; তিনি চতুর, সতর্ক, কর্মক্ষম ও উচ্চাভিলাষী। তাঁর ব্যবহার চমৎকার; তিনি বহু ভাষাবিদ্। তিনি তাঁর স্বদেশীয় কিছু ব্যক্তিকে ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। খৃষ্টধর্মশাস্ত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে এবং এ সম্বন্ধে সমস্ত রকম আলোচনা শুনতে তিনি ইচ্ছুক বলে মনে হয়। অপর এক বিবরণে রামমোহনকে খৃষ্টান বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ন্যায় তিনিও প্রথমে ফারসী ভাষার মাধ্যমে

১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য **Mary Carpenter** রচিত **The last days in England of the Rajah Rammohan Roy** গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পাঠাভ্যাস শুরু করেন। পরে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন ও কোরাণ পাঠ করেন। মহম্মদের ধর্ম তাঁকে প্রথমে প্রভাবিত করে। পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে তিনি তাঁর এক ক্রীতদাসের সুন্দরী স্ত্রীকে হরণ করেছিলেন এবং অস্ত্রের সাহায্যে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন তখন তিনি তা থেকে সরে আসেন। এরপর তিনি ইংরাজীভাষায় বাইবেল পাঠ করেন এবং খৃষ্টান হন। আর একটি বিবরণে বলা হয়েছে যে রামমোহনের অনুগামীর সংখ্যা প্রায় পাঁচশ এবং শীঘ্রই এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। ব্রাহ্মণগণ দুবার তাঁর প্রাণসংহার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন।

শুধুমাত্র ইংলণ্ডের মধ্যেই রামমোহনের খ্যাতি সীমাবদ্ধ রইল না। তাঁর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল ফরাসীদেশেও। 'The Calcutta Times' পত্রিকার সম্পাদক M. D. Acosta-র কাছ হতে তথ্য সংগ্রহ করে Blois-এর বিশপ Abbe' Gregoire রামমোহন সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকার একটি কপি 'Monthly Repository' পত্রিকার সম্পাদককে পাঠান হন। পুস্তিকার মধ্যে রামমোহনের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে নানা তথ্যের সমাবেশ দেখা যায়। তার মধ্যে কয়েকটি হল: ভাল অথবা মন্দ যে কোন নূতন চিন্তা গ্রহণ করার পক্ষে প্রথম বয়সই উপযুক্ত বিবেচনা করে রামমোহন নিজ ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন ; সেখানে পঞ্চাশ জন ছাত্র সংস্কৃত, ইংরাজী ও ভূগোল শিক্ষা করে। রামমোহন তাঁর স্বদেশবাসীদের জাতিভেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছেন। ইউরোপীয়গণ যখন আহার করেন তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে একত্রে বসতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। যে কুসংস্কারের ফলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক একসঙ্গে আহার করে না, রামমোহন তার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করছেন। তিনি মনে করেন এই সংস্কার দূর হলে অন্যান্য বিষয়েরও উন্নতি হবে। এমনকি দেশের রাজনৈতিক উন্নতিও এর উপর নির্ভর করে ; তাই তিনি এ বিষয়ে উদাসীন নন। ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে প্রতি ছমাস অন্তর তিনি বাংলায় ও ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং কোলকাতা অথবা মাদ্রাজ হতে কেউ এর প্রতিবাদ করলে তিনি উত্তর দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। আরবীভাষায় তর্কশাস্ত্র পাঠ করে তিনি ধর্মবিচারে দক্ষতা অর্জন করেছেন ; এবং তিনি মনে করেন যে এই তর্কশাস্ত্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই সঙ্গে

একথাও মনে করেন যে ইউরোপীয় গ্রন্থের মধ্যে এমন কিছুই নেই যার সঙ্গে হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রের তুলনা হতে পারে। রামমোহনের বয়স এখনও চল্লিশ হয়নি। তিনি দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। তাঁর সুগঠিত দেহ এবং স্বভাবতঃ গম্ভীরমূর্তি অত্যন্ত সুন্দর দেখায় যখন তিনি উৎসাহিত হন। তাঁর মধ্যে একটু বিমর্ষভাব আছে। তাঁর ব্যবহার এবং কথোপকথন হতে প্রথম দর্শনেই মনে হয় তিনি সাধারণের ঊর্ধ্বে'।

ফ্রান্সের ন্যায় আমেরিকাতেও রামমোহনের খ্যাতি সমানভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। ১৮১৮ সালের অক্টোবর মাসে ক্যালকাটা জার্নাল এ বিষয়ে লিখেছে, 'An American review has been lately put into our hands, in which we have seen with much pleasure that the able exposition of the idolatrous worship of the Hindoos, by the learned and philosophic Rammohun Roy, has reached even to that remote quarter of the globe, and that its merits and its probable consequences have been duly appreciated.' ১৮১৮ সালের প্রথম হতেই রামমোহন প্রসঙ্গ আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। Miss Adrienne Moore রচিত 'Rammohun Roy and America' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেই রামমোহনের খ্যাতি এইভাবে দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। রামমোহন পৌত্তলিকাতার প্রতিবাদ করে একেশ্বরবাদের সমর্থন করেছিলেন; এবং এই একেশ্বরবাদের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের মিল থাকার জন্যই মিশনারীরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁরা রামমোহন-প্রসঙ্গ আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁদের এই আলোচনায় রামমোহনের পাণ্ডিত্য, চরিত্রমাধুর্য, বিচারশক্তি ও তেজস্বিতার যে পরিচয় ছিল তা মিশনারী ছাড়াও অন্যান্য বিদেশী মনীষীদের কৌতূহল উদ্রেক করে। তাই আত্মীয়সভার অধিবেশনে ডেভিড হেয়ার এসে যোগ দেন। হেয়ার এদেশে এসেছিলেন ঘড়ির ব্যবসাদার হিসাবে। তারপর এখানকার সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে সমাজসেবার ব্রতে উৎসাহিত করে। তাই তিনি তাঁর ঘড়ির ব্যবসা গ্রে নামে জনৈক সাহেবকে

হস্তান্তরিত করলেন। সংবাদপত্রে ছাপা হল : 'old Hare turned Grey.' সমাজসেবার কাজে হেয়ার পরিচিত হলেন রামমোহনের সঙ্গে। এদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষা বিস্তারে উভয়ের যোগাযোগ এক স্মরণীয় ঘটনা। শুধু হেয়ার নন, ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক Silk Buckingham রামমোহনের সংস্পর্শে এসে তাঁর বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ তিনি একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। ১৮১৮ সালের জুন মাসে বাকিংহাম কোলকাতায় আসেন। ঐ মাসেই তিনি রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময় রামমোহনের অসাধারণ ইংরাজী জ্ঞানের পরিচয় তাঁকে মুগ্ধ করে। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'In English he is competent to converse freely on the most abstruct subjects and to argue most closely and coherently than most men that I know.'

এছাড়া আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির এই সময়কার লেখায় রামমোহনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি হলেন লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল ফীটস্ক্লারেন্স (Fitzclarence)। তাঁর 'Journal of a Route across India, through Egypt to England in the year 1817 and 1818.' গ্রন্থে তিনি রামমোহনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে রামমোহন কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নন, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর সম্যক্ জ্ঞান আছে। রামমোহন তাঁকে বলেছেন যে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ বিকৃত হয়ে বহু দেবোপাসনায় পরিণত হয়েছে। রামমোহন ইউরোপের রাজনীতি শিখেছেন এবং এবিষয়ে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তিনি স্বাধীন দেশে শান্তির সময়ে সৈন্য রাখার বিরুদ্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করেছিলেন এবং পার্লামেণ্টের যে সকল সভ্য ঐ মতাবলম্বী তাঁদের যুক্তিগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন। মধ্যযুগের ইউরোপবাসীদের অপেক্ষা অনেক বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেও রামমোহন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছেন। তিনি একজন প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি। লক্ ও বেকনের লেখা প্রায়ই তিনি আবৃত্তি করে থাকেন। শোনা যায়, তাঁর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁকে ত্যাগ করেছেন। বর্তমানে তিনি জাতিচ্যুত এবং অন্যান্য সকল ধর্ম-সংস্কারকের ন্যায় সাধারণের উপহাসের পাত্র। কোলকাতায় ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি দেখতে সুশ্রী, তাঁর গায়ের রং খুব কালো নয়,

ব্যবহার চমৎকার। তিনি দেশীয় পোষাক পরিধান করেন; তাঁর একটি গাড়ী আছে এবং সম্পত্তি আছে যথেষ্ট। ইংলণ্ড দেখতে এবং সেখানে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে তাঁর আগ্রহ সমধিক। সব মিলিয়ে রামমোহন সম্পর্কে তাঁর ধারণা : 'he is in many respect a most extraordinary person,' শুধু তিনি নন, সেদিন অনেকেই জেনেছিলেন যে রামমোহন একজন অসাধারণ ব্যক্তি।

॥ পাঁচ ॥

রামমোহন যখন পৌত্তলিকতার বিরোধিতার জন্য, সতীদাহের প্রতিবাদের জন্য হিন্দুসমাজে লাঞ্ছিত, বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন, তখন মিশনারীরা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, উৎসাহ দিলেন, মুগ্ধচিত্তে গ্রহণ করলেন। শুধুমাত্র বাংলার মিশনারীদের একক কণ্ঠ নয়, দূর ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স হতেও সমবেত কণ্ঠে তাঁর জয় উচ্চারিত হল। এই বিস্ময়, মুগ্ধতা ও সমর্থনের সবটুকুই কিন্তু রামমোহনের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি, দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টা অথবা মধুর ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, এর পশ্চাতে আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণে মিশনারীদের দান যথেষ্ট একথা যেমন সত্য, তেমনি তার অনেকখানিই যে তাঁদের উদ্দেশ্যের প্রত্যক্ষ ফল নয় তাও অনস্বীকার্য। একটি বিশেষ ব্রত নিয়ে তাঁরা এদেশে এসেছিলেন, মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই কর্মের পরোক্ষ সুফল আমরা পেয়েছি। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা অথবা জ্ঞানচর্চার বিস্তার ঘটিয়ে এদেশের সামাজিক কল্যাণসাধন অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে এখানকার অধিবাসীদের দুর্গত আত্মার কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। রামমোহনকে সমর্থন করার পশ্চাতে তাঁদের সেই একই উদ্দেশ্য ছিল সমানভাবে সক্রিয়।

রামমোহন যখন পৌত্তলিকতার পরিবর্তে একেশ্বরবাদের কথা ঘোষণা করলেন তখন মিশনারীরা এর মধ্যে দেখলেন তাঁদের উদ্দেশ্য পূরণের সুনিশ্চিত ইঙ্গিত। তাই দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে যখনই যে-কেউ রামমোহন প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন, তখনই খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগের কথা লিখতে ভুল করেন নি। তিনি যে অতি শীঘ্র খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করবেন সে আভাসও তাঁরা দিয়েছেন। কেউ বা অতি দুঃসাহসিকভাবে এমনও পর্যন্ত লিখেছেন; 'Then he studied our Bible in English, and in consequence became a Christian.' ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কেউ লিখেছেন, 'we pray God to give him grace, that he may in penitence and faith embrace with all his heart the Saviour of the world'; এবং তা হলে, অর্থাৎ রামমোহন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলে, 'the Christian missionary whom Christ

sends forth will find mouth and tongue which no man shall be able to gainsay or to resist.'

রামমোহন সম্বন্ধে মিশনারীদের এই যে ধারণা তা তাঁদের পক্ষে একান্তভাবে স্বাভাবিক ছিল। একজন হিন্দু যখন একদিকে প্রকাশ্যে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করছেন এবং অন্যদিকে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শন করছেন তখন তাঁর পক্ষে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। এই দুই-এর মাঝখানে আর কিছু কল্পনা করা সেদিনের মিশনারীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কোলকাতা আসার আগেই রামমোহন খৃষ্টধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। একদিন যেমন তাঁর অপৌত্তলিক মন ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তেমনি সেই একই কারণে খৃষ্টধর্ম তাঁকে আকর্ষণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। ডিগবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার পর তিনি এই ধর্মতত্ত্ব অবগত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ এবং উৎসাহ পান। এরই ফলে ঐ ধর্মের মূল শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। এ ছাড়াও, কথিত আছে কোলকাতায় এসে রামমোহন একজন ইহুদী শিক্ষক নিযুক্ত করে ছ' মাসে হিব্রু ভাষাও আয়ত্ব করেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি রামমোহনের অনুরক্তি সেদিন অন্যভাবেও প্রকাশ পায়। তিনি মিশনারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, কেরীর পারিবারিক প্রার্থনায় যোগ দেন, তাঁর প্রদত্ত বাইবেল আনন্দে গ্রহণ করেন, এমন কি, কেন-উপনিষদের ভূমিকা বাইবেল হতে উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করেন। খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের এই অনুরক্তি সেদিন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় ডিগবীকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, 'The consequence of my long and uninterrupted researches into religious truth has been that I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any other which have come to my knowledge.' তাই রামমোহন তাঁর স্বদেশবাসীদের উপকারার্থে ১৮২০ সালে 'Precepts of Jesus' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদের উল্লেখ ছিল, কিন্তু কোনটিই পাওয়া যায়নি।

রামমোহনের Precepts of Jesus গ্রন্থ ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হতে মুদ্রিত হল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিশনারীরা একদিকে যেমন রামমোহনের এই পুস্তক প্রকাশ করার দায়িত্ব নিলেন, অন্যদিকে তেমনি এর এক তীব্র সমালোচনা করতেও ছাড়লেন না। কারণটি হল, রামমোহন খৃষ্টের উপদেশ সংকলনে সম্পূর্ণ বাইবেল অবলম্বন করেননি; কিছু অংশ সেখানে বর্জিত হয়েছিল। এই বর্জন প্রসঙ্গে রামমোহন তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, I feel persuaded that by separating from other matters contained in the New Testament, the moral precepts found in that book, these will be more likely to produce the desirable effect of improving the hearts and minds of men of different persuations and degrees of understanding. For, historical and some other passages are liable to doubts and disputes of free thinkers and anti-Christians, especially miraculous relations, which are much less wonderful than the fabricated tales handed down to the natives of Asia, and consequently could be apt at best to carry little weight with them.' রামমোহনের পুস্তকে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব এবং অলৌকিকত্ব স্থান পেল না। তাই মিশনারীরা তাঁর প্রতি বিরক্ত হলেন। তাঁদের ধারণা হল যে রামমোহনের পুস্তক খৃষ্টধর্মের প্রচলিত বিশ্বাসের এক প্রতিবাদ। তাই মিশনারী পরিচালিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় Mr. Schmidt এই পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করে এক প্রবন্ধ লেখেন; স্বনামে নয়, 'A Christian Missionary' নামের আড়ালে। অন্যান্য মিশনারীদের ন্যায় Rev Deocar Schmidt-ও একদিন রামমোহন সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়েছিলেন। বেদান্তের অনুবাদ প্রকাশিত হলে তিনি এই অসাধারণ মানুষটির সঙ্গে পত্রযোগে পরিচিত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮১৯ সালের এপ্রিলে লিখিত এক পত্রে তিনি রামমোহনকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে উপদেশও দিয়েছিলেন। যে-রামমোহন সম্বন্ধে তাঁদের এতখানি আশা ছিল, তাঁর কাছ থেকে এই পুস্তক ধারণাতীত। Mr. Schmidt তখন কোলকাতায় ছিলেন। তিনি এর সমালোচনা করলেন। এই সঙ্গে সম্পাদক হিসাবে যশুয়া

মার্শম্যান রামমোহন সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন, 'an intelligent heathen whose mind is as yet completely opposed to the grand Design of the Saviour's becoming incarnate,' এবং পুস্তক সম্বন্ধে লিখলেন, 'the manner in which it is done, as is justly observed by our highly esteemed correspondent, may greatly injure the cause of truth.'

রামমোহন ব্যথিত হলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে সচেষ্টও হলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করে 'A friend of truth' ছদ্মনামে তিনি প্রকাশ করলেন 'An Appeal to the Christian Public'। কুড়ি পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় প্রথমে রামমোহন মিশনারীদের কটূক্তির জবাব দেন। মিশনারীদের মন্তব্যকে তিনি 'unchristian like' এবং 'uncivil' বলে অভিযুক্ত করেন। রামমোহন খৃষ্টের উপদেশ সংকলনে কিছু কিছু অংশ বর্জন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন যে এই বর্জন ব্যাপারে তিনিই প্রথম নন। এই সমস্ত বর্জিত অংশের সত্যাসত্য সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরেই বাদ প্রতিবাদ চলে আসছে। খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বা তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া বাইবেলে নেই। বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করতে না পারার জন্যই এই সমস্ত মতবাদের সৃষ্টি এবং নানা বিরোধ-সংঘাত দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত অংশ বর্জন না করার জন্য এদেশেও মিশনারীদের প্রচেষ্টা সফল হতে পারছে না। মিশনারীরা প্রচুর পরিশ্রম করে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বাইবেলের অনুবাদ করছেন এবং এদেশীয় লোকদের মধ্যে বিতরণ করছেন সত্য, কিন্তু খৃষ্টধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য কেউই গ্রহণ করতে পারছে না। সেই জন্য তিনি তাঁর সংকলনে এমন অংশগুলি বেছে নিয়েছিলেন যেগুলি মনুষ্যসমাজকে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পথে চালিত করবে।

রামমোহনের পুস্তক প্রকাশিত হলে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকার ১৮২০ সালের মে সংখ্যায় মার্শম্যান এর একটি উত্তর দেন। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে ঐ পত্রিকার ত্রৈমাসিক পর্যায়ের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তিনি 'Some observations on certain ideas, contained in the Introduction to the Precepts of Jesus; the guide to peace and happiness' নামে

একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই সুদীর্ঘ আলোচনায় রামমোহনের বিরুদ্ধে মিশনারীদের বক্তব্য স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রামমোহনের সংকলন প্রসঙ্গে মার্শম্যান লিখেছেন, 'instead of exibiting these precepts as sample of the whole Scriptures and representing them as affording indubitable proof of the authenticity of its narratives and the reasonableness and importance of its doctrines, were in reality separated from that gospel of which they form so important a part, and held up as forming of themselves the way of life ; an idea which prevents the grand design of the gospel, and frustrates the grace of God in the salvation of men.'

মার্শম্যানের উত্তরে রামমোহন 'Second Appeal to the Christian Public' প্রকাশ করলেন। পুস্তকটি এবারে স্বনামেই মুদ্রিত হল। প্রথমটির তুলনায় প্রায় ছয়গুণ এই পুস্তকে রামমোহন তাঁর বক্তব্য স্পষ্টভাবে পেশ করলেন। তিনি তাঁর Precepts of Jesus-কে সম্পূর্ণ সমর্থন জানালেন এবং খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদকে আগের মতই সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। ডাঃ কার্পেণ্টারের মতে, রামমোহন এই পুস্তকে, 'is distinguished by the closeness of his reasoning, the extent and critical accuracy of his scriptural knowledge, the comprehensiveness of his investigations, the judiciousness of his arrangements, the lucid statement of his own opinions, and the acuteness and skill with which he controverts the positions of his opponents.' পূর্বে মার্শম্যান রামমোহনের প্রতি অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন, এখানে তিনি তাঁর সেই 'unintentional offence'-এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। তাই 'First Appeal'-এর উত্তরে মার্শম্যানের স্বর অনেকখানি নরম ছিল এবং আলোচনায় তিনি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই রামমোহন তাঁর এই 'Second Appeal'-এ মার্শম্যানের ঐ আলোচনার পদ্ধতিকে 'mild' ও 'christian-like' বলে সন্তুষ্টচিত্তে উল্লেখ করেন।

এই বাদ-প্রতিবাদ শুধুমাত্র রামমোহন ও মিশনারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সাধারণের মধ্যেও এর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। পত্রিকা-পুস্তক মারফৎ উভয়ের বক্তব্যই সম্পূর্ণরূপে সাধারণের দৃষ্টিপথে ছিল এবং তাঁরা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়েছিলেন। রামমোহনের 'Second Appeal' প্রকাশিত হলে 'A firm believer in Christ' নামের আড়ালে একজন ক্যালকাটা জার্নালে একটি পত্র লেখেন। পত্রের তারিখ ছিল ১২ই জুলাই, ১৮২১ সাল। এই পত্রে তিনি রামমোহনের প্রচেষ্টার, তাঁর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি লিখেছেন, 'The Second Appeal to the Christian Public in defence of the 'Precepts of Jesus' a work lately published by him, will make us acquainted with his religious belief, will enable us to form some idea of his acquirements, and cannot fail of producting in evey christain, great regard for the author, and a strong interest concerning so illustrious an individual; and the more we learn of his conduct the more will he be raised in our estimation.'

সাধারণের মধ্যে যেমন ছিল রামমোহনের সমর্থক, তেমনি মিশনারীদের সমর্থকও ছিল। তাঁদেরই একজন 'Layman' ছদ্মনামে ক্যালকাটা জার্নালের প্রতিপক্ষ হরকরায় রামমোহনের বক্তব্যকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। রামমোহন 'সত্য-সূদন' নামের আড়ালে এই আক্রমণের এক প্রত্যুত্তর লিখে হরকরায় প্রকাশের জন্য পাঠালেন। কিন্তু হরকরা সেই পত্র প্রকাশে রাজী না হওয়ায় ক্যালকাটা জার্নালে 'A rejected letter' নামে সেই পত্র মুদ্রিত হল।

রামমোহনের Second Appeal-এর উত্তরে ত্রৈমাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ১৮২১ সালের জুন মাসে মার্শম্যান বিস্তারিত আলোচনা করেন। ১২৮ পৃষ্ঠার এই সুদীর্ঘ আলোচনায় তিনি রামমোহনের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন। পরিশেষে তিনি আশা করেছেন যে রামমোহন নিশ্চয়ই তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। তাই তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন, 'to consider the subject and persue the Scripture anew.'

রামমোহন মার্শম্যানের অনুরোধ রক্ষা করে আবার নূতন করে শুরু করলেন। বাইবেলের প্রচলিত ইংরাজী সংস্করণে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় লেখা মূল বাইবেল অধ্যয়ন করলেন। শুধু বাইবেল নয়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন মনীষীদের ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। তারপর প্রায় দীর্ঘ দুই বৎসর পরে ১৮২৩ সালে প্রকাশ করলেন 'Final Appeal'. এতদিন পর্যন্ত রামমোহনের রচনা মুদ্রিত হয়ে আসছিল ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হতে। কিন্তু Second Appeal প্রকাশ হওয়ার পর ঐ রচনা খৃষ্টধর্ম বিরোধী মনে করে ঐ প্রেস রামমোহনের আর কোন রচনা ছাপতে অসম্মত হল। রামমোহন বাধা পেলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাধা অতিক্রমও করলেন। তাঁর নিজস্ব ব্যয়ে তৈরী হল নূতন প্রেস, আর সেই প্রেস হতেই মুদ্রিত হল তাঁর 'Final Appeal'। আখ্যাপত্রে লিখিত হল, 'Printed at the Unitarian Press, Dhurmtolla, Calcutta.' রামমোহন এই পুস্তকে মার্শম্যানের যুক্তি এক এক করে খণ্ডন করার চেষ্টা করলেন। মার্শম্যান স্বমতের সমর্থনে ইংরাজী বাইবেল হতে যে সমস্ত প্রমাণের উল্লেখ করেছিলেন, রামমোহন মূল বাইবেল হতে প্রচুর অংশ উদ্ধৃত করে দেখালেন যে সেগুলি শাস্ত্রসম্মত নয়। তথ্য সমাবেশে ও বিচার-বিশ্লেষণে রামমোহনের এই পুস্তক খৃষ্টধর্ম আলোচনায় এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মার্শম্যান এর কোন উত্তর দেন নি ; তিনি পরাস্ত হলেন। ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক ১৮২৪ সালের ১৭ই মে তারিখে রামমোহন সম্বন্ধে লিখলেন, 'a most gigantic combatant in the theological field—a combatant who, we are constrained to say, has not yet met with his match here.' নিজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে একটি চিঠিতে মার্শম্যান লিখলেন, 'these are the only articles on Divinity, I have ever written, and some may be apt to think me, from the 'Friend of India' more of a politician than a divine'. [১] আর সমস্ত বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্কের মধ্য হতে রামমোহনের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠল তা হল, ধর্মের গোঁড়ামিতে ব্রাহ্মণ আর মিশনারী উভয়েই সমপর্যায়ভুক্ত।

১। Life & times of Carey, Marshman & ward.—Vol II.

॥ ছয় ॥

খৃষ্টের ধর্মমত সংকলন করার পরও বেশকিছুদিন শ্রীরামপুর মিশনারীদের সঙ্গে রামমোহনের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময় মিশনারীদের সঙ্গে তিনি আর একটি ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। তিনি খৃষ্টের উপদেশ সংকলন করার পর বাইবেলের অনুবাদে ব্রতী হন। যদিও ইতিপূর্বে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় বাইবেলের দুটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তবুও রামমোহন মনে করলেন যে সেই অনুবাদে এদেশের ভাষার রীতি রক্ষিত হয়নি। তাই তিনি মিশনারীদের মধ্যে ইয়েটস ও উইলিয়াম এ্যাডামের সহযোগিতায় বাইবেলের পৃথক অনুবাদ শুরু করেন। মিঃ এ্যাডাম ১৮২১ সালের ১১ই জুন তারিখে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটিকে লেখা চিঠিতে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বাইবেলের এই নূতন অনুবাদ বেশ নির্বিঘ্নেই অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ একটি শব্দের অর্থ নিয়ে মতদ্বৈত দেখা দিল। গ্রীক 'dia' শব্দ দ্বারা (by) অথবা মধ্যদিয়া (through) উভয়-ভাবেই অনুবাদ করা যায়। সুতরাং যিশুর দ্বারা সৃষ্টি অথবা যিশুর মধ্য দিয়া সৃষ্টি, এই দুটির মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় সে সম্বন্ধে মতবিরোধ দেখা দিল। প্রচলিত অনুবাদে প্রথমটিকে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এঁরা আলোচনান্তে দ্বিতীয়টিকে গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করলেন। তিনজনই এ বিষয়ে যদিও প্রথমে একমত হয়েছিলেন, তবুও পরে ইয়েটসের মনে হল যে এই অর্থ পরিবর্তনের দ্বারা প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়। তাই তিনি পরের অধিবেশনে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন এবং এই অনুবাদ কার্য পরিত্যাগ করলেন। ঐ অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয় একমাত্র এ্যাডামের সঙ্গে এবং সেই সময় রামমোহন, এ্যাডামের ভাষায়, 'sat, pen in hand in dignified reticence, looking on, listening, observing all, but saying nothing.' রামমোহনের এই সংযত, সভদ্র ও বিস্মিত ভঙ্গী এ্যাডামকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে এবং তিনি রামমোহনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

রামমোহনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল শ্রীরামপুর মিশনারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ; এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের পুরোভাগে ছিলেন ইয়েটস ও এ্যাডাম। কিন্তু আসলে

এ কার্য খুব সহজ ছিল না। রামমোহন যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে খৃষ্টধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং তার ফলে মিশনারীদের প্রচারিত খৃষ্টধর্মের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি। একথা ইয়েটস রামমোহনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই জেনেছিলেন, এবং এ সংবাদ ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর ইংলণ্ডেও পৌঁছেছিল। Rev. T. Belsham, Minister of Essex Street Chapel, London, ১৮১৭ সালের লেখা একটি চিঠিতে এ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি রামমোহন সম্বন্ধে লিখেছেন, 'He told a worthy Clergyman at Calcutta about a year ago, that he preferred Christianity to all other religions and would certainly embrace it, if it were not for the doctrine of the Trinity. This was an insurmountable obstacle.' রামমোহনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার পশ্চাতে Rev. Belsham এই 'insurmountable obstacle' যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু ইয়েটস এবং এ্যাডাম আশা ত্যাগ করেননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। রামমোহনকে দীক্ষিত করার পরিবর্তে রামমোহনের চিন্তা ও ধারণার দ্বারা তাঁরাই প্রভাবিত হয়ে উঠলেন। বিপদের সম্ভাবনায় ইয়েটস সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু এ্যাডামের মনে খৃষ্টধর্মের প্রচলিত মতবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। ১৮২১ সালের ৭ই মে তারিখে Mr. N. Wright কে লেখা চিঠিতে এ সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন।

এ্যাডামের উপর রামমোহনের এই প্রভাবই তাঁকে 'dia' শব্দের অর্থ নিয়ে ইয়েটসের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত করেছিল এবং ইয়েটস অনুবাদ কার্য পরিত্যাগ করলেও, তিনি রামমোহনকে ছাড়তে পারেন নি। অবশেষে এই প্রভাব একদিন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছল যখন এ্যাডাম ত্রিত্ববাদ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে একেশ্বরবাদী বলে প্রচার করলেন। একজন হিন্দুর প্রভাবে একজন পাদ্রীর ধর্মবিশ্বাসের এই পরিবর্তন সেদিন ছিল অচিন্তনীয়। এই সংবাদে চারিদিকে আন্দোলন সৃষ্টি হল। খৃষ্টান সমাজের কাছে এ এক অপ্রত্যাশিত আঘাত। এ্যাডামকে বিদ্রূপ করে তাঁরা বললেন, 'the second fallen Adam.' শয়তানের প্ররোচনায় একদিন এ্যাডামের পতন হয়েছিল স্বর্গরাজ্য হতে, আর আজ দ্বিতীয় এক এ্যাডাম

তেমন এক শয়তান রামমোহনের প্ররোচনায় ত্রিত্ববাদের স্বর্গরাজ্য হতে ভ্রষ্ট হল। তাই এই 'second fallen Adam'-এর সঙ্গে মিশনারীরা তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তাঁরা লিখলেন, 'we mention with deep regret that Mr. william Adam… …has embraced opinions derogatory to the honour of the Saviour—denying the proper Divinity of our Lord Jesus Christ ; in consequence of which the connexion between him and the Society has been dissolved.'

শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় এ্যাডামের এই আচরণে অত্যধিক ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা যখন রামমোহনকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁদেরই একজনের পক্ষে রামমোহনের দ্বারা এইভাবে প্রভাবিত হওয়া নিতান্ত অপমানজনক। এরই ফলে সমস্ত সংযম, সমস্ত ঔচিত্য ও নীতির শাসন অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৮২১ সালের ১৪ই জুলাই 'সমাচার দর্পণে' তাঁরা একটি আলোচনা প্রকাশ করলেন। এই আলোচনাটি পত্রাকারে বিন্যস্ত এবং দূর দেশ হতে 'কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা' প্রেরিত। এই আলোচনা হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে অযৌক্তিক, অশালীন, ও অন্যায় মন্তব্যে পূর্ণ। পত্রের প্রথমে লেখক লিখেছেন, 'সর্ব দেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েদের প্রতি আমার নিবেদন এই বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজা একত্রে আছেন শাস্ত্রার্থে সন্দেহচ্ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই। তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন নিবেদিতেছি অনুগ্রহাবলোকনপূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার দর্পণ দ্বারা দেন তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যায়াভাব ইতি।' এরপর ঐ পত্রে পাঁচটি প্রশ্ন স্থান পেয়েছে। সবশেষে পত্রিকার পক্ষ হতে লেখা হয়েছে, 'কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে এখানে ঐ কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপা গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুর ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক।'

রামমোহন এই ব্যাপারে একদিকে যেমন শ্রীরামপুর মিশনারীদের নীচ মনের পরিচয় পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন, অন্যদিকে তেমনি দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সঙ্গে এর সমুচিত উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী হলেন। তিনি তাঁর পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্রের নামে এই পত্রের একটি উত্তর লিখে প্রেরণ করলেন। কিন্তু সমাচার দর্পণে তা প্রকাশিত হল না। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ পত্রিকা এ সম্বন্ধে লিখল, 'শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাবিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাবিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শণের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্বসমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।"[১]

সমাচার দর্পণ রামমোহনের এই উত্তর ছাপতে অস্বীকৃত হওয়ায় রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মার নামে ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করলেন। পত্রিকাটির নাম Brahmunical Magazine. The Missionary & the Brahmun, অথবা 'ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সম্বাদ'। এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হত। এই পত্রিকার মোট কতগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তা সঠিক জানা যায়নি। রামমোহন-গ্রন্থাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণ সেবধির তিন সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; সম্ভবতঃ ইহার আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।' ঐ তিনটি সংখ্যা উক্ত সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছে। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত রামমোহনের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর মধ্যে Brahmunical Magazine-এর চারটি সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছে এবং ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'he published the Brahmunical Magazine, the fourth number of which is dated November 1823,' মিস্ কলেটের পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় 'supplimentary notes' অংশে লিখেছেন, 'Rammohun in reply issued the fourth and the last number of the Bramhunical Magazine in 1823. This

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ১ম খণ্ড।

was published only is English.' কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তাঁর পুস্তকে পাদ-টীকায় লিখেছেন, 'এই পত্রিকা ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন (Brahmunical Magazine) নামে এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরাজী সহিত প্রকাশিত হইত। সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রামমোহন রায়ের বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশক বাঙ্গলায় তিনখানি ও ইংরাজীতে চারিখানির অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।'

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রামমোহন একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন এবং উক্ত ভূমিকায় তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি এবং সর্বোপরি আত্মমর্যদার এক অভূতপূর্ব পরিচয় রয়েছে। তিনি প্রথমেই লিখেছেন, 'শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না······ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন।' এই ব্যাপারে মিশনারীরা একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়েছিলেন। সেই সম্পর্কে রামমোহন লিখেছেন, 'প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোন নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোন কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।' যে দেশ ইংরাজের অধিকৃত নয় সেখানে হয়ত এইভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা যেতে পারে ; 'কিন্তু বাঙ্গলাদেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নামমাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না।' অবশ্য এটাই স্বাভাবিক যে বিজেতা বিজিতের ধর্মকে প্রায়ই উপহাস করে থাকেন। রামমোহন এ সম্বন্ধে ইতিহাসের প্রমাণ উল্লেখ করে লিখেছেন, 'চঙ্গেশা হার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস

করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর ন্যায় ছিল তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের প্রায় কোন ধর্ম্ম ছিল না তাহারাও যখন বাঙ্গলার পূর্ব্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্ব্বদা হিন্দুর ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব্বকালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতি নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎ কর্ম্মে বিব্রত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদির ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত…।' এই হিসাবে মিশনারীদের কর্মপন্থাকে স্বাভাবিক বলা যেতে পারে। কিন্তু তবুও তা সঙ্গত নয় যেহেতু 'ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না…।' ইংরাজের জাতীয় চরিত্রের উপর রামমোহনের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাই মিশনারীদের কাছ হতে এ ধরণের ব্যবহার ছিল তাঁর আশার অতীত। রামমোহন ইংরাজের জাতীয় চরিত্রকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, সেই সঙ্গে নিজের জাতীয় ঐতিহ্য ছিল তাঁর কাছে গর্বের সামগ্রী। আত্মমর্যাদা ছিল তাঁর আকাশস্পর্শী। তাই সবশেষে তিনি লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে।'

এই প্রখর আত্মমর্যদাবোধের জন্য রামমোহন সমাচার দর্পণে প্রকাশিত পত্রের উত্তর দিতে ব্রতী হলেন। ঐ পত্রে মোট ছয়টি প্রশ্ন করা হয়েছিল। রামমোহন ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম সংখ্যায় চারটি ও দ্বিতীয় সংখ্যায় অবশিষ্ট দুটি প্রশ্ন মুদ্রিত করে উত্তর দিলেন। হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে ঐ সমস্ত প্রশ্নে যে-সব মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছিল রামমোহন শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ করে সেগুলি খণ্ডন করেন। ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হলে দ্বিতীয় সংখ্যাতেই রামমোহন 'পুনশ্চ' অংশে পাদ্রীদের নিকট পাল্টা কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং উত্তর দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি লিখেছেন, 'যিশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। যিশুখ্রিষ্ট কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না। ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলি গোষ্ট ঈশ্বর।

ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে আরাধনা করিবেন কহিয়া থাকেন অথচ এ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে য়িশুখ্রিষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ য়িশুখ্রিষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেক তুল্যতা সম্ভবে না। এ সকলের উত্তর পাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব……।'

মিশনারীরা রামমোহনের এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন ১৮২১ সালের আগষ্ট মাসে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ৩৮ সংখ্যায়। এরই কয়েক মাস পরে রামমোহন ব্রাহ্মণ সেবধির তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ করলেন। এই সংখ্যায় রামমোহন তাঁর প্রতিটি প্রশ্ন ও সেই সম্পর্কে মিশনারীদের উত্তর সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করলেন। ইতিমধ্যে রামমোহনের 'Precepts of Jesus' গ্রন্থকে কেন্দ্র করে মিশনারীদের সঙ্গে আর এক দফা বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। তাই ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় উত্তর দেওয়ার সময় তাঁদের গাত্রজ্বালা চেপে রাখতে পারেন নি। তাঁরা তাঁদের উত্তরের সঙ্গে এদেশীয় লোকদের নৈতিক জীবন সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিলেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য করতে বিরত হন নি। রামমোহন মিশনারীদের এই সমস্ত মন্তব্যের উত্তরে লিখেছেন 'এ দেশের লোকের নীতি ও ধর্ম্মের ক্রটি বিষয়ে যাহা আপনি লিখিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপদেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিষয়ে উৎপ্রেক্ষা দিয়া দোষের ন্যূনাধিক অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ দ্বন্দ্ব করা অনুচিত হয় সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম যেহেতু ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে। আপনি যে কদুক্তি করিয়াছেন যে 'মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম উৎপত্তি হয়' আর 'হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন সকল' 'হিন্দুদের মিথ্যা দেবতাসকল' সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে কিন্তু আমাদিগ্যে জানা কর্ত্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি পরস্পর দুর্ব্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।' মিশনারীদের তুলনায় রামমোহন এক্ষেত্রে যে সংযম, শিষ্টাচার, শালীনতা ও ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর অতুলনীয় চরিত্রমাধুর্যের পরিচায়ক।

যদিও তৃতীয় সংখ্যার শেষে রামমোহন মিশনারীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, 'ইহার

প্রত্যুত্তর আপনি ক্রমপূর্ব্বক দিবেন' তবুও দীর্ঘদিন যাবৎ মিশনারীদের পক্ষ হতে এর কোন উত্তর প্রকাশিত হয়নি। প্রায় দুবৎসর পরে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হতে বেদের বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ করে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। রামমোহন এই মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিলেন চতুর্থ সংখ্যায়। ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন, 'Notwithstanding my humble suggestions in the third number of the Magazine against the use of offensive expressions in religious controversy, I find, to my great surprize and concern, in a small tract lately issued from one of the missionary presses and distributed by missionary gentlemen, direct charges of *atheism* made against the doctrines of the veds, and undeserved reflections on us as their followers. This has induced me to publish, after an interval of two years, a fourth number of the Brahmunical Magazine.'

এই সংখ্যাটি দুইটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টি হল, 'A reply to certain queries directed against the Vedant' এবং দ্বিতীয় অধ্যায়টি হল 'Reasons of a Hindoo for rejecting the doctrines of Christianity.' বেদের প্রতি মিশনারীদের অসম্মানসূচক মন্তব্য রামমোহনের সমস্ত ক্রোধ প্রদীপ্ত করে তুলেছিল। তিনি মিশনারীদের উদ্দেশ্যে তাই ভূমিকায় লিখেছেন, 'they may at least learn from experience a lesson of *charity*, which they are ready enough to inculcate upon others, overlooking, at the same time, the precept given by their God : 'Do unto others as you would wish to be done by,' implying, that if you wish others to treat your religion respectfully, you should not throw offensive reflections upon the religion of others.' রামমোহন তাঁর বেদান্তসার গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হতে প্রচুর উদ্ধৃতি আহরণ করে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মিশনারীদের মিথ্যা দোষারোপ খণ্ডন করলেন। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন যে

হিন্দুধর্মের প্রচলিত রূপটিই তার আসল রূপ নয়। মনু যে বেদোক্ত ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন সেটাই হল প্রকৃত হিন্দুধর্ম। মিশনারীরা যদি সে কথা বিস্মৃত হয়ে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত রূপটির প্রতি বিশেষ জোর দেন তাহলে খৃষ্টধর্মের মধ্যেও সেই একই অসঙ্গতি উল্লেখ করা যেতে পারে। রামমোহন লিখেছেন, 'a Hindoo would also be justified in taking as the standard of Christianity, the system of religion which almost universally prevailed in Europe previous to the fifteenth century of Christian Era, and which is still followed by the majority of Christians (namely, Catholics, Greeks, Armenians) with all its idols, crucifixes, Saints, miracles, pecuniary absolutions from sins, trinity, transubstantiation, relics, holy water, and other idolatrous machinery.'

এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার সম্বন্ধে রামমোহন মন্তব্য করেছেন যে যদি মিশনারীরা অলৌকিক অংশ এবং ঈশ্বরের ত্রিত্ব প্রভৃতি বিষয় প্রচার হতে নিবৃত্ত না হন তাহলে এ দেশীয় কেউ আকৃষ্ট হবে না। সুতরাং রামমোহনের মতে, 'they aught······to confine their instructions to the practical parts of Christianity, keeping entirely out of view the doctrine of the Trinity and the idea of a two or three fold nature of God and Man, or God, Man and Angel.' তিনি বিভিন্ন মনীষী ও পাদ্রীদের উক্তি উদ্ধৃত করে দেখালেন যে এই সব বিষয়ে প্রত্যেকেই একটি করে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রামমোহন প্রশ্ন করেছেন, 'Are not these explanations of the Trinity, given by the persons most versed in the Scriptures, sufficient to puzzle any man, if not drive him to atheism?' যে নাস্তিকতার অপবাদ মিশনারীরা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে উচ্চারণ করেছিলেন, রামমোহন তাঁদেরই প্রচলিত ধর্মমতের ব্যাখ্যা করে সেই অভিযোগ ফিরিয়ে দিলেন। তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, 'no grown up native of India possessed of common sense and common honesty, will ever be persuaded

to believe in their self-contradictory Creed and that their religious efforts will be unavailing, unless they adopt, or be enabled to adopt, some unfair means for the promotion of Christianity.' রামমোহন এই সঙ্গে দেখালেন যে অসৎ উপায় অবলম্বন করার মত পরিবেশও গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের হিন্দুদের মধ্যে যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার ফলে অচিরেই অধিকাংশ হিন্দু দারিদ্র্যের কবলে পতিত হতে বাধ্য হবে। তখন ধর্মকে ভালবেসে নয়, কিংবা কোন মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, কিছু সুখ, কিছু সম্পদ, কিছু সৌভাগ্যের আশায় তারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে ; আর তখন মিশনারীরাও সেই সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না। রামমোহন যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণের সাহায্যে হিন্দুদের সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের বিবরণ দিয়েছেন।

Brahmunical Magazine-এর চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালের ১৫ই নভেম্বর। ঐ বৎসরের ৩০শে জানুয়ারী রামমোহনের 'Final Appeal to the Christian Public' প্রকাশিত হয়েছিল। Precept of Jesus কে কেন্দ্র করে মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর যে বাদপ্রতিবাদ শুরু হয়েছিল এই পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন তার শেষ চেয়েছিলেন, পুস্তিকার নামে সেই ইঙ্গিতই ছিল। কিন্তু তাই বলে তিনি খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করতে চাননি। বরং আরও গভীরভাবে তথ্যনির্ভর প্রণালীবদ্ধ আলোচনার সূত্রপাতের জন্য ঐ বৎসরের এপ্রিল মাস হতে পৃথক একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন 'Final Appeal'-এর ভূমিকায়। এই সঙ্গে একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে মিশনারীরা সাধারণ ভদ্রতা ও সংযমের সীমা অতিক্রম করে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রূপ ও গালি বর্ষণ করতে দ্বিধা করেননি। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে রামমোহন এখানে আগে হতেই সাবধান করে দিয়ে লিখেছেন, 'it will be absolutely necessary that nothing be introduced of a personal nature, or calculated to hurt the feelings of individuals—that we avoid all offensive

expressions, and such arguments as have no immediate connection with the subject, and can only serve to retard the progress of discovery ; and that we never allow ourselves for a moment to forget that we are engaged in a solemn religious disputation.'

রামমোহনের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। তিনি আলোচনায় যোগদানের জন্য বিশেষভাবে মিশনারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউ এতে অংশগ্রহণ করলেন না। তার পরিবর্তে যে ভদ্রলোক আলোচনায় যোগদান করলেন, তিনি রামমোহনের অনুরোধে কর্ণপাত না করে আপন স্বভাব অনুযায়ী সেই একই ধরণের আক্রমণ ও কটুক্তিতে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এই ভদ্রলোকের নাম Dr. R. Tytler, M. D. ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সার্জেন ছিলেন। 'An enquiry into the origin and Principles of Budaic Sabism' এবং 'The Substance of a Discourse in vindication of Divinity of our Lord' এই দুটি গ্রন্থ এঁরই রচনা। এছাড়া তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির একজন সভ্য। ইনি হরকরা পত্রিকায় প্রথমে রামমোহনকে আক্রমণ করলেন। রামমোহন 'রাম দাস' ছদ্মনামে এই প্রসঙ্গে লিখলেন যে রামমোহন হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ও খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ উভয়েরই বিরোধিতা করেন, অথচ ঐ দুটি মত হিন্দু ও খৃষ্টানদের ধর্মের মূল কথা। সুতরাং রামমোহন হিন্দু ও খৃষ্টান উভয়ের শত্রু। এই শত্রুর বিরুদ্ধে একসঙ্গে অভিযানের জন্য রাম দাস টাইটলর সাহেবকে আমন্ত্রণ জানালেন। টাইটলরের কাছে এই আমন্ত্রণ অসম্মানজনক। কেননা একজন পৌত্তলিকের সঙ্গে খৃষ্টানরা কোনমতেই এক সাধারণভূমিতে দাঁড়াতে পারেন না। তাই টাইটলর অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে উত্তরে জানালেন যে খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মে তুলনা অন্যায়। কিন্তু রাম দাস এর উত্তরে লিখলেন যে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান ও পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্মমতের ভিত্তিভূমি এক ; অবতারবাদ ও ঈশ্বরের বহুত্বে উভয়েই বিশ্বাসী। রাম দাসের এই মন্তব্যে টাইটলর ক্রুদ্ধ হয়ে খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য সচেষ্ট হলেন। কিন্তু যুক্তি-বিচারে অবশেষে রাম দাসের কাছে তাঁর পরাজয় ঘটল। এই বাদ-প্রতিবাদ ১৮২৩ সালের

৩রা মে হতে ২৩শে মে পর্যন্ত চলেছিল। পরে ৩রা জুন তারিখে ঐ সমস্ত সংগ্রহ করে 'A vindication of the Incarnation of Deity as the common basis of Hinduism and Christianity against the schismatic attacks of R. Tytler, Esq. M. D., by Ram Doss.' নামে প্রকাশিত হয়। এই বাদ-প্রতিবাদের ক্ষেত্র ছিল প্রধানতঃ হরকরা পত্রিকা। কিন্তু এই পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার পর আবার এই তর্কযুদ্ধ নূতন করে আরম্ভ হয় এবং তখন এর ক্ষেত্র হয় ইণ্ডিয়া গেজেট ও এ্যাডভার্টাইজার পত্রিকা। মসীযুদ্ধ চলেছিল জুন মাসের ১২ই হতে ২৯শে পর্যন্ত। প্রথমে আলোচনা ইণ্ডিয়া গেজেটে শুরু হয়। সেখানে চিঠিপত্র প্রকাশের জন্য কোন পক্ষকেই কিছু খরচ করতে হত না। কিন্তু পরে টাইটলর তাঁর আলোচনা তাঁর প্রকাশকের পত্রিকা এ্যাডভার্টাইজারে প্রকাশ করেন। কিন্তু এখানে বিনা খরচায় রামমোহনের চিঠি মুদ্রিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। তবুও রামমোহন উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করে আলোচনা চালিয়ে যান। অবশেষে তাঁর ২৯শে জুন তারিখের চিঠি প্রকাশক ফেরৎ দিলেন এবং সেই সঙ্গে জানালেন যে যেহেতু টাইটলর কোলকাতা ত্যাগ করে চলে গেছেন সেইজন্য তাঁর পক্ষে আর কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। ১৪ই জুলাই তারিখে রামমোহন সমস্ত চিঠিপত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করলেন। এবারেও আলোচনা চলেছিল সেই একই ছদ্মনামে, তাই পুস্তিকাও প্রকাশিত হল রাম দাসের নামে।

রামমোহন এই সময় অর্থাৎ ১৮২৩ সালের মে মাসে খৃষ্টধর্ম বিষয়ে আর একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এর নাম 'পাদ্রি ও শিষ্য সম্বাদ'। এর ইংরাজী অনুবাদ 'A Dialogue between a Missionary and Three Chinese Converts' একই সময় প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় একজন পাদ্রীর সঙ্গে তাঁর তিনজন চীনদেশীয় শিষ্যের কাল্পনিক কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। পাদ্রীদের প্রচারকার্যের ফলে এদেশে ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বর এক কি অনেক —পাদ্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর তিনজন শিষ্য তিনরকম উত্তর দিয়েছে। প্রথম শিষ্য বলেছে, ঈশ্বর তিন; দ্বিতীয় শিষ্য বলেছে, ঈশ্বর দুই এবং তৃতীয়

শিষ্যের জবাব হল ঈশ্বর নেই। প্রত্যেকেই তাদের সিদ্ধান্তের কারণ উল্লেখ করেছে। প্রথম শিষ্য বলেছে, 'আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি গোষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারদিগের গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।' দ্বিতীয় শিষ্য বলেছে, 'আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে, তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, পশ্চিমদেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন বহুকাল হইল মারা গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন।' তৃতীয় শিষ্য বলেছে, 'পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি কহিতে পারি।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই পুস্তিকায় 'প্রশ্নোত্তর ছলে গ্রন্থকার সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ত্রীশ্বরাত্মক খ্রীষ্টীয় মত নিতান্ত অসঙ্গত।'

॥ সাত ॥

সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন রামমোহনের জীবনের ব্রত ছিল বলেই শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে। রামমোহনের সময়ে এদেশে শিক্ষার আয়োজন যথেষ্ট ছিল না। পাঠশালা, চতুষ্পাঠী আর মক্তবের মাধ্যমে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল তা একান্তভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের। তাছাড়া ইংরাজী শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না সেখানে। অথচ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীশিক্ষা বাঙালীর জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠছিল। একদিকে নূতন শাসকগোষ্ঠীর ভাষা হিসাবে ব্যবহারিক জীবনে ইংরাজীর দাম বাড়ছিল, অন্যদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে উন্নতিসাধনের জন্য ইংরাজীর প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। রামমোহন এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বেশী বয়সেও তিনি এই নূতন ভাষাটি শিখতে শুরু করেছিলেন এবং কোলকাতায় বসবাস করার একরকম শুরু থেকে শিক্ষা-বিস্তারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

এদেশে ইংরাজীধাঁচের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল 'কলিকাতা মাদ্রাসা'। এটি প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ সালে। হেষ্টিংস নিজের খরচায় এর জন্য একটি বাড়ী করে দেন এবং প্রতিষ্ঠানটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি জায়গীর ব্যবস্থা করে দেন। মাদ্রাসার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ভালভাবে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া। ১৭৯২ সালে বেনারসের রেসিডেণ্ট Mr. Jonathan Duncan বেনারসে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে হিন্দু শাস্ত্র, সাহিত্য ও আইন শিক্ষা দেওয়া হত। উদ্দেশ্যের দিক থেকে এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল সমধর্মী। শাসনকার্যে ইউরোপীয় অফিসারদের সাহায্য করার জন্য এদেশীয় অধিবাসীদের এখানে হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র ও আইনে অভিজ্ঞ করে তোলা হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল এই দুটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার মূল কারণ।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত এদেশে শিক্ষাবিস্তারের কোন ইচ্ছাই কোম্পানীর ছিল না। শাসকের

ভূমিকায় কোম্পানীর একমাত্র কাজ ছিল শোষণ করা। এদেশের মানুষ যতদিন প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে থাকবে ততদিন অন্ধকার ঘিরে থাকবে তাদের নিবিড় করে ; আর সেই অন্ধকারে শোষণের যন্ত্রটাকে প্রাণপণে চালিয়ে যাবে—এই ছিল কোম্পানীর আশা। যদি শিক্ষার আলো আসে, আর সেই আলোয় যন্ত্রের বিকট-রূপটা হঠাৎ প্রতিভাত হয়ে পড়ে শাসিতের সামনে, তাহলে বিদ্রোহ সূচিত হতে পারে,—কোম্পানীর কর্তাদের মনে এ ভয়ও ছিল। ১৮৫৩ সালের ১৫ই জুন তারিখে সিলেক্ট কমিটির সামনে প্রদত্ত মার্শম্যানের সাক্ষ্য হতে জানা যায় : 'For a considerable time after the British Government had been established in India, there was great opposition to any system of instruction for the Natives. The feelings of the public authorities in the country were first tested upon the subject in the year 1792, when Mr. Wilberforce proposed to add two clauses to the Charter Act of that year, for sending out school masters to India, this encountered the greatest opposition in the Court of Proprietors, and it was found necessary to withdraw the clauses. That proposal gave rise to a very memorable debate, in which, for the first time, the views of the Court of Directors upon the subject of education after we had obtained possession of the country, were developed. On that occasion, one of the Directors stated that we had just lost America from our folly, in having allowed the establishment of Schools and Colleges, and that it would not do for us to repeat the same folly in regard to India.' ১

কোম্পানী তার নির্বুদ্ধিতার পুনরাবৃত্তি করতে চাইল না, তাই এদেশে ইংরাজী-শিক্ষার আশা হল সুদূরপরাহত। এদিকে এদেশীয় জ্ঞানবিদ্যাচর্চাও ক্ষীণ হয়ে এল। নবাবী আমলে সরকার, জমিদার অথবা ধনীব্যক্তির প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতাতেই বিদ্যাচর্চার উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু কোম্পানীর আমলে যথাযথ

১। History of Education in India under the Rule of the East India Company—by B. D. Basu.

উৎসাহের অভাব তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। লর্ড মিণ্টো তাঁর ১৮১১ সালের ৬ই মার্চ তারিখের 'মিনিটে' এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বেনারসে সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ও হিন্দুশাস্ত্র আলোচনার অপর দুটি প্রসিদ্ধ স্থান নদীয়া ও ত্রিহুতে এই ধরণের আরও দুটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। ১৮১৩ সালে কোম্পানীর চার্টার রিনিউ করা হল। সেই সময় কোম্পানী শিক্ষা-খাতে বার্ষিক এক লাখ টাকা মঞ্জুর করল। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রসঙ্গ সেখানে সম্পূর্ণরূপে রইল অনুচ্চারিত।

এদেশে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন হয়। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির এজেণ্ট রেভারেণ্ড মিঃ মে চুঁচুড়ায় তাঁর নিজের বাড়ীতে ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'এতদ্দেশীয় ইংরাজী-স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়।' প্রথম দিন ছাত্র সংখ্যা হল ১৬ জন। কিন্তু দ্বিতীয় মাসে ছাত্র সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জায়গার অভাব হল। অবশেষে হুগলীর কমিশনার মিষ্টার ফর্বস (Forbes) তাঁকে ওলন্দাজদের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লার একটি বড় ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। ১৮১৫ সালের জানুয়ারী মাসে মিঃ মে সহর থেকে একটু দূরে গ্রামের মধ্যে এরই একটি শাখা গড়লেন। এই বৎসরের মধ্যে এই ধরণের আরও কয়েকটি শাখা স্থাপন করতে হল। এই সমস্ত স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করতে লাগল। কমিশনার স্কুলগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে প্রীত হলেন। তাঁরই চেষ্টায় মিঃ মের প্রচেষ্টা গভর্নমেণ্টের নজরে এল এবং মাসিক ৬০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হল। ফলে দেশে আলোড়ন জাগল। ইংরাজী শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠায় অনেকেই উৎসাহিত হলেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর তাঁর পাঠশালাকে ইংরাজী স্কুলে পরিণত করলেন। আরও একজন জমিদার তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। শ্রীরামপুরে মিশনারীরা এই কার্যে ব্রতী হলেন। কোলকাতায় প্রথম স্কুল স্থাপন করলেন ফিরিঙ্গি শোরবোর্ণ। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন শোরবোর্ণ সাহেবের স্কুলের ছাত্র। 'পরে আরটুন পিক্রস নামে আর একজন সাহেব আর একটি স্কুল স্থাপন করেন।'[১]

১। হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত—রাজনারায়ণ বসু

রামমোহন যখন কোলকাতায় বসবাস শুরু করলেন তখন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পর্ব চলছে। তিনি এই প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন এবং এদেশীয় যুবকদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে কর্মে ব্রতী হলেন।

আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন তাঁর বাড়ীতে এক সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় তিনি পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার উচ্ছেদ করে দেশবাসীর নৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মচর্চা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং তার জন্য আত্মীয় সভা নামে একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। ঐ সভায় হেয়ার সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আত্মীয় সভার পরিবর্তে একটি কলেজ স্থাপনের উপর জোর দেন। তাঁর মত হল, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হলে এদেশের যুবকরা অচিরেই কুসংস্কারমুক্ত হয়ে উঠবে। রামমোহন আনন্দের সঙ্গে হেয়ার সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হবে না চিন্তা করে তিনি এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীগণ আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা হতে বিরত হলেন না। একদিকে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হল, অন্যদিকে রামমোহন হেয়ার সাহেবের প্রস্তাবটিও কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হলেন। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক রামমোহনের বন্ধু ছিলেন এবং ইউরোপীয়ান সমাজেও তাঁর যাতায়াত ছিল। বিশেষতঃ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এডোয়ার্ড হাইড ঈষ্টের সঙ্গে তাঁর ছিল যথেষ্ট পরিচয়। তিনি হাইড ঈষ্টের কাছে কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। কলেজ স্থাপনে হাইড ঈষ্ট সম্মত হলেন; কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে দেশীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের মতামত জানার জন্য তিনি বৈদ্যনাথকে উপদেশ দিলেন। বৈদ্যনাথ একে একে অনেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে প্রভূত উৎসাহ পেলেন। অবশেষে ১৮১৬ সালে ১৪ই মে তারিখে হাইড ঈষ্টের বাড়ীতে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সভা আহ্বান করা হল। ১৮ই মে তারিখে বন্ধু মিঃ জে হ্যারিংটনকে লেখা চিঠিতে হাইড ঈষ্ট এই সভার বিবরণ দিয়েছেন। সভায় ৫০ জনেরও বেশী ব্যক্তি উপস্থিত হন। তাঁদের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত ধনী ও বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু রক্ষণশীল

সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে রামমোহনের সাহায্য গ্রহণে আপত্তি ওঠে। তাঁরা স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে রামমোহনের সাহায্য গৃহীত হলে তাঁরা সরে দাঁড়াবেন। রামমোহন প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেন। সেইজন্য তাঁরা রামমোহনের সঙ্গে কোন যোগ রাখতে রাজী নন। হাইড ঈষ্ট এই প্রস্তাবে একটু বিপদে পড়লেন। রামমোহন ছিলেন উদ্যোক্তাদের একজন, সুতরাং তাঁকে কমিটি হতে বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। অথচ বাদ না দিলে হিন্দুদের এক বিরাট অংশের সাহায্য ও সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হতে হবে ; ফলে কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল পরিকল্পনাই বানচাল হওয়ার সম্ভাবনা। এই সময় ডেভিড হেয়ার সমস্ত পরিস্থিতিটি উল্লেখ করে কলেজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার জন্য রামমোহনকে অনুরোধ জানালেন। রামমোহন তৎক্ষণাৎ সানন্দে সেই প্রস্তাবে রাজী হলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোক—এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য ; সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই এককথায় তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন। এ সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, There was no difficulty in getting Rammohun Roy to renounce his connection, as he valued the education of his countrymen more than the empty flourish of his name as a committee-man.'[১] নিজের নামের প্রচার নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারই চেয়েছিলেন রামমোহন।

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হল ১৮১৭ সালে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন হয়েও এখানে তাঁর নাম রইল না বলে রামমোহন দুঃখিত হলেন না। বরং হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি উৎসাহিত হলেন ; নূতন করে প্রেরণা পেলেন পাশ্চাত্যশিক্ষা বিস্তারে। তারই ফলে কয়েক বৎসর পরে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় গড়ে তুললেন একটি ইংরাজী স্কুল। ১৮২২ সালে স্থাপিত এই স্কুলটির নাম 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল।' এর প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার রামমোহন নিজেই বহন করতেন। অবশ্য তাঁর স্বদেশী ও বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন কিছু কিছু সাহায্য দিতেন। এ্যাডাম সাহেব ছিলেন স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক। ষাট থেকে আশী জন বালক এখানে শিক্ষা গ্রহণ করত। স্কুলে চারটি শ্রেণী ছিল। প্রথম অর্থাৎ সর্বোচ্চ শ্রেণীতে First Book

১। David Hare—by Peary Chand Mitra.

of Pope's Homer's Odyssey, Goldsmith's History of England, Joyce's Scientific Dialogues on Mechanics and Astronomy, First Book of Euclid's Elements, Murray's English Grammar, Goldsmith's Geography এবং বাংলা অনুবাদের জন্য Voltaire's History of Charles XII of Sweden পুস্তকগুলি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ ও বন্ধু দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রদের বাৎসরিক পরীক্ষা নেওয়া হত কখনও বা হরকরা অফিসে, কখনও বা টাউন হলে। ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী দেশী ও বিদেশী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সময় উপস্থিত থাকতেন। পরীক্ষার পর ছাত্রদের দামী ও প্রয়োজনীয় পুরস্কার দেওয়া হত। এই সমস্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা করতেন রামমোহনের বন্ধু—ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির সভ্যবৃন্দ।

রামমোহনের এই স্কুল প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকারী নীতি নির্ধারণে গোলমাল দেখা দিল। গভর্নমেণ্ট বেনারসের সংস্কৃত কলেজের ন্যায় আরও দুটি কলেজ নদীয়ায় ও ত্রিহুতে স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য তা হয়ে ওঠেনি। পরে ১৮২১ সালে ঐ পরিকল্পনার পরিবর্তে কোলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কোম্পানী এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করেছিল তা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নির্ধারিত হল। রামমোহন ক্ষুব্ধ হলেন। দেশের সর্বস্তরে যখন ইংরাজী শিক্ষার চাহিদা বেড়ে চলেছে, যখন ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলগুলি জনসাধারণের উৎসাহ আর আগ্রহে উত্তরোত্তর সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে, তখন শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এই বিপুল অর্থব্যয় অপচয়েরই নামান্তর। দেশের প্রকৃত উন্নতি যদি গভর্নমেণ্টের লক্ষ্য হয় তাহলে ইংরাজীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। রামমোহন তাই সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে ১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি সরকারী নীতির সমালোচনা করে বলেন যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে তা এদেশে বহুদিন হতেই প্রচলিত আছে। তাছাড়া সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে তা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করার জন্য প্রায় জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। গভর্নমেণ্টের যদি ধারণা হয়

যে এদেশের অনেক অমূল্য সম্পদের সন্ধান এই ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকার জন্য এই ভাষা জানা প্রয়োজন, তাহলেও নূতন করে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার প্রয়োজন নেই। এদেশে বহু পণ্ডিত এই ভাষা শিক্ষকতায় ব্যপৃত আছেন, এঁদেরই উৎসাহ ও সাহায্য দিলে গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষাখাতে যে বিপুল অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে তার সমস্তটাই সংস্কৃতশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। গভর্নমেণ্ট যদি এদেশের জনসাধারণকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ রাখতে চায় তাহলে অবশ্য এই ব্যবস্থাই উপযুক্ত; কিন্তু তা যখন নয়, তখন ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়াই বিধেয়। রামমোহন লিখেছেন, 'But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy, with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus.' এদেশীয় যুবকদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য রামমোহন এখানে একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছেন। সেখানে শিক্ষাদানপ্রণালী হবে উদার ও সংস্কৃতিসম্পন্ন; পাঠ্যতালিকায় থাকবে গণিত, প্রকৃতিবিদ্যা, রসায়ণ, শরীরবিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়; শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকবেন ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় প্রতিভাবান্ ও বিদ্বান্ মহোদয় এবং শিক্ষায়তনে থাকবে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও যন্ত্রপাতি।

গভর্নর জেনারেলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রামমোহন এই পত্রখানি বিশপ হেবরের হাতে দিয়েছিলেন। হেবরের মত হল, এই পত্রটি 'for its good English, good sense; and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic.' কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার পক্ষ হতে সেদিন এর সমর্থন আসেনি।

পার্শীয়ান অফিস হতে গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী ১৮২৪ সালের ২রা জানুয়ারী রামমোহনের পত্রের একটি কপি মন্তব্যসহ জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকসনে পাঠিয়ে দিলেন। গভর্নমেণ্টের মন্তব্য হল, প্রথমতঃ প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজে যে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে রামমোহনের ধারণা স্পষ্ট নয়। বেনারসের সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকসন গঠিত হয়। ঐ কমিটির একজন সদস্য Holt Mackenzie-কে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার উপর একটি রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ রিপোর্টে বলা হয় যে এদেশে নূতন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে সেখানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সুযোগ রাখা উচিত। এই প্রস্তাব গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সুতরাং নূতন যে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হবে তার শিক্ষা-ব্যবস্থায় এইটুকু সংস্কার সাধিত হবে, যদিও মুখ্য উদ্দেশ্য নিবদ্ধ থাকবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার উপর। দ্বিতীয়তঃ রামমোহন সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনের বিপক্ষে যা লিখেছেন তার সমস্তটাই হল অতিরঞ্জিত। তৃতীয়তঃ পার্লামেণ্ট এদেশীয় শিক্ষা বিস্তারকল্পে অর্থ মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু রামমোহনের আবেদনে এ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নি। সুতরাং গভর্নমেণ্ট এ আবেদন বিবেচনা করতে অনিচ্ছুক। কমিটিও ১৮২৪ সালের ১৪ জানুয়ারী তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে গভর্নমেণ্টের মনোভাবের সমর্থন জানাল। কমিটি আরও বলল যে আবেদনে বলা হয়েছে যে সমগ্র দেশের পক্ষ হতে এই আবেদন করা হয়েছিল, কিন্তু আবেদনে একটিমাত্র ব্যক্তিরই স্বাক্ষর ছিল; এবং দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁর মতের বিরুদ্ধে। তাই তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হতে পারে না।

কমিটি রামমোহনের আবেদন গ্রাহ্য করল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রামমোহনের কথার প্রতিধ্বনি করে বসলেন। ১৮২৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে তাঁরা একথা জানালেন। সেই সঙ্গে লিখলেন, 'The great end should not have been to teach Hindoo learning, but useful learning'. আর এই 'useful learning'-এর প্রসঙ্গে তাঁর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উল্লেখ করলেন। গভর্নর জেনারেল এই পত্রটি কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কমিটি রামমোহনের

আবেদন সহজেই উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হল না। তাই উপযুক্ত কারণ অবতারণা করতে হল। আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য কমিটি জানাল, যদিও সাধারণভাবে মনে হয় যে এদেশের অধিবাসীদের জন্য উন্নততর শিক্ষার প্রবর্তন হওয়া উচিত, তবুও যাঁরা এ দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এ দেশের অধিবাসীদের ধারণা ভাল নয়। জীবিকা অর্জনের জন্য ইংরাজী শিক্ষার কিছু চাহিদা আছে বটে, কিন্তু এ দেশের পণ্ডিত ও মৌলভীরা প্রাচ্য শিক্ষায় সন্তুষ্ট ; জনমত পাশ্চাত্য শিক্ষার বিপক্ষে। অবশ্য যদিও শিক্ষাক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে এদেশের অধিবাসীদের সংস্কার অনেকখানি কমেছে, তবুও হঠাৎ নূতন প্রচেষ্টা শুরু করলে তা পুনরায় বাড়তে পারে এবং ফলে গভর্নমেণ্টের উপর তাদের আস্থা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হল : 'we must for the present go with the tide of popular prejudice, and we have the less regret in doing so, as we trust we have said sufficient to show that the course is by no means unprofitable.'

কমিটি সেদিন রামমোহনের আবেদন অগ্রাহ্য করলেও আবেদনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল না। এরই ফলে ইংলিশ পার্টির উদ্ভব হল। তাঁরা ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য চাপ দিতে লাগলেন। বিষয়টি চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠান হল। গভর্নর জেনারেল তখন উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আর মেকলে তাঁর আইন-সদস্য। মেকলে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে রায় দিলেন। সময়টা হল ১৮৩৫ সাল ; রামমোহন তখন আর বেঁচে নেই। রামমোহন না থাকলেও তাঁর আবেদন ছিল, তাঁর যুক্তি ছিল, তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল। তাই ইংরাজী শিক্ষার সমর্থনে মেকলের উপর রামমোহনের গভীর প্রভাব অনস্বীকার্য।

॥ আট ॥

মিশনারীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে রামমোহন যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে ত্রীশ্বরাত্মক খৃষ্টীয় মতের যে অসঙ্গতি তুলে ধরেছিলেন তা বিশ্বাস করে পাদ্রী উইলিয়াম এ্যাডাম নিজেকে ইউনিটেরিয়ান বলে ঘোষণা করলেন। শুধুমাত্র এ্যাডাম নন, কোলকাতার আরও কিছু সংখ্যক খৃষ্টান ভদ্রলোক এ বিষয়ে রামমোহনকে সমর্থন জানালেন। এরই ফলে ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হল। এর সভ্যদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার Theodore Dickens, ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানীর বণিক George James Gordon, এটর্নী William Tate, কোম্পানীর কর্মচারী Norman Kerr এবং William Adam ; এছাড়া এদেশীয়দের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন ও তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদের প্রচার। কিন্তু তার পূর্বে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উপরে সোসাইটি জোর দিয়েছিল। তাই সাধারণ মানুষের নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি সাধনই সেখানে সর্বপ্রথম বিবেচ্য ছিল।

সোসাইটির কাজের জন্য একটি ঘর ভাড়া করা হয়। এ্যাডাম হলেন সেক্রেটারী। আর্থিক সাহায্যের অধিকাংশই এল রামমোহনের কাছ হতে। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থে তিনি তৈরী করলেন ইউনিটেরিয়ান প্রেস ; অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ব্যয়ভারও বহন করলেন তিনি নিজে। সোসাইটির কাজ এগিয়ে চলল। সভ্যসংখ্যা অল্প হলেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই এই সোসাইটি ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইউনিটেরিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই সূত্রে রামমোহন তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। সোসাইটির কাজে রামমোহনের উৎসাহের পরিচয় পেয়ে তাঁরা আনন্দিত হলেন এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বেড়ে চলল। আমেরিকায় কেম্ব্রিজের হারভার্ট কলেজের ইউনিটেরিয়ান আচার্য (minister) রেভারেণ্ড হেনরী ওএর (Ware) ১৮২৩ সালে রামমোহনকে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের ভবিষ্যৎ ও উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল এই পত্রে।

রামমোহন এই সময় একাধারে মিশনারী ও রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে তর্কবিতর্কে ব্যস্ত থাকার জন্য উত্তর দেন ১৮২৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে। এই উত্তরে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, 'I presume to think that christianity, if properly inculcated, has a greater tendency to improve the moral, social and political state of mankind than any other known religious system.' এখানে লক্ষণীয় যে রামমোহন 'if properly inculcated'-এর উপর জোর দিয়েছেন। কারণ এদেশে মিশনারীদের প্রচারের মধ্যে অনেক কুসংস্কার যুক্ত হয়েছিল। তাই যে সমস্ত আমেরিকান ইউনিটেরিয়ানগণ খৃষ্টধর্মকে সংস্কারমুক্ত করায় ব্রতী হয়েছিলেন রামমোহন তাঁদের কার্যের প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ানদের কথা উল্লেখ করেন এবং চার্চের ক্ষমতা ও অর্থের প্রতিকূলে তাঁদের দুরূহ প্রচেষ্টাকে সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত এদেশীয়দের সম্বন্ধে বলেন যে এদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য এবং নিম্নশ্রেণীর মুষ্টিমেয় যে কজন আছে তারা অশিক্ষিত ও প্রলোভিত। এদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ত্রিত্ববাদ প্রচার করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্ম তারা গ্রহণ করতে পারে, অন্ততঃ এর প্রচারে উৎসাহ যে দেবে সে বিষয়ে নিশ্চিত। তাই এখানে ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে হলে প্রথমে এদেশীয় লোকের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। তাই রামমোহনের পরামর্শ হল, 'to send to Bengal as many serious and able teachers of European learning and science and christian moraliy unmingled with religious doctrines, as your circumstances may admit, to spread knowledge gratuitously among the native community.' এখানে স্মরণীয় যে এই সময় সরকারী শিক্ষানীতিতে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তারই প্রতিবাদে রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টের কাছে আবেদন করেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে সরকারী সাহায্য যখন আশার অতীত হয়ে উঠল রামমোহন তখন এই সব বিদেশী ইউনিটেরিয়ানদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তিনি গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হেনরী ওএরকে জানালেন, I may be fully justified in saying that two-thirds of the native population of Bengal would be exceedingly glad

to see their children educated in English learning···To the Best of my knowledge, no benefit has hitherto arisen from the translation of the Scriptures in the languages of the East, nor can any advantage to be expected from the translations in circulation.'

বিদেশী ইউনিটেরিয়ানদের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি হওয়ায় সোসাইটির কার্যে উৎসাহ দেখা দিল। কমিটি শীঘ্রমধ্যে কোলকাতায় একটি ইউনিটেরিয়ান মিশন স্থাপনের জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। উপাসনাগৃহ ও একটি স্কুল স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গা কেনার আয়োজন চলল। সদস্যরা নিজেদের চাঁদায় কিছু ভাল ভাল পুস্তক কিনলেন এবং সেই সঙ্গে দান হিসাবে পাওয়া কিছু পুস্তক যোগ করে তাঁরা একটি লাইব্রেরী গড়ে তুললেন।

এর কিছু পরে রামমোহনের পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। পুত্র রাধাপ্রসাদ ও ভাগিনেয় গুরুদাসের বিরুদ্ধে বর্ধমানের মহারাজা যে মামলা শুরু করেন তার ফলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন। তাই কিছুদিন যাবৎ অন্যান্য কার্যে অংশগ্রহণ করার মত তাঁর মানসিক অবস্থা ছিল না। ১৮২৬ সালে ঐ মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেল। রামমোহন স্বস্তি পেলেন। এরপর আবার নূতন উদ্যমে কার্যে মনোনিবেশ করলেন। এই সময় একদিকে তিনি গায়ত্রীমন্ত্রের ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ করলেন, অন্যদিকে এ্যাডাম সাহেবের সহযোগিতায় ইংরাজী sermons on mount-এর বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন। এই বৎসরের প্রথম দিকে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান কমিটি হতে প্রাপ্ত 'One hundred arguments for the Unitarian Faith' নামে একটি পুস্তিকার প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং এর বহুল প্রচারের জন্য নিজের ইউনিটেরিয়ান প্রেস হতে এর একটি সংস্করণ মুদ্রিত করে কোলকাতায় বিতরণ করেন। এই বৎসরের শেষের দিকে আর একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির নাম, 'Answer of a Hindu to the Question—why do you frequent a Unitarian place of worship instead of the numerously attended established Churches?' এটির রচয়িতা হিসাবে চন্দ্রশেখর

দেবের নাম মুদ্রিত হয়েছিল; কিন্তু এটি যথার্থই রামমোহনের রচনা। ডাঃ টুকারম্যানকে লেখা ১৮২৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখের চিঠিতে মিঃ এ্যাডাম একথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর দেবের স্বীকারোক্তিও আছে। রামমোহনের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'we have the authority of Babu Chundra Shekher Dev himself for this statement.' এই পুস্তিকায় রামমোহন দশটি কারণের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নবম ও দশম কারণ। তিনি লিখেছেন, 'Because Unitarians reject polytheism and idolatry under every sophistical modification, and thereby discountenance all the evil consequences resulting from them. Because Unitarians believe, profess and inculcate the doctrine of the divine unity—a doctrine which I find firmly maintained both by the Christian Scriptures and by our most ancient writings commonly called the veds.'

১৮২৭ সাল থেকে সোসাইটির কাজকর্ম নূতন উদ্যমে চলতে শুরু করল। এরই কিছু পূর্বে এ্যাডাম সাহেবের সংবাদপত্রের (Calcutta Cronicle) প্রকাশ গভর্নমেন্টের আদেশে বন্ধ হয়েছিল। তাই এ্যাডামের হাতে এখন প্রচুর সময়; তিনি প্রচারকের কার্যে নিযুক্ত হলেন। বৃটিশ ইউনিটেরিয়ানগণ এই সমস্ত কার্যের জন্য পনের হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদ মিশনের স্কুল ও উপাসনাগৃহের জন্য অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের পার্শ্বে জায়গা দিতে রাজী হলেন। গৃহনির্মাণের ব্যয়ভার রামমোহন তাঁর বন্ধুবান্ধবের কাছ হতে সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু এই মধ্যবর্তী সময়ের জন্য একটি পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই 'হরকরা' পত্রিকার অফিস ও লাইব্রেরী সংলগ্ন কয়েকটি ঘর উপাসনার জন্য ভাড়া নেওয়া হল। সেখানে ১৮২৭ সালের ৩রা আগস্ট রবিবার সকালে 'বাংলার ইউনিটেরিয়ান মিশনারী' মিঃ এ্যাডাম উপাসনা কার্য আরম্ভ করলেন। উপাসনা শুরু হল বটে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। প্রথম হতেই অতি অল্প সংখ্যক লোক উপাসনায় যোগ

দিলেন। এমনকি সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে অনেকেই হাজির হতেন না। নভেম্বর মাসে উপাসনার সময় সকালের পরিবর্তে সন্ধ্যায় ধার্য করা হল; কিন্তু এতেও বিশেষ সুবিধা হল না। প্রথম প্রথম ষাট থেকে আশী জন সমবেত হতেন; কিন্তু ক্রমে এই সংখ্যা নিদারুণভাবে হ্রাস পেতে লাগল। উপাসনার এই অবস্থা দেখে এ্যাডাম সাহেব প্রস্তাব করলেন যে এদেশীয় লোকদের জন্য বাংলা ভাষায় ধর্মশিক্ষা দেওয়া হোক। কিন্তু কমিটি ইংরাজী, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা অনুমোদন করতে রাজী না হওয়ায় সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। এই সময় অক্টোবর মাসে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে ধর্মের মূলতত্ত্ব বিষয়ে এ্যাডাম সাহেব বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিলেন; কিন্তু তাও শ্রোতার অভাবে বন্ধ হয়ে গেল। অনেক ভেবেচিন্তে এ্যাডাম সাহেব ঠিক করলেন যে এই সোসাইটি যদি ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির পরিবর্তে বৃটিশ ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েসন নাম গ্রহণ করে তাহলে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ানদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হবে এবং ফলে সোসাইটির কার্যেও পুনরায় উৎসাহ সঞ্চার হতে পারে। ১৮২৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের সভায় তিনি এই প্রস্তাবটি পেশ করলেন।

সোসাইটি নূতন নাম নিল; কিন্তু উপাসনায় উপাসকের সংখ্যার উন্নতি হল না। এ্যাডাম সাহেব প্রমাদ গণলেন। উপাসকের অভাবে উপাসনা বন্ধ হওয়ার পূর্বে সময় হতে তিনি উপাসনা উঠিয়ে দেওয়া বিবেচনা করলেন। তাই তিনি ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত মাদ্রাজ যাওয়া মনস্থ করলেন এবং কমিটির কাছে এ প্রস্তাব পেশ করলেন। কমিটি রামমোহনের যুক্তি মেনে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। রামমোহনের যুক্তি হলঃ প্রথমতঃ মাদ্রাজে ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থ সোসাইটির নেই; দ্বিতীয়তঃ কোলকাতায় এ্যাডামের উপস্থিতি আবশ্যক। তাই এ্যাডামের মাদ্রাজ যাওয়া স্থগিত হল। এরপর তিনি কমিটির কাছে প্রচারকের উপযুক্ত কোন কাজ চাইলেন, কারণ তিনি যেন বিদেশ হতে প্রেরিত বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কমিটি এ্যাডামকে ইউনিটেরিয়ান প্রচারকের কোন কাজ না দিতে পারার জন্য তাঁর নিয়মিত বৃত্তিও বন্ধ হয়ে গেল। ফলে ১৮২৮ সালের প্রথম দিকে এ্যাডাম সাহেব সরে দাঁড়ালেন একান্ত ভগ্নহৃদয়ে।

এ্যাডামের দুর্ভাগ্যের কারণ তাঁর হিসাবের ভুল। একদিন যে ভুল করেছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এ তারই পুনরাবৃত্তি। সেদিন রামমোহন যখন খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন তখন মিশনারীদের আশা ছিল ধর্মান্তরিত হতে রামমোহনের বেশী দেরী নেই। সেই চাপা আশা ছড়িয়ে পড়েছিল অনেকের মধ্যে, এমনকি সাগরপারেও। তাই সেই আশাভঙ্গের ব্যথা তাঁদের পেতে হয়েছিল। এবারেও সেই একই ভুল করলেন এ্যাডাম সাহেব। ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্মে রামমোহনের অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন যে ত্রিত্ববাদ থেকে সরে এলেও রামমোহন ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থ এই নয় যে নিজের ধর্মমত পরিত্যাগ করে তা গ্রহণ করা। রামমোহন যদিও বহুক্ষেত্রে একথা উল্লেখ করেছিলেন, তবুও ধর্মপ্রাণ পাদ্রী এ্যাডামের চোখ পড়েনি সেদিকে।

খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে রামমোহন তাঁর ধারণা ১৮২২ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে 'a gentleman of Baltimory'-কে লেখা একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, '... my view of Christianity is that in representing all mankind as the children of one eternal Father, it enjoins them to love one another, without making any distinction of country, caste, colour or creed.' ১৮২৩ সালে প্রকাশিত 'প্রার্থনাপত্রে' রামমোহন তাঁর একেশ্বরবাদী স্বদেশীয়দের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, 'বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থসাধন জানেন তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য হয়। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনকারদের আচার্য্য কহেন ইহাতে পরমার্থবিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপ হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।' 'Answer of a Hindoo to the question—why do you frequent a Unitarian place of worship instead of the numerously attended established Churches' পুস্তিকায় রামমোহন স্পষ্ট লিখেছেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে ইউনিটেরিয়ানদের

মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে বেদোক্ত মত ও বিশ্বাসের যথেষ্ট মিল আছে। এছাড়া ১৮২৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির সভায় রামমোহন যে প্রস্তাব পেশ করেন তা হল: '......this meeting invites all Unitarians, whether Christian or Hindoo, in every part of India, to form themselves into Associations Auxiliary to the British Indian Unitarian Association.'

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে রামমোহন হিন্দু ইউনিটেরিয়ান ও খৃষ্টান ইউনিটেরিয়ানদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন; ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্মে হিন্দুদের দীক্ষিত করার কোন বাসনা তাঁর ছিল না। রামমোহনের চিন্তার এই বৈশিষ্ট্যটুকু হয়ত এ্যাডাম সাহেব লক্ষ্য করেন নি; করলেও সেই ধর্মপ্রাণ পাদ্রী হয়ত আশা করেছিলেন যে সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই মিশনারীদের সঙ্গে রামমোহনের বিবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ১৮২৪ সালের মে মাসে তিনি রেভারেণ্ড উইলিয়ম ইয়েটসকে লিখেছিলেন যে খৃষ্টের ধর্মমত সংকলন করে প্রকাশ করার জন্য রামমোহনকে আক্রমণ করা মিশনারীদের উচিত হয় নি। এর পরিবর্তে ধৈর্য সহকারে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রামমোহনকে তাঁর চিন্তাধারার ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিলে নিশ্চয়ই সুফল পাওয়া যেত। সেই সুফলের আশায় ধৈর্যের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন উইলিয়ম এ্যাডাম। অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের মধ্য দিয়ে তিনি খৃষ্টধর্ম প্রচারের নানা চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু রামমোহনের সতর্কতায় তা সম্ভব হয়নি। তারপর ইউনিটেরিয়ান প্রচারকার্যেএ্যাডামের নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে রামমোহন যখন তাঁর উইলে এ্যাডামের পরিবারের জন্য সাহায্য করলেন, তখন এ্যাডামের অন্তর পুলকিত হয়ে উঠল। এই ঘটনায় তাঁর স্থির বিশ্বাস হল যে রামমোহন অচিরেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু তবুও তাঁর আশাভঙ্গ হল; এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই আশাভঙ্গের পরও আশা করেছিলেন পাদ্রী উইলিয়ম এ্যাডাম।

॥ নয় ॥

ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সোসাইটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একেশ্বরবাদ প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; দেশের জনসাধারণের নৈতিক, মানসিক, শারীরিক এমন কি আর্থিক উন্নতির ব্রতও সেখানে গৃহীত হয়েছিল। আসলে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-চিন্তাই এই সময় রামমোহনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে জনসাধারণকে আগে সজাগ করে তুলতে হবে; নিজেদের দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করার জন্য এবং নিজেদের দীনতা ও কুসংস্কারের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য তাদের চৈতন্য দিতে হবে, আর সেই সঙ্গে দিতে হবে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সত্য ও কল্যাণকে গ্রহণ করার মত শক্তি ও সাহস। তাই জনসাধারণের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য এই সময় রামমোহন আর একটি নূতন কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, তা হল সংবাদপত্র প্রকাশ।

১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর রামমোহন যে সংবাদপত্রটি প্রকাশ করলেন তার নাম 'সংবাদ কৌমুদী'। বৈশিষ্ট্যে এটি ছিল অনন্য। প্রথম সংখ্যাতেই পত্রিকার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে লেখা ছিল। এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনহিত। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য বিষয় নির্বাচন করা হত। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় লোকেদের দ্বারা পরিচালিত ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা হিসাবে সংবাদ কৌমুদীই সর্বপ্রথম। এর শুধু উদ্দেশ্যই জনহিত নয়, উদ্যোক্তরা জানিয়েছিলেন যে পত্রিকাটি সম্পূর্ণই জনগণের। তাঁদের দ্বারা পত্রিকা পরিচালিত বলে মনে হতে পারে যে এটি তাঁদের সম্পত্তি, কিন্তু যথার্থই এটি জনগণের পত্রিকা; কারণ এখানে সব সময়ই তাঁরা জনকল্যাণমূলক যে কোন রচনা প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারবেন এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ এই পত্রিকায় মুদ্রিত করে প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা কবতে পারবেন।

সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে সংবাদ কৌমুদীর আত্মপ্রকাশ ঘটল। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। পরিষ্কার বাংলা টাইপে কলুটোলা সংস্কৃত

প্রেস হতে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হত প্রতি মঙ্গলবার। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল আট। মাসিক চাঁদা দু'টাকা ধার্য করা হয়েছিল। যাঁরা স্বদেশীয় অধিবাসীদের উন্নতির কথা চিন্তা করেন তাঁদের মহানুভবতার কাছে প্রতি মাসে এই দু'টাকা সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান হয়েছিল; পরিবর্তে পত্রিকার উদ্যোক্তরা পত্রিকাটিকে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয়, শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উদ্যোক্তরা যেমন তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, জনগণও তেমনি সাদরে অভিনন্দিত করেছিল সেই মহৎ প্রচেষ্টাকে। ১৮২১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে Calcutta Monthly Journal এ সম্বন্ধে লিখেছে, 'we hear that this Novelty, the Third Weekly Number of which issued on Tuesday last from the Press, has already caused a great sensation, and that the First and Second Numbers… are already nearly out of print.'

সংবাদ কৌমুদীতে বিচিত্র বিষয় স্থান পেত। ধর্ম, নীতি, রাজনীতি, জনস্বার্থের উপযোগী চিঠিপত্র এবং দেশী ও বিদেশী সংবাদ সমস্তই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজও সংবাদ কৌমুদীর একটিও সংখ্যা পাওয়া যায়নি। তাই সেই সমস্ত রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও দু-এক জায়গায় এর কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'কোন পাদ্রী সাহেব বালকদিগের শিক্ষার জন্য 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' নামক একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন; স্কুল বুক সোসাইটির দ্বারা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রকাশিত হয়। উহাতে সংবাদ কৌমুদী হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী-দের জন্য বাঙ্গালা পুস্তকে 'সংবাদ কৌমুদী'র কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল।' ১৮২২ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ক্যালকাটা জার্নালে সংবাদ কৌমুদীর প্রথম হতে নবম সংখ্যার বিষয়তালিকা মুদ্রিত হয়। ঐ সংখ্যায় কৌমুদীর প্রশংসা করে জার্নাল লিখল, 'we doubt not but that it will progressively increase in value, and be productive of much benefit, in introducing a taste for reading and information, which will spread wider and wider every succeeding year, and do as much

towards the improvement of the Native character as any other mode that has yet been attempted of effecting this great end.' এর পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায়ও সংবাদ কৌমুদীর বিষয়তালিকার উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়া ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে জার্নাল সংবাদ কৌমুদীতে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির অনুবাদ প্রকাশ করে। [১]

সংবাদ-কৌমুদীর রচনাগুলি ছিল মূলতঃ জনকল্যাণমূলক। এগুলি মোটামুটি-ভাবে তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ছিল জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের জন্য গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন; দ্বিতীয় ভাগে এ-দেশীয় ধনী সম্প্রদায়কে জনহিতকর কার্যে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস ছিল; তৃতীয় ভাগে ছিল জনসাধারণকে সুস্থ সমাজবোধে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা। নিম্নে এ সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

প্রথম ভাগ—

১। দরিদ্র অথচ ভদ্র হিন্দু সন্তানদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থে গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন।

২। মফস্বল, জেলা ও প্রভিন্সিয়াল কোর্টে জুরি দ্বারা বিচার প্রবর্তনের জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন।

৩। খৃষ্টানদের সমাধির জন্য সুপ্রশস্ত জায়গার বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু একটির অধিক ঘাট না থাকায় হিন্দুসম্প্রদায় শবদাহার্থে প্রতিদিন যে অসুবিধা ভোগ করে তা দূর করার জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন।

৪। চাল এদেশের প্রধান খাদ্য; তাই বাংলা হতে বিদেশে চাল রপ্তানী বন্ধ করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন।

১। সংবাদ-কৌমুদীর উদ্দেশ্য, বিষয়তালিকা প্রভৃতির জন্য যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত 'Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৫। এদেশীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও শিশুরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে দারুণ কষ্টে দিন অতিবাহিত করে। তারা দেশীয় হাসপাতালে উপযুক্তভাবে আরোগ্যলাভ করতে পারেনা, এবং অর্থের অভাবে ইউরোপীয় চিকিৎসকদের কাছেও যেতে পারে না। তাই তারা যাতে ইউরোপীয় চিকিৎসকদের চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন।

দ্বিতীয় ভাগ—

১। স্বামীর মৃত্যুর পর এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা যে অসহায় অবস্থায় পতিত হয় সেই দুরবস্থা দূর করার জন্য Civil and Military widow's Fund-এর অনুরূপ একটি তহবিল গঠন করার জন্য এদেশীয় ধনীসম্প্রদায়ের নিকট অনুরোধ।

২। অন্ন ও বস্ত্রের অভাবের জন্য দরিদ্র জনসাধারণের দুরবস্থার প্রতি ধনী-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ।

৩। লালবাজার হতে বাগবাজার পর্যন্ত চিৎপুর রোডে জল দেওয়ার প্রয়োজনে চাঁদা তুলে একটি তহবিল গঠনের জন্য ধনীসম্প্রদায়ের নিকট আবেদন।

৪। দরিদ্র হিন্দুদের মধ্যে অনেকে শবদাহের খরচ বহন করতে না পারার জন্য মৃতদেহ গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করে এবং এর ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই শবদাহের নিমিত্ত অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনে চাঁদা তুলে একটি তহবিল গঠনের জন্য ধনীসম্প্রদায়ের নিকট আবেদন।

তৃতীয় ভাগ—

১। এদেশীয় চিকিৎসকগণ যদি তাঁদের সন্তানদের ইউরোপীয় চিকিৎসকদের অধীনে শিক্ষানবীস রাখেন তাহলে তারা ইউরোপীয় প্রথায় রোগমুক্তির কৌশল আয়ত্ব করে কৃতিত্বের সঙ্গে জনসাধারণের চিকিৎসা করতে সক্ষম হবে।

২। কুলীন ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক তাঁদের কন্যাদের বিবাহে অবহেলা প্রদর্শন।

৩। কতিপয় যুবক কর্তৃক অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ নাটকের অভিনয় বন্ধ করার জন্য আবেদন।

৪। সন্তানদের বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে মাতৃভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া দরকার, এই ব্যাকরণের জ্ঞানের অভাবেই তারা বিদেশী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ব করতে অসমর্থ হয়।

সংবাদ-কৌমুদীর শিরোদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি মুদ্রিত ছিল :—

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিণা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥

নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'কোন প্রাচীন ব্যক্তির নিকট আমরা উক্ত শ্লোকটি প্রাপ্ত হইয়াছি।' সংবাদ কৌমুদীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে রামমোহনই ছিলেন অন্যতম; কিন্তু তিনি সম্পাদক ছিলেন না। সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ভবানীচরণ বেশীদিন থাকেন নি; মাত্র তিনসংখ্যা প্রকাশের পর তিনি এ পদে ইস্তফা দেন। পরে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ও তার সম্পাদক হন। চন্দ্রিকার ও চন্দ্রিকা-সম্পাদকের সে-সময় দেশে খুব জনপ্রিয়তা ছিল। 'কলিকাতা কমলালয়,' 'নববাবুবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে ভবানীচরণ বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের প্রচেষ্টার সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার ফলে ভবানীচরণ সংবাদ কৌমুদী পরিত্যাগ করেন। সমাচার চন্দ্রিকা রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ের সমর্থক হওয়ায় তা সংবাদ কৌমুদীর প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। সতীদাহ-প্রথাকে কেন্দ্র করে রামমোহনের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ের বিবাদ-বিতর্ক এই দুটি পত্রিকার মধ্যে প্রকাশ পায়। ভবানীচরণের পর সংবাদ কৌমুদীর সম্পাদক হন হরিহর দত্ত। এঁর সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইনি হিন্দুকলেজের সর্ব্বপ্রথম ছাত্রগণের মধ্যে একজন। ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী।*** ইহার পিতার নাম তারাচাঁদ দত্ত। এই তারাচাঁদ দত্তের বাটী, কলিকাতা কলুটোলা, চিৎপুর রোড ফৌজদারি বালাখানার উত্তর গলিতে। ঐ গলির নাম, Tarachand Dutt's Lane।' তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে সতীদাহ-নিবারণ প্রকাশ্যে সমর্থন করার জন্য হরিহর

পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন ও পরে রামমোহনের আশ্রয় লাভ করেন। হরিহরের পর সংবাদকৌমুদীর সম্পাদক হন গোবিন্দ চন্দ্র কোঁঙার। পরে রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদ এর সম্পাদক হন।

সংবাদকৌমুদী প্রকাশিত হয়েছিল এদেশের সাধারণ লোকেদের জন্য। তাই বাংলা ভাষাতে এটি মুদ্রিত হত। কিন্তু ভারতের অন্যান্য জায়গার বহু সম্ভ্রান্ত লোক তখন এখানে বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা অথবা ইংরাজী ভাষা জানতেন না। তাই তাঁদের জন্য রামমোহন আর একটি সংবাদ-পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' নামে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হল। ফারসী ভাষায় মুদ্রিত হয়ে এটি প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হত। প্রথম সংখ্যায় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে এই পত্রিকায় যে-সমস্ত রচনা স্থান পাবে তা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করবে এবং সামাজিক উন্নতির সহায়ক হবে। তাছাড়া এই পত্রিকা মারফৎ এদেশীয় প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা শাসকদের সামনে তুলে ধরা হবে এবং অপর পক্ষে শাসকদের আইন-কানুনও প্রজাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। এর দ্বারা একদিকে শাসকগণ যেমন প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করতে পারবেন, অন্যদিকে প্রজারাও পাবেন শাসকদের কাছ হতে সাহায্য পাওয়ার পথনির্দেশ।

এই সময় এদেশে ইংরাজী ও বাংলাভাষায় অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হলেও ফারসীভাষায় কোন পত্রিকা ছিল না। তাই 'মীরাৎ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ১৮২২ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে ক্যালকাটা জার্নাল এ সম্বন্ধে লিখল, 'of all the papers who have yet appeared,. in the native languages, none has created a more favourable impression on our mind than the MIRAT—OOL—UKHBAR.' মীরাৎ সর্বভারতীয় শিক্ষিত পাঠকদের মধ্যে শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। শুধু ভারতে নয়, দূর পারস্যেও এর যথেষ্ট সমাদর ছিল। এর প্রধান কারণ, শিক্ষিতমনের উপযোগী সংবাদ পরিবেশনে এর কৃতিত্ব। ক্যালকাটা জার্নালের কয়েকটি সংখ্যায় উদ্ধৃত এর বিষয়তালিকা

হতে জানা যায় যে জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সমস্ত সংবাদই এখানে স্থান পেত। [1] এদের মধ্যে কয়েকটি হল,—

১। চীনের সহিত বিরোধ।

২। রণজিত সিং-এর বীরোচিত কার্য।

৩। সুরাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বিবরণ।

৪। আয়ারল্যাণ্ডের দক্ষিণে বর্বরোচিত কার্য

৫। তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ।

৬। বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গ।

১। যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

॥ দশ ॥

রামমোহন যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরি করতেন, সেই সময়কার কথা স্মরণ করে জন ডিগবী লিখেছিলেন, 'He was also in the constant habit of reading English newspapers of which the continental politics chiefly interested him…'. অর্থাৎ ইংরাজী ভাষা শুদ্ধভাবে পড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন ইংরাজী সংবাদপত্র পড়তে শুরু করেন। এই সমস্ত সংবাদপত্রে মুদ্রিত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী করে যা তাঁকে আকর্ষণ করত তা হল বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিচয়। এই পরিচয় সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটি রাষ্ট্রীয় চেতনা গড়ে ওঠে। সেই চেতনা তাঁকে অন্তরে অন্তরে স্বাধীনতাপ্রিয় করে তোলে। কুসংস্কার ও অশিক্ষায় আচ্ছন্ন একটি পরাধীন দেশের মানুষ হিসাবে সেই স্বাধীনচেতনার সরাসরি বহিঃপ্রকাশ সেদিন সম্ভব ছিল না। তাই অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষা সুতীব্র মানবতাবোধে রূপান্তরিত হয়ে দেশের ক্ষেত্রে তাঁকে সর্বাঙ্গীণ সংস্কারের ব্রতে নিয়োজিত করেছিল। কিন্তু এরই মাঝে মাঝে, বিশেষ করে অন্য দেশের প্রসঙ্গে তাঁর স্বাধীনতাপ্রিয় অন্তর উল্লসিত হয়ে উঠত। সত্য ও ন্যায়ের জয়সংবাদে তিনি যেমন আনন্দে অধীর হয়ে পড়তেন, বিপরীত সংবাদও তেমনি তাঁকে দুঃখ দিত গভীরভাবে। ১৮২২ সালে স্পেনের অত্যাচার থেকে দক্ষিণ আমেরিকার কলোনীগুলির মুক্তি সংবাদ যেদিন ভারতে এসে পৌঁছল রামমোহন সেদিন সেই স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ী আলো দিয়ে সাজিয়ে সেখানে প্রায় ষাট জন ইউরোপীয়ানকে একটি ভোজসভায় আপ্যায়িত করে তিনি উৎসব পালন করেন। Edinburgh Magazine and Literary Miscellany-এর ১৮২৩ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই ভোজ সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে রামমোহনের সহানুভূতি ছিল উদার-নৈতিক দলের প্রতি। সম্প্রতি বিখ্যাত স্পেনীয় শাসনতন্ত্রের একটি কপি পাওয়া গেছে এবং সেটি অতীব উদার, মহৎ, জ্ঞানী, ধার্মিক ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়কে উৎসর্গ করা ছিল। আবার ১৮২১ সালে যখন অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদল নেপলসের স্বাধীনতাকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিল তখন রামমোহন সেই সংবাদে মর্মাহত হন। ১১ই আগষ্ট তারিখে প্রাপ্ত সেই সংবাদ তাঁকে এতখানি বিষাদগ্রস্ত করেছিল যে মিঃ

বাকিংহামের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাৎকারে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। অক্ষমতার কথা জানিয়ে তিনি বাকিংহামকে যে চিঠি লেখেন সেখানে তাঁর মনোবেদনার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, 'From the late unhappy news, I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe and Asiatic nations, especially those that are European Colonies possessed of a greater degreeof the same blessing than what they now enjoy. Under these circumstances I consider the cause of the Napolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful' সেদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রামমোহন উচ্চারণ করেছিলেন যে নেপলস্‌বাসীদের দুঃখ তাঁরও দুঃখ, তাঁদের শত্রু তাঁরও শত্রু। স্বাধীনতার শত্রু আর স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্ররা শেষপর্যন্ত কোনদিন জয়ী হয়নি, হবেও না। শুধু নেপলসের ক্ষেত্রে নয়, রামমোহনের এই সহানুভূতি সর্বত্র পরিব্যপ্ত ছিল। তাই আয়ারল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষের সংবাদ এখানে এলে তিনি ১৮২২ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে 'মীরাৎ'-এ এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে আয়ারল্যাণ্ডের ভৌগলিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিবরণ দিয়ে তিনি এই দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখালেন এবং সেই সঙ্গে দুর্দশাগ্রস্ত আয়ারল্যাণ্ডবাসীদের জন্য কোলকাতার সম্ভ্রান্ত দেশী ও বিদেশী অধিবাসীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং সাহায্য সংগ্রহে সমর্থ হলেন। এ সম্বন্ধে মিস্ কলেট তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'Irishmen who are proud of their nationality will not readily forget this tribute of appreciation and succour from one of the earliest pioneers of the National movement in India.'

রামমোহন চেয়েছিলেন দেশের জনসাধারণ যেন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। তারা যেন নিজেদের অধিকার, নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে। স্বজাতিপ্রীতি ও আত্মসচেতনতা তাদের মধ্যে যেন গড়ে উঠে। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি জেনে-

ছিলেন। তাই এদেশে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের জন্য তিনি সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করলেন। 'সংবাদ-কৌমুদী' ও 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার'-এর প্রথম সংখ্যায় এই উদ্দেশ্যের উল্লেখ ছিল। রামমোহনের এই প্রচেষ্টার যথেষ্ট সহায়ক ছিল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই গভর্নমেণ্ট সেই স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করে দিল।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের অকুণ্ঠ স্বাধীনতা ছিল। এই সময় ১৭৮১ সালে প্রথম ইংরাজী পত্রিকা 'হিকির গেজেট' প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকায় কোম্পানীর কর্মচারীদের আচরণ ও চরিত্র সম্বন্ধে নানা আক্রমণাত্মক সংবাদ স্থান পেত। তারপর লর্ড কর্ণওয়ালিশ এবং স্যার জন শোরের আমলে এই আক্রমণের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তার পরিবর্তে জনসাধারণের প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলীর সময়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই সময় ভারতে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ তুমুল আকার ধারণ করে। তাই পাছে এ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ দেশে কোন বিরুদ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করে সেই আশঙ্কায় ওয়েলেসলী মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। লর্ড মিণ্টোর সময়ে অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। এর পর লর্ড ময়রা এসে অবস্থার পরিবর্তন করেন। তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী। তাঁর মত হল, গভর্নমেণ্টের সমালোচনা গভর্নমেণ্টের পক্ষেই মঙ্গল। তাই তিনি ১৮১৮ সালে মুদ্রাযন্ত্রের উপর থেকে সমস্ত বিধি-নিষেধ উঠিয়ে দিলেন। মুদ্রাযন্ত্র আবার পূর্ণ স্বাধীনতা পেল। ১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হল। এই পত্রিকার উদ্যোক্তাদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন একজন। তিনি রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আত্মীয়সভার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাই মনে হয় এই পত্রিকার সঙ্গে রামমোহনের একটা পরোক্ষ যোগ ছিল। এরপর শ্রীরামপুর মিশনারীদের 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে একটি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তার নাম 'ক্যালকাটা জার্নাল'। এর সম্পাদক ছিলেন মিঃ জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম। বাকিংহাম একজন নির্ভীক সাংবাদিক ছিলেন। তাই একদিকে যেমন গভর্নমেণ্টের দোষত্রুটি তাঁর সমালোচনা হতে অব্যহতি পেত না, অন্যদিকে তেমনি এদেশীয় উন্নতি-প্রচেষ্টাকে তিনি অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানাতেন। কিন্তু অন্যান্য ইংরাজী

পত্রিকার রক্ষণশীল সম্পাদকেরা তাঁর এই স্বাধীন উদার দৃষ্টিভঙ্গীকে সহ্য করতে পারতেন না। তাই রামমোহনের সংবাদ-কৌমুদীকে ক্যালকাটা জার্নাল যখন অভ্যর্থনা জানাল তখন ক্যালকাটা মান্থলী জার্নাল ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথা চিন্তা করে লিখল, 'From the *Calcutta Journal* we have extracted the Prospectus of a Native Newspaper. It is specious enough, but we must confess that we cannot join with those who hail it as 'a light for the Gentiles'··· If it shall be confined to mere local facts, and plain utility and instruction, without touching upon delicate questions of complicated policy, or idle tirades upon government—then, and then only, can we with a safe conscience give it our hearty approval.' রক্ষণশীল ইউরোপীয়গণ দেশী সংবাদপত্র প্রকাশে সন্তুষ্ট ছিলেন না, বিশেষতঃ সেই সমস্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের অধিকার চেতনার আলোচনা তাঁদের আশঙ্কার কারণ ছিল। তাঁদের মতে, বাকিংহাম ছিলেন এই রাজনৈতিক চেতনার উৎসাহদাতা; সংবাদ-কৌমুদী তাঁরই আশ্রিত, তাঁর *Prote'ge'*. তাই এ সম্বন্ধে এশিয়াটিক জার্নালের মন্তব্য হল, 'A Journal published in the language of the natives, conducted by natives, designed for the perusal of native Indians, and of them almost exclusively, is set on foot, avowedly, if Mr. Buckingham is to be credited, for the purpose of fomenting their accidental discontents, of opening their eyes to the defects of their rulers, of encouraging and giving utterance, not to their complaints, but to their remonstrances.'

হেষ্টিংস শাসনভার ত্যাগ করে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন ১৮২২ সালের শেষের দিকে। এরপর লর্ড আমহার্ষ্ট এলেন গভর্নর জেনারেল হয়ে। মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাজ করেন জন এ্যাডাম। সরকারী ও বেসরকারী রক্ষণশীল ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে বাকিংহাম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভাল ছিল না। এই সময় স্কটল্যাণ্ড গির্জার পাত্রী ডাঃ ব্রাইস ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে

একটি চাকরি গ্রহণ করেন। জন এ্যাডামই ছিলেন তাঁর নিয়োগকর্তা। ক্যালকাটা জার্নালে এই নিয়োগ সম্পর্কে বাকিংহাম মন্তব্য করলেন যে উপাসনালয়ের প্রধান আচার্যের পক্ষে এ কাজ উপযুক্ত নয়। এই মন্তব্যের জন্য বাকিংহামকে দু'মাসের মধ্যেই ভারত ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হল। বাকিংহাম চলে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌ও ব্রাইসের এই নিয়োগ অনুমোদন করলেন না। ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বাকিংহামের ব্যবসার যে ক্ষতি হয়েছিল তার জন্য কোম্পানী এবং গভর্নমেণ্টের কাছ হতে তিনি পেন্সন আদায় করেছিলেন। বাকিংহামকে ভারত ত্যাগের জন্য যে গুরুতর আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা লক্ষ্য করে মীরাৎ-এ রামমোহন একটি চমৎকার মন্তব্য করেন। তিনি লেখেন যে নীল নদের ধারে জনৈক হস্তীরক্ষক যে কবিতাটি বার বার আবৃত্তি করত এ প্রসঙ্গে তাঁর সেই কবিতাটির কথাই মনে হচ্ছে। কবিতাটি হল : তোমার পায়ের তলায় পিপীলিকার অবস্থা কি রকম তা যদি জানতে তাহলে হাতীর পায়ের তলায় তোমার অবস্থাও তুমি বুঝতে পারতে।

বাকিংহামকে শাস্তি দিয়েই মিঃ এ্যাডাম ক্ষান্ত হলেন না, দেশীয় সংবাদ পত্রের মাধ্যমে ক্রমবিস্তারিত রাজনৈতিক চেতনার ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের উপর নূতন করে বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। ১৮২৩ সালের ১৪ই মার্চ তারিখের এই আদেশে বলা হল যে এখন থেকে নূতন কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হলে গভর্নর জেনারেলের চীফ সেক্রেটারী স্বাক্ষরিত লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। রামমোহন দেখলেন যে এই নূতন আদেশ যদি কার্যকরী হয় তাহলে দেশের স্বাধীন প্রচেষ্টার অগ্রগতি ব্যাহত হবে। তাই তিনি এর প্রতিবাদের জন্য উদ্যোগী হলেন। তখন নিয়ম ছিল যে সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদন না পেলে গভর্নর জেনারেল প্রস্তাবিত কোন আইন কার্যকরী করা যাবে না। রামমোহন তাই সুপ্রীম কোর্টে প্রতিবাদ জানান স্থির করলেন। Sir Fancis Macnaghten তখন সুপ্রীম কোর্টের জজ। তাঁর কাছে ব্যারিষ্টার মিঃ ফারগুসন আবেদন জানালেন যে এই আইন কার্যকরী করার পূর্বে এই আইনের দ্বারা যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁদের বক্তব্য যেন শোনা হয়। জজ সম্মত হলেন এবং ৩১শে মার্চ সোমবার শুনানীর দিন নির্ধারিত হল। তিনি আরও উপদেশ দিলেন যে এই

আইন প্রত্যাহার করার জন্য এই সঙ্গে যেন গভর্নমেন্টের কাছে একটি লিখিত আবেদন করা হয়। জজের উপদেশে রামমোহন এবং তাঁর সহকর্মীরা আশা পেলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলা এবং ইংরাজী উভয় ভাষায় আবেদনপত্র লেখা হল। কিন্তু যাঁরা স্বাক্ষর করবেন তাঁরা স্বাক্ষর করার পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য এত বেশী সময় নিলেন যে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত তা হয়ে উঠল না। কেবলমাত্র কয়েকজন ব্যক্তি আবেদনপত্রটি পাঠ করার ও স্বাক্ষর করার সময় পেয়েছিলেন এবং তাও ঠিক সময়ে গভর্নমেণ্টের কাছে পেশ করা সম্ভব হল না। তাই ৩১শে মার্চ সকালে তাড়াতাড়ির মধ্যে পৃথক একটি আবেদনপত্র রচিত হল। এ আবেদন করা হল গভর্নমেণ্টের পরিবর্তে সুপ্রীম কোর্টের কাছে। এতে যে-কয়েকজন স্বাক্ষর করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁরা হলেন, চন্দ্র কুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হর চন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ ব্যানার্জী ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। গভর্নমেণ্টের মতের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করার ভয়ে অনেকে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন নি। এই প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছেন, 'it is well known that there are many under the immediate influence of Government, who would not express an opinion against the acts of those in power at the time, although it were to secure the salvation of all their countrymen.' [১] যাই বা হোক, এই ছয়জনের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্রটি সুপ্রীম কোর্টে পেশ করা হল। মিঃ ফারগুসন ও মিঃ টার্নটন সওয়াল জবাব করলেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে জজ আবেদন অগ্রাহ্য করে আইনটি বিধিবদ্ধ করার জন্য সম্মতি দিলেন। সুপ্রীম কোর্টে বিচার হল না, হল বিচারের প্রহসন। কেননা জজসাহেব পূর্বহতেই গভর্নমেণ্টকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি সম্মতি দেবেন। রামমোহন বেদনা-বিক্ষুব্ধ চিত্তে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'we observed with astonishment and regret, that his Lordship, in giving his decision, paid no regard whatever to the above Memorial, not alluding to it in the most distant manner, nor to the arguments it contained ; and his Lordship further disclosed, that at the time he expressed a desire to hear every

১। Appeal to The king in Council

objection that could be urged, and recommended a Memorial to Government........his Lordship had previously pledged himself by promise to Government to give it his sanction.'[১]

সুপ্রীম কোর্টের সম্মতিতে আইন পাশ হয়ে গেল। রামমোহন ব্যথিত হলেন। এই নূতন আইন অসম্মানসূচক বিবেচনা করে তিনি মীরাৎ-এর প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছিলেন নিম্নে তার বঙ্গানুবাদ[২] দেওয়া হল :—

'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার

শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল ১৮২৩ (অতিরিক্ত সংখ্যা)

পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, মহামান্য গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরেও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্ণর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১-এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার্ ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :—

প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটরীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ; এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই

১। Appeal to the king in Council.

২। রামমোহন রায়—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা।

কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে,—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই জিগর বস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ্

অর্থাৎ,—যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাছাড়া সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মান-ভাজন হইবার পরও গবর্মেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল, সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্মেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।

গদা-এ গোশা-নশিনি ! হাফিজা ! মাখ্রোশ্
রুমুজ্-ই-মস্লিহৎ-ই খেশ্ খুস্রোয়ান্ দানন্দ্।

—হাফিজ ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার'কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণসকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই

আমার অনুরোধ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে, আমি যে-স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাঁহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।'

মীরাৎ সম্বন্ধে মিস্ কলেট তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'It lived in all only some sixteen months.' কিন্তু এ হিসাব ঠিক নয়। ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল মীরাৎ-এর প্রকাশ শুরু হয় এবং বন্ধ হয় ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল; সুতরাং তার পরমায়ু মোটামুটি বারোমাস। এই নূতন আইনের প্রতিবাদে রামমোহন সংবাদ কৌমুদী ও মীরাৎ-এর মধ্যে শুধুমাত্র মীরাৎ-এর প্রকাশ কেন বন্ধ করলেন, তার উত্তরে মিস্ কলেট তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'Two reasons probably weighed with Rammohun : the greater cost and the greater risk of Government interference. The *Mirat* was addressed to a cultured constituency. The outlay involved in its production would therefore be larger, and its circulation smaller ; while its more critical attitude would naturally excite the keener suspicion in the breast of thin-skinned officials.' এ ছাড়া মনে হয় এই সময় সংবাদ কৌমুদীর প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। ১৮২৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ক্যালকাটা জার্নাল লিখেছে, 'The innocent SUNGBAD COWMUDDY, the object of so much unnecessary alarm, was originally established in the month of December 1821, and relinquished by the original Proprietor for want of encouragement in May 1822, after which it was kept alive by another Native till the September followin g, when, about the commencement of the Doorga Pcoja Holidays, it first was suspended, and then fell to rise no more.'

সুপ্রীমকোর্টে আবেদন কার্যকরী না হলেও রামমোহন নিরস্ত হলেন না। তিনি সুপ্রীমকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে রাজার কাছে একটি আবেদন পাঠালেন।

এই আবেদনে অনেকের স্বাক্ষর ছিল। পঞ্চান্নটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত দীর্ঘ এই আবেদনে রামমোহন সমস্ত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। একদিন সমস্ত ভারতে যখন মুসলমানশাসন প্রবর্তিত ছিল তখন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দক্ষিণে মারাঠারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাঙালী সর্বস্ব অপহৃত হওয়ার পরও নীরবে মাথা নত করে সহ্য করেছিল, যেহেতু সে শক্তিহীন এবং কর্মবিমুখ। তারপর বিধাতার আশীর্বাদের মত ইংরাজ এসেছে। তারা কোলকাতায় রাজধানী স্থাপন করেছে। এদেশের অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার এবং অন্যান্য সমস্তরকম সুবিধা দিয়েছে যা তাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দুশাসনের সময়েও আশা করতে পারেনি। তাই এদেশের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে উন্নতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ইংরাজের এই মহত্ত্বের কথা এদেশের অধিবাসীরা সর্বদা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। এরপর রামমোহন বাকিংহামের প্রসঙ্গ, আইন প্রণয়ন এবং সুপ্রীমকোর্টে আবেদনের বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। নূতন আইনে যে-আটটি বিশেষক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল রামমোহন যুক্তিদ্বারা দেখিয়েছেন যে দেশীয় সংবাদপত্র তার একটিও লঙ্ঘন করে নি। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকলে এ দেশের অধিবাসীরা তাদের অভাব-অভিযোগের কথা গভর্নমেণ্টকে জানাবার সুযোগ পাবে, তার ফলে কোন চাপা অসন্তোষ মনের মধ্যে ধূমায়িত হয়ে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে না। তাই রামমোহন লিখেছেন, 'A Government conscious of rectitude of intention, cannot be afraid of public scrutiny by means of the Press, since this instrument can be equally well employed as a weapon of defence.' তাঁর মতে, 'existence of a free Press is equally necessary for the sake of the Governors and the governed.' শাসক ও শাসিত উভয়ের মঙ্গলের জন্যই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজন। এই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যদি তাদের অধিকৃত দেশকে অজ্ঞানতার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় তাহলে তাদের সাম্রাজ্যবিস্তার হবে অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে রোমানরা তাদের অধিকৃত দেশে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিল বলেই তাদের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু চেঙ্গিস খাঁ অথবা তৈমুরলঙ্গের অত্যাচারের ফলে তাদের রাজত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। মোঘল ইতিহাস হতে রামমোহন দুজন বাদশার

নাম উল্লেখ করেছেন। একজন আকবর, অন্যজন আওরঙ্গজীব। আকবর প্রজাদের ভালবাসতেন, তাদের বিদ্যাচর্চায় উৎসাহ দিতেন, তাদের সামাজিক অথবা ধর্মনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না, তাদের নাগরিক অধিকার দিয়েছিলেন, তাই তিনি সুখে ও শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন। অপরপক্ষে সমান ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হিংসা, অবিচার ও অত্যাচারের ফলে আওরঙ্গজীব নিজের রাজত্বে অনেক দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলেছিলেন। মুসলমান রাজত্বে মুসলমানদের সঙ্গে এদেশের অধিবাসীরাও সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এসেছে। তারা দেশের সবচেয়ে উচ্চ পদে স্থান পেয়েছে, সৈন্য চালনার অধিকার পেয়েছে, বহু নিষ্কর জমি দান হিসাবে পেয়েছে, এবং পাণ্ডিত্যের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ শাসনে এদেশের অধিবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার নেই। তবুও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে নাগরিক অধিকার তাদের দিয়েছিল তা অনেকখানি। কিন্তু সেই অধিকার যদি খর্ব করা হয় তাহলে যে ভিত্তির উপর তারা বৃটিশ শক্তির অধীনে তাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করেছিল তা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই রাজার কাছে প্রার্থনা: 'Your Majesty will be pleased to confirm to them the privilege. they have so long enjoyed, of expressing their sentiments through the medium of the Press, subject to such legal restraints as may be thought necessary, or that your Majesty will be graciously pleased to appoint a commission of intelligent and independent Gentlemen, to inquire into the real condition of the millions Providence has placed under your high protection. অবশেষে রামমোহন লিখেছেন, 'Your Majesty's faithful subjects from the distance of almost half the globe, appeal to your Majesty's heart by the sympathy which forms a paternal tie between you and the lowest of your subjects, not to overlook their condition ; they appeal to you by the honour of that great nation which under your Royal auspices hay obtained the glorious title of Liberator of Europe, not to permit the possibility of millions of your subjects being

wantonly trampled on and oppressed; they lastly appeal to you by the glory of your Crown on which the eyes of the world are fixed, not to consign the natives of India, to perpetual oppression and degradation.'

দীর্ঘ এই আবেদনপত্রে রামমোহন যে যুক্তি-বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক চেতনা ও দেশ-হিতৈষণার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। পরাধীন দেশের অধিবাসী হয়ে গভর্নর জেনারেল ও সুপ্রীম কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করা যথেষ্ট সাহস ও তেজস্বিতার পরিচায়ক। রামমোহন এই আবেদনপত্রটি Stanhope-এর মাধ্যমে রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন। Stanhope এ সম্বন্ধে রামমোহনকে লিখেছেন, 'The Memorial, considering it as the production of of a foreigner and a Hindoo of this age, displays so much sense, knowledge, argument, and even eloquence, that the friends of liberty have dwelt upon it with wonder…'. কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত চতুর্থ জর্জ এই আবেদন মঞ্জুর করেন নি।

॥ এগার ॥

সংবাদ কৌমুদীর প্রথম সংখ্যায় রামমোহন ইংরাজ গভর্নমেণ্টের যে দুটি কল্যাণকর কার্যের প্রশংসা করেছিলেন তার একটি হল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অপরটি জুরিপ্রথা প্রবর্তন। কিন্তু এই জুরিপ্রথা তখন কেবলমাত্র সুপ্রীম কোর্টেই প্রবর্তিত ছিল এবং একমাত্র বৃটিশ প্রজারাই ছিল জুরি হওয়ার অধিকারী। তাই সংবাদ কৌমুদীর ঐ সংখ্যাতেই রামমোহন গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করেন যে জুরিপ্রথা যেন মফস্বলের অন্যান্য কোর্টেও প্রবর্তন করা হয় এবং এদেশীয় লোকদেরও যেন জুরি হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে রামমোহন সিংহলের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে সেখানে দেশীয় লোকেরা জুরি হওয়ার অধিকার পেয়েছে এবং তার ফলে বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে।

একদা ভারতে ও ইংলণ্ডে শাসকমহলের ধারণা ছিল যে ভারতবাসীরা তাদের জাতিভেদের জন্য, বুদ্ধিবৃত্তির অভাবের জন্য, শিক্ষার অভাবের জন্য এবং একতার অভাবের জন্য কোন রাজনৈতিক অথবা বিচার বিভাগীয় কার্যের উপযুক্ত নয়। তাই এদের বিচার বিভাগীয় কার্যের দায়িত্ব দেওয়ার পূর্বে স্যার আলেকজাণ্ডার জনসন ঠিক করেছিলেন যে সিংহলে তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। জনসন ছিলেন সিংহলের সুপ্রীম কোর্টের জজ এবং সুপ্রীম কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট। তিনি বহুবৎসর সিংহলে ছিলেন। সিংহলবাসীদের তিনি এই দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। তার ফলে ১৮১১ সালের নভেম্বর মাসে নূতন আইনে বলা হল যে ফৌজদারী আইনে অভিযুক্ত সিংহলবাসীদের বিচার করবেন স্বদেশবাসীদ্বারা গঠিত জুরিগণ। এই নূতন নিয়মে গভর্নমেণ্ট ও সিংহলবাসী উভয়েই উপকৃত হল। তাই ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতেও এই প্রথা প্রবর্তনে উৎসুক হলেন। সেইজন্য বোর্ড অব কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ওয়েন (Mr. Wynn) জনসনের কাছে এ বিষয়ে সবিশেষ জানতে চাইলেন। উত্তরে জনসন বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠালেন; এটি ১৮২৫ সালের ঘটনা। এর কিছু পরে ১৮২৬ সালের ৫ই মে পার্লামেণ্ট কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান জুরি বিল' পাশ হল। এই বিলে এদেশীয় লোকদের জুরি হওয়ার অধিকার দেওয়া হল সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু নিষেধ আরোপ করা হল।

আইনে বলা হল যে কোন হিন্দু অথবা মুসলমান জুরি দেশীয় অথবা বিদেশীয় খৃষ্টানের বিচার করতে পারবে না; কিন্তু খৃষ্টান জুরির ক্ষেত্রে এ ধরণের কোন নিষেধ থাকবে না। তাছাড়া কেবলমাত্র খৃষ্টানদের নিয়েই গ্রাণ্ড জুরি গঠিত হবে। রামমোহন দেখলেন যে এই আইনে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে অখৃষ্টানদের অধিকার খর্ব করা হল। সুতরাং বিচারকার্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি অনিবার্য এবং সমাজজীবনে তার কুফল অবশ্যম্ভাবী।

এই নূতন জুরি বিলে দেশের স্বার্থ কতখানি আহত হয়েছে সে সম্বন্ধে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের সংবাদ কৌমুদীতে একটি আলোচনা প্রকাশিত হল এবং মনে হয় এটি রামমোহনেরই রচনা। এই আলোচনায় বলা হল যে যখন একজন মানুষকে ফাঁসি, জেল অথবা ঐ ধরণের কোন গুরুতর শাস্তি দেওয়া হবে তখন হিন্দু ও মুসলমান আসামীর বিচারকর্তা হবে খৃষ্টানরা এবং সেই খৃষ্টান বৃটেনের অধিবাসী হতে পারে, অথবা বৃটিশ পিতা ও এদেশীয় মাতার গর্ভজাত হতে পারে, পর্তুগীজ-আর্মেনিয়ান হতে পারে, এমন কি শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা ধর্মান্তরিত খৃষ্টানরাও হবে এই বিচারের অধিকারী। কিন্তু একই দেশে বসবাস করে এবং একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানদের সেই অধিকার হতে বঞ্চিত করা হল। আলোচনায় এছাড়া আর একটি পরোক্ষ কুফলের প্রসঙ্গও উল্লিখিত হল। মিশনারী এবং পাদ্রীগণ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেরও বেশী এদেশে ধর্মপ্রচার করে, নানা ধরণের পুস্তক প্রকাশ করে এবং আরও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে সত্যকার একজনকেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারেননি। কিন্তু এই জুরিবিল প্রবর্তন হওয়ায় নূতন পথ উন্মুক্ত হল। অনেকেই এই আইনে অপমান সহ্য করতে না পেরে খৃষ্টধর্মবিশ্বাসের কাছে আশ্রয় নেবে। শাসকগোষ্ঠী যদি শক্তি ও কৌশল অবলম্বন করে প্রজাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয় তাহলে সেই প্রচেষ্টা প্রতিহত করা সাধ্যাতীত। তাই আলোচনায় মূল আইনের প্রসঙ্গে বলা হল যে যদি খৃষ্টানদের বিচারের সময় কেবলমাত্র খৃষ্টান জুরিগণ থাকতেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের বিচারের সময় হিন্দু ও মুসলমান জুরিগণ থাকতেন, অথবা হিন্দু ও মুসলমানদের বিচারের সময়ও খৃষ্টান জুরিদের এবং খৃষ্টানদের বিচারের সময়ও হিন্দু ও মুসলমান জুরিদের উপস্থিত থাকার নিয়ম থাকত তবেই সেটি হত যুক্তিসংগত ও নীতি-

সংগত আইন। কিন্তু তার পরিবর্তে আইনটি যেভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে অবস্থা ও মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমান হল খৃষ্টানের পদানত। এই আলোচনা সম্বন্ধে ১৮২৭ সালের জুলাই মাসের 'Bengal Chronicle' লিখল, 'The article to which we have referred contains a brief but clear and perspicuous analysis of the spirit and principles of Mr. Wynn's Bill, against some of the provisions of which it strongly and justly protests, on the grounds we have already mentioned.'

ইতিমধ্যে রামমোহন এই জুরিবিলের প্রতিবাদে পার্লামেণ্টে একটি আবেদন করেন। ১১৬ জন মুসলমান ও ১২৮ জন হিন্দুর স্বাক্ষর সম্বলিত এই আবেদনপত্রটি ১৮২৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রেরিত হয়। কুড়িটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই দীর্ঘ আবেদন-পত্রে রামমোহন নূতন জুরিবিলে হিন্দু ও মুসলমানদের যে অধিকার খর্ব করা হয়েছে এবং খৃষ্টানদের কাছে তাদের যে কতখানি হেয় করা হয়েছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। খৃষ্টানদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের পশ্চাতে রামমোহন চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, এদেশীয় জনগণকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার বাসনা। যদি তাই হয় তাহলে এ দেশের হিন্দু অথবা মুসলমান অধিবাসীদের দুঃখিত ও শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ, গ্রেট বৃটেনের আইন-সভা এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় গভর্নমেণ্ট এদেশের রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও ধর্ম রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের আমলে যে বিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে এদেশের জনগণ সরকারীপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেত কোম্পানীর আমলে তা বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও এদেশে অধিবাসীগণ শান্তমনে সেই দুর্ভাগ্য মেনে নিয়েছে এই ভেবে যে কোম্পানী তাদের ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করবে, কোন কারণেই তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। দ্বিতীয়তঃ, খৃষ্টানগণ কোলকাতায় সংখ্যালঘু হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমান সবসময়ই দলে বেশী হবে এবং ফলে বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু এই আশঙ্কার নিরসন সহজেই সম্ভব। যদি বিচারের সময় সমান সংখ্যক খৃষ্টান জুরি এবং হিন্দু ও মুসলমান জুরি নেওয়া হয় তাহলে আর কোন অসুবিধাই হতে পারে না। কিন্তু এরও প্রয়োজন নেই, কারণ কোলকাতার অধিবাসী হিসাবে

খৃষ্টানগণ যতই সংখ্যালঘু হোক না কেন, সুপ্রীমকোর্ট হতে প্রকাশিত জুরিদের তালিকায় যেখানে হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়ে মাত্র বিরাশী জনের নাম আছে, সেখানে খৃষ্টানদের নাম আছে ছয়শরও বেশী। তৃতীয়তঃ, গ্রাণ্ড জুরিতে স্থান পাওয়ার মত উপযুক্ত সম্ভ্রান্ত হিন্দু অথবা মুসলমানের অভাব। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট শুরু হওয়ার পর হতেই এদেশে জমিদারী আভিজাত্য গড়ে উঠেছে; তাছাড়া স্বাধীন ব্যবসা-বানিজ্যের সুযোগ হওয়ায় অনেকেই প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জন করেছেন। সুতরাং একথা সত্য হতে পারে না যে ইংরাজ অধিকারের প্রায় সত্তর বৎসর পরেও এমন একজন এদেশীয় লোক পাওয়া সম্ভব নয় যিনি কোলকাতার ইউরোপীয় বণিক অথবা সিভিলিয়ানদের সঙ্গে সমান মর্যাদায় গ্রাণ্ড জুরিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। চতুর্থতঃ, ধারণা করা যেতে পারে যে গ্রাণ্ড জুরিতে স্থান পেতে হলে যথেষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন, কেননা এক্ষেত্রে জজ ও এডভোকেটদের সাহায্য ব্যতিরেকেই শুধুমাত্র সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে রায় দিতে হবে। যদি তাই হয় তাহলেও এ ব্যাপারে এদেশের অধিবাসীরাই যোগ্যতর; কারণ স্বদেশবাসীদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কার সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা খৃষ্টানদের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা বেশী হওয়ায় তারাই বিচারকার্যে বেশী উপযুক্ত। সবশেষে গভর্নমেণ্টের কাছে সমস্ত ধর্মাবলম্বীর প্রতি সমান বিচার প্রার্থনা করা হল, কারণ পক্ষপাতী হওয়া গভর্নমেণ্টের পক্ষে শোভনীয় নয়। আবেদনে বলা হল, 'If it were indeed necessary to protect the Christian population of Calcutta from the possible operation of Hindoo or Mohamedan prejudices in the Administration of Criminal Justice, surely it would be at least equally necessary to protect Mohamedans and Hindoos from the operation of Christian prejudices.'

আবেদনপত্রটি পার্লামেণ্টে পেশ করার জন্য লণ্ডনে Mr. Crawford নামে জনৈক প্রভাবশালী ইংরাজের নিকট প্রেরিত হয়। ১৮২৮ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে তাঁকে লেখা একটি চিঠিতে রামমোহন নূতন জুরি বিল সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। রামমোহন লিখেছেন যে এদেশীয় জনগণের কথা

বিবেচনা না করে এবং সে বিষয়ে কোনরকম পরামর্শ না করে গভর্নমেণ্ট প্রায়ই যে সমস্ত আইন পাশ করছেন তার জন্ম তিনি গভীরভাবে দুঃখিত। তিনি আয়ারল্যাণ্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখেছেন যে সেখানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক কুফলের সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতে তার পুনরাবৃত্তি করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে অনুচিত। তিনি লিখেছেন, 'It should not be lost sight of that the position of India is very different from that of Ireland, to any quarter of which an English fleet may suddenly convey a body of troops that may force its way in the requisite direction and succeed in suppressing every effort of a refractory spirit. Were India to share one fourth of the knowledge and energy of that country, she would prove from her remote situation, her riches and her vast population, either useful and profitable as a willing province, an ally of the British Empire, or troublesome and annoying as a determined enemy.' রামমোহনের স্বাধীনতাকামী অন্তর এই উক্তির প্রতিটি ছত্রে অপূর্ব উজ্জ্বলতায় প্রকাশ পেয়েছে। আবেদনপত্রটি হাউস অব কমন্স-এর ১৮২৯ সালের ৫ই জুনের সভায় উপস্থাপিত করে নূতন জুরি বিলের প্রবর্তক মিঃ ওয়েন তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বললেন যে এদেশের অধিবাসীরা অসৎ, তারা সত্যনিষ্ঠার প্রতি আনুগত্যহীন এবং অর্থদ্বারা সহজেই বশীভূত। তাছাড়া তাঁর মূল বক্তব্য হল, 'Besides, recent as our empire in India is, it appeared that, at least in the first instance, it might not be desirable to place the conquered in the situation of judges of the conquerors.' বিজেতার বিচারকের আসনে বিজিতের স্থান সম্ভব নয়। তবে মিঃ ওয়েন ভারতবাসীদের আশ্বাস দিলেন যে খুবশীঘ্র কোম্পানীর সনন্দ নবীকরণের সময় ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা আলোচনা করে তার উন্নতির ব্যবস্থা করা হবে। তখন, মিঃ ওয়েনের ভাষায়, 'the first and foremost is to open to the natives a legitimate channel for ambition and exertion, by

the removal of every exclusion on account of blood or colour.'

এই প্রসঙ্গে রামমোহনের আরও দুটি প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর একটি হল, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুপ্রীমকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অন্যটি হল, 'অসিদ্ধ লাখরাজ ভূমিবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন'। হিন্দু উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহুকাল হতে দায়ভাগ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৮২৯-৩০ সালে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি গ্রে সাহেব একটি মামলার নিষ্পত্তিতে মিতক্ষরা আইন অনুসরণ করেন। উত্তরাধিকারিত্বের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে তিনি রায় দেন যে পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করে কোন ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দান-বিক্রয় করতে পারবে না। রামমোহন এর প্রতিবাদে ১৮৩০ সালে ইংরাজীতে একটি সুদীর্ঘ পুস্তক প্রকাশ করলেন। পুস্তকটির নাম, 'Essay on the rights of Hindoos over ancestral property according to the Law of Bengal.' এই পুস্তকে তিনি দায়ভাগ ও মিতক্ষরা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক হিন্দুর পৈতৃক সম্পত্তিতে কতখানি অধিকার তার উল্লেখ করেছেন, উত্তরাধিকারিত্বের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করলে সমাজে কতদূর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তার বিবরণ দিয়েছেন, এদেশীয়দের অধিকারের প্রতি গভর্নমেণ্টের অযথা হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেছেন এবং সবশেষে লিখেছেন, 'If I have succeeded in this attempt, it follows that any decision founded on a different interpretation of the law, however widely that exposition may have been adopted in other provinces, is not merely retrograding in the social institution of the Hindoo community of Bengal, mischievous in disturbing the validity of existing titles of property, and of contracts founded on the received interpretation of the law, but a violation of the charter of justice, by which the administration of the existing law of the people in such matters was secured to the inhabitants of this country.' রামমোহনের

এই পুস্তক প্রকাশিত হলে এ সম্বন্ধে হরকরা পত্রিকায় আলোচনা দেখা যায়। 'একজন হিন্দু' নামের আড়ালে জনৈক ব্যক্তি এই আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং রামমোহন এর উত্তর দেন। ১৮৩০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর হতে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত এ সম্বন্ধে উভয়পক্ষের বিভিন্ন পত্র প্রকাশিত হয়। এগুলি রামমোহনের ইংরাজী গ্রন্থাবলীতে মূল পুস্তকের সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সুপ্রীম কোর্টের এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে তিনি প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেন ও জয়যুক্ত হন।

১৭৯৬ সালে সকৌন্সিল গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ রাজস্ব বিভাগের কালেক্টরদের জমির প্রকৃত মালিকানা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ দেন এবং বলেন, যে-সমস্ত ক্ষেত্রে মালিক তার প্রকৃত স্বত্ব কোর্টে প্রমাণ করতে অক্ষম হবে, সেই সকল ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের পক্ষে কালেক্টর কোর্টের ডিক্রীর বলে জমি অধিকার করবেন। কিন্তু লাখরাজ জমির মালিককে তার অধিকার হতে বঞ্চিত করা হবে না এবং সেই জমিতে রাজস্বও ধার্য হবে না। কিন্তু ১৮২৮ সালে গভর্নমেণ্ট একটি নূতন আইন প্রচার করল। এই আইনে বলা হল যে কোর্টের বিচার ছাড়াই রাজস্ব বিভাগের কালেক্টর তাঁর জেলার মধ্যে নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী নিষ্কর জমির মালিকদের মালিকানা স্বত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকারী। এই নূতন আইনে এদেশীয় অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অধিকারে গভর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। রামমোহন তাই এর প্রতিবাদ করলেন। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের নিয়ে রামমোহন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের কাছে এই আইনটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন জানালেন। বেণ্টিঙ্ক আইনটি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার না করলেও আপাততঃ কার্যকরী করা স্থগিত রাখেন।

॥ বার ॥

রামমোহন একেশ্বরবাদী। তাই হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ উভয়কেই তিনি সমানভাবে আক্রমণ করেছেন। উভয় শাস্ত্র হতে প্রচুর প্রমাণ উদ্ধৃত করে ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপন্ন করেছেন এবং হিন্দু পণ্ডিত ও খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে এ বিষয়ে শাস্ত্রবিচারে অবতীর্ণ হয়েছেন। আত্মীয় সভা গঠন করে ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির মধ্যদিয়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন। এছাড়াও রামমোহন আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। নিম্নে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হল।

'গায়ত্রীর অর্থ' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৭৪০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮১৮ সালে। ভূমিকায় প্রথমে রামমোহন 'বেদেতে এবং বেদান্তাদি দর্শনেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ সংন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্রহ্মোপাসনার' যে নির্দেশ আছে তার উল্লেখ করেছেন। পরে ব্রাহ্মণদের গায়ত্রীজপ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইহাঁকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরশ্চরণো করিয়া থাকেন অথচ তাঁহারদের গায়ত্রী-প্রদাতা আচার্য্য অথচ পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহাদিগ্যে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ তাহা অনেককে কহেন না এবং ওই জপকর্ত্তারাও ইহার কি অর্থ তাহা জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।' তাই গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করে রামমোহন দেখালেন যে পরব্রহ্মই সেখানে একমাত্র উপাস্য।

'আত্মানাত্মবিবেক' প্রকাশিত হয় ১৮১৯ সালে। এই গ্রন্থটি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য প্রণীত। রামমোহন এখানে মূল গ্রন্থের এক একটি বাক্য ও তার অনুবাদ মুদ্রিত করেছেন। বৈদান্তিক মতই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৭৪৫ শকে অর্থাৎ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'প্রার্থনা পত্র' প্রকাশিত হয়। রামমোহন

এখানে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃভাব প্রদর্শনের জন্য সকল ব্রহ্মোপাসকদের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করেছেন। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চালিত তাঁদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপন্থী, ও কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি, এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়।' এছাড়াও ইউরোপীয়দের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থসাধন জানেন তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়।' রামমোহনের মতে, 'উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।' এই সঙ্গে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের প্রতি দ্বেষভাব পোষণ করতে রামমোহন নিষেধ করেছেন। এমন কি তাঁরা যদি অদ্বৈতবাদ হতে বিমুখ করার জন্যও চেষ্টা করেন 'তখনও তাঁহাদিগ্যে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়।' এখানে স্মরণীয় যে 'Precepts of Jesus'-কে কেন্দ্র করে রামমোহনের সঙ্গে মিশনারীদের বাদ-প্রতিবাদ এই সময় চরমে উঠেছিল।

•

'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' প্রকাশিত হয় ১৭৪৮ শকে অর্থাৎ ১৮২৬ সালে। গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হলে শাস্ত্রানুসারে তাঁর আচরণ কেমন হওয়া উচিত, এই এই পুস্তিকায় তার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা তিন প্রকার এবং তাঁদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান আবশ্যক। মনুর মতানুসারে তিন প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের মধ্যে তৃতীয় প্রকারের লক্ষণ এখানে লিখিত হয়েছে।

'গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং' প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সালে। এটি সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায় লিখিত। ঐ বৎসরই এর একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বেদপাঠ ছাড়াও যে কেবলমাত্র গায়ত্রী জপ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয় সেই তত্ত্ব এখানে নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহযোগে প্রতিপন্ন হয়েছে। গায়ত্রীর মধ্যে তিনটি মন্ত্র এবং এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম। সেই জন্য এই তিনমন্ত্রের

একত্র জপের বিধি আছে। এই তিন মন্ত্রের সংক্ষেপার্থ হল : 'সকলের কারণ সর্ব্বত্র ব্যাপি সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহবস্তের অন্তর্যামি তাঁহাকে চিন্তা করি।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রামমোহন তাঁর শাস্ত্রবিচার ও বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যদিয়ে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে ব্রহ্মোপাসনার জন্য এদেশের অধিবাসীদের উৎসাহিত করেছিলেন। তাই ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি স্থাপিত হলে এবং সেখানে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হলেও, সেখানকার খৃষ্টানমতে উপাসনা সোসাইটির হিন্দুসভ্যদের মনঃপূত হয়নি। তাই তাঁরা ক্রমশঃ সরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং নিজেদের একটি পৃথক উপাসনালয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। এ সম্বন্ধে History of Brahmo Samaj গ্রন্থে লিওনার্ড সাহেব লিখেছেন যে একদিন ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি হতে রামমোহন যখন গৃহে ফিরছিলেন তখন তাঁর সঙ্গী তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নিজেদের জন্য একটি পৃথক উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবটি রামমোহনের মনঃপূত হল। তিনি বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কালীনাথ মুন্সীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তারপর বিস্তৃত আলোচনার জন্য রামমোহনের গৃহে একটি সভা আহ্বান করা হল। সভায় তাঁদের সঙ্গে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং মথুরানাথ মল্লিকও এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। তখন চন্দ্রশেখর দেবের উপর ভার পড়ল স্থান নির্বাচনের। তিনি সিমলায় শিবনারায়ণ সরকারের বাড়ীর দক্ষিণে একটি জমির সন্ধান করেন। কিন্তু সেই জায়গা উপাসনাগৃহের অনুকূল বলে বিবেচিত হল না। তাই জোড়াসাঁকোয় চিৎপুর রোডের উপর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ী নির্বাচিত হল। কমল বসু পর্তুগীজ বণিকদের অধীনে কাজ করতেন বলে ফিরিঙ্গি কমল বসু নামে পরিচিত ছিলেন। এই বাড়ীতেই ১৮২৮ সালের ২০শে আগষ্ট (৬ই ভাদ্র ১৭৫০ শকাব্দ) বুধবার 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর পত্তন হল। পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয় ব্যাখা করলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ইনি হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই আলোচনা 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান' নামে মুদ্রিত হল। ইংরাজী অনুবাদ করলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী; ইনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হন। উপাসনা হত প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হতে ৯টা পর্যন্ত। দুজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করতেন। উপনিষদ পাঠ

করতেন উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ। এঁরই সঙ্গে রামমোহনের একবার শাস্ত্র-বিচার হয়। উপনিষদ পাঠের পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। তার পর যন্ত্র সহযোগে ব্রহ্মসংগীত হওয়ার পর সভা ভঙ্গ হত।

২০শে আগষ্ট তারিখে ব্রাহ্ম সমাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। কিন্তু তার বেশ কিছু পূর্ব হতেই রামমোহন ও তাঁর অনুরাগীবৃন্দের মধ্যে এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির হিন্দু সদস্যগণ যে একটি পৃথক উপাসনালয়ের জন্য চেষ্টা করছেন সে সংবাদ এ্যাডামের কাছে অজানা ছিল না। সমস্ত জেনেও তিনি এই প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে উৎসাহিত করেন। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে এর দ্বারাই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লণ্ডনে Mr. John Bowring-কে লেখা চিঠিতে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করে লিখেছেন, 'To prevent prejudice from being excited, it will be necessary to keep Christianity out of view at present in connection with this auxiliary,' এবং ২রা এপ্রিল তারিখে Dr. Tuckerman-কে লেখা চিঠিতে এ প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর আগষ্ট মাসে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু সেখানকার উপাসনা পদ্ধতি এ্যাডামকে হতাশ করল। খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রের পরিবর্তে সেখানে কেবলমাত্র বেদপাঠ হত এবং বৈদিক নিয়মেই উপাসনা পরিচালিত হত। ১৮২৯ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখের চিঠিতে Dr. Tuckerman-কে তিনি এ কথা উল্লেখ করে লিখলেন যে এ বিষয়ে তাঁর আপত্তি তিনি রামমোহন ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে জানিয়েছেন। এ্যাডাম সাহেব আপত্তি জানালেন বটে, কিন্তু তবুও এই নূতন সংস্থাকে মনে করলেন, 'a step forward to Christianity.' তাই খৃষ্টান ইউনিটেরিয়ান আর হিন্দু ইউনিটেরিয়ানদের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। এই হিন্দু ইউনিটেরিয়ানদের ৫০০ টাকা সাহায্য দেওয়ার জন্য তাঁর কমিটির কাছে অনুরোধ জানালেন এবং নিজেও মাঝে মাঝে এই উপাসনায় উপস্থিত হতেন।

ব্রাহ্ম সমাজের কাজ এগিয়ে চলল। ক্রমে এখানে উপাসনায় যোগদানের জন্য অধিক সংখ্যক ব্যক্তি হাজির হতে লাগলেন। এরপর যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হলে

১৮২৯ সালের ৬ই জুন (১২৩৬ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ) তারিখে চিৎপুর রোডের পার্শ্বে একটি পাকাবাড়ীসহ চার কাটা দু'ছটাক জমি চার হাজার দু'শ টাকায় ক্রয় করে নূতন সমাজগৃহ স্থাপিত হল। জায়গাটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের জন্য ক্রয় করা হয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রামমোহন রায়ের নামে। পরে ১৮৩০ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে একটি ট্রাষ্টডীড তৈরী হয়। ট্রাষ্টী হলেন বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায় এবং রমানাথ ঠাকুর। ২৩শে তারিখে নূতন গৃহে ব্রাহ্মসমাজ স্থানান্তরিত হল। তাই পরবর্তী-কালে ব্রাহ্মসমাজে দুটি উৎসব পালন করা হয়। একটি ভাদ্রোৎসব, অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজর প্রতিষ্ঠা দিবস (৬ই ভাদ্র ১৭৫০ শকাব্দ, ২০শে আগষ্ট ১৮২৮ সাল); অপরটি মাঘোৎসব, অর্থাৎ নূতন গৃহের উদ্বোধন দিবস (১১ই মাঘ ১৭৫১ শকাব্দ, ২৩শে জানুয়ারী ১৮৩০ সাল)।

ব্রাহ্ম সমাজের নূতন গৃহের উদ্বোধনের পর কোলকাতায় ইউরোপীয়ান সমাজে আশাভঙ্গের ছাপ পড়ল। এই সময়কার ইণ্ডিয়া গেজেট ও জনবুল পত্রিকায় এই আক্ষেপ ধ্বনিত হল। এতদিনে এ্যাডাম সাহেবেরও অপেক্ষা করার দিন শেষ হল। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে রামমোহন সুসমাচারগুলির (Gospels) ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না। তিনি পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রচারে সহায়ক বিবেচনা করেই এতদিন ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্মের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। তাই পাদ্রী উইলিয়ম এ্যাডাম এবার পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে চিঠিতে লিখলেন, 'To be candid, however, I must add that the conviction has lately gained ground in my mind that he employs Unitarian Christianity in the same way, as an instrument for spreading pure and just notions of God, without believing in the divine authority of the Gospel.'

ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডীড একটি অমূল্য সম্পদ। রামমোহনের ধর্মসংস্কারপ্রচেষ্টা এতদিনে একটি পূর্ণ, স্পষ্ট, সার্থক রূপ পরিগ্রহ করল। তাই এই ট্রাষ্ট ডীডটি একদিকে যেমন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে একটি স্মরণীয় দলিল, অন্যদিকে এটি হল রামমোহনের ধর্মমতের স্পষ্ট বাণীরূপ। এখানে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা প্রণালীর পূর্ণ

বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। উপাস্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পাতা সেই অনাদ্যন্ত, অগম্য, অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরই এখানে উপাস্য। কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোন সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক ব্যবহৃত নামে এখানে উপাসনা হবে না। ট্রাষ্টডীডের ভাষা হল: 'for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe, but not under or by any other name, designation or title, used for and applied to any perticular Being or Beings by any man or set of men whatsoever…….' যিনি ভদ্রভাবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে ধর্মসংযুক্তমনে উপাসনার জন্য আসবেন তিনিই উপাসক। এর আর কোন বাচবিচার নেই। ট্রাষ্টডীডের ভাষা হল: 'for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction, as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner.' এই উপাসনালয়ে কোন প্রকার মূর্তির ব্যবহার; নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান; জীবহত্যা এবং কোন প্রকার আহার অথবা পান হবে না। এখানকার আলোচনায় অথবা সংগীতে কোন কিছু সম্বন্ধে কোন অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা চলবে না। যে সমস্ত প্রার্থনায় ও সংগীতে ঈশ্বর সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার উন্নতি হয়, প্রেম, দয়া ও ভক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হয় কেবলমাত্র সেগুলিই এখানে স্থান পাবে।

ট্রাষ্টডীড হতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ছিল এক উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ভাব। কোন বিশেষ ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্য সেখানে ছিল না। যে-কোন সংস্কারমুক্ত মানুষের কাছে সেই উপাসনালয়ের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ একটি স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে।

এই সময় রামমোহন কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সংস্কৃত ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়াচার্য রচিত 'বজ্রসূচী' নামে একটি গ্রন্থ আছে। রামমোহন ঐ গ্রন্থের প্রথম নির্ণয় নামক অধ্যায়টি অনুবাদ করেন এবং মূলসহ ঐ অনুবাদটি ১৭৪৯

শকাব্দে অর্থাৎ ১৮২৭ সালে প্রকাশ করেন। এই অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ বলতে জীবাত্মা, দেহ, জাতি অথবা বর্ণ কিছুই বোঝায় না; ধর্ম, পাণ্ডিত্য অথবা কর্মের দ্বারাও ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। 'পরমাত্মার সত্ত্বাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম-দমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্ যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়,...ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ অন্য নহে ইহা নিশ্চয় হইল।'

১৮২৮ সালে রামমোহনের 'ব্রহ্মোপাসনা' প্রকাশিত হয়। এখানে 'ব্রহ্মোপাসনার সংক্ষেপ ক্রম' উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু রামমোহনের সময় ব্রাহ্মসমাজে এই পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা হত না। তখন শুধুমাত্র উপনিষৎ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সংগীত হত।

এই বৎসরই 'ব্রহ্মসংগীত' প্রকাশিত হয়। 'রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীত নামে যে সঙ্গীতগুলি প্রচলিত, তাহার সমুদায় তাঁহার নিজের রচিত নহে। তাঁহার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তী ও বন্ধুগণও অনেকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি অবশ্য তাঁহারই ভাবে রচিত ও তাঁহা কর্ত্তৃক সংশোধিত। তাঁহার স্বরচিত গীতের সহিত সেই বন্ধুকৃত গীতগুলি তাঁহারই সময়ে দুই তিন বার মুদ্রিত হইয়াছিল; পরে আরো অনেকবার অন্যান্য লোক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল মুদ্রাঙ্কণে রামমোহন রায়ের বন্ধুকৃত গীতগুলির নিম্নে রচয়িতাদিগের নামের আদ্য অক্ষর লিখিত আছে।' এঁদের নাম হল: কৃষ্ণমোহন মজুমদার, নীলমণি ঘোষ, নীলরতন হালদার, গৌরমোহন সরকার, কাশীনাথ রায়, নিমাইচরণ মিত্র ও ভৈরবচন্দ্র দত্ত। কেবলমাত্র রামমোহন রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি রামমোহন গ্রন্থাবলীর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এর মোট সংখ্যা হল বত্রিশ। প্রতিটি গানের সঙ্গে রাগ-রাগিণীও উল্লিখিত হয়েছে। সংগীতগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত। আত্মীয়সভার অধিবেশনেও এই ব্রহ্মসংগীত গীত হত।[1] ১৮১৬ সালে এক সভার অধিবেশনে গীত সংগীতটি হল:

কে ভুলালে হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, একি দায়।

আপনি গড়হ যাকে,
যে তোমার বশে তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর তাকে কর অভিপ্রায় ?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার ;
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে,
সম্মুখে নাচাও তারে—
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায় ?

রামমোহন যখন বিলাতে ছিলেন তখনও তিনি ব্রহ্মসংগীত রচনা করে ব্রাহ্মসমাজের জন্য পাঠাতেন। ১৮৩২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে পুত্র রাধাপ্রসাদকে একটি সংগীত লিখে পাঠান। এই সঙ্গে পত্রে লেখেন, 'এই অবকাশে ব্রাহ্মসমাজের কাজের নিমিত্ত এক গীত পাঠাইতেছি, যত্তপি তোমরা ও বিন্তাবাগীশ উচিত জান, গাথকদিগকে দিবে।' এই সংগীতটি হল :

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতি ক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা ;
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥

রামমোহনের ব্রহ্মসংগীতগুলি বেদান্তের জ্ঞানমার্গ উপাসনা অনুসারে রচিত। এগুলি যেমন ভাবগভীর, তেমনি সুললিত এবং রামমোহনের অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচায়ক।

১৭৫১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮২৯ সালে রামমোহন 'অনুষ্ঠান' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থের অবতরণিকায় তিনি লিখেছেন, 'উপনিষদে কথিত শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত সনাতন উপাসনাকে প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন।'

এই পুস্তকে শিষ্যের ১২টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আচার্য। কে উপাস্য, কিরূপে তাঁর স্বরূপ নির্ণয় করা হয়, উপাসনার কি প্রণালী, উপাসনাতে আহার-ব্যবহারের কি প্রকার নিয়ম প্রভৃতি তত্ত্ব প্রথমে এবং পরে তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি নাম, 'ক্ষুদ্রপত্রী'। রামমোহন ব্রহ্ম বিষয়ক কয়েকটি সুশ্রাব্য ছন্দোবদ্ধ শ্রুতি, শ্রুতিমর্ম ও গীত এক একটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করে বিতরণ করতেন। এর শেষে তিনি লিখেছেন, 'বেদের মন্ত্র এবং ভাষ্যের কারিকা ও পরমার্থ বিষয়ের ষট্‌পদী গীত যাহা মনোরম ছন্দে এবং সুলভ শব্দে আছে তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখা গেল সুশ্রাব্য জানিয়া পাঠ করিলেও অর্থাবগতি হইয়া কৃতার্থ হওনের সম্ভাবনা আছে।' রামমোহনের গ্রন্থপ্রকাশক এটি 'ক্ষুদ্রপত্রী' নামে দু'পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করেছেন।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে রামমোহনের প্রচেষ্টা ছিল বিভিন্নমুখী। তিনি বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন, পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র-বিচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেইসঙ্গে স্থাপন করেছিলেন একটি বেদ বিদ্যালয়। বেদ শিক্ষার জন্য ১৮২৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের দ্বারা এখানে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। 'মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ৭৪ নং বাড়ীতে উক্ত বেদ-বিদ্যালয়ের কার্য হইত।'

॥ তের ॥

দরিদ্র স্বদেশের দুরবস্থা রামমোহনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে এদেশের কৃষি, শিল্প অবহেলিত ছিল। তাই অর্থনৈতিক উন্নতির কোন লক্ষণ সেদিন ছিল না। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের পরিবর্তে যদি অবাধবাণিজ্য প্রচলিত হয়, যদি অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় এসে এদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে, তবেই উন্নতি সম্ভব। তাই রামমোহন কলোনাইজেসনের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আসলে একটি বণিকের দল। তাদের হাতে ছিল এদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার। তাই তাদের অনুসৃত নীতিতে এদেশের উন্নতিপ্রচেষ্টার কোন লক্ষণ ছিল না। যে সমস্ত কাঁচামাল ইংলণ্ডের শিল্পের জন্য প্রয়োজন, কেবলমাত্র সেগুলি সংগ্রহেই তারা যত্নবান ছিল। যাতে তাদের ব্যবসায়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না ঘটে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি ছিল কোম্পানীর। অন্যান্য ইউরোপীয়গণ এসে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করলে তাদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। তাই অবাধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে তারা নানা যুক্তি তৈরী করেছিল। তাদের মত হল: এদেশের জমি, অধিবাসী ও আবহাওয়া সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের সম্যক্ ধারণা নেই। তারা কৃষিতে অংশগ্রহণ করলে দেশীয় জমিদারগণ অধিকারচ্যুতির আশঙ্কায় তাদের কাজে বাধা দেবে। রায়তগণও তাদের নিজস্ব ধর্মসংস্কারের ফলে নূতন মনিবদের সঙ্গে করবে সম্পূর্ণ অসহযোগ। ফলে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেও ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। কারণ, রাজস্ব বাকীর জন্য এদেশীয় অধিবাসীদের সাধারণ কোর্টে সহজেই অভিযুক্ত করা সম্ভব; কিন্তু ইউরোপীয়গণের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া উপায় নেই, এবং তা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। অতএব অবাধ বাণিজ্য শুরু হলে এ দেশে উন্নতির পরিবর্তে দেখা দেবে দারুণ বিশৃঙ্খলা।

কোম্পানীর এই সমস্ত যুক্তি অবতারণার কারণ হল ইউরোপীয়দের পক্ষ হতে এদেশে অবাধ বাণিজ্যের জন্য একটি চাপ সৃষ্টির প্রয়াস। অধিক সংখ্যক ইউরোপীয়দের এদেশে আগমন এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ছিল

এর মূল বক্তব্য। এরই নাম কলোনাইজেসন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সিংহলেও ছিল এই একই সমস্যা; কিন্তু সেখানে সমাধান হয়েছিল সত্বর। ১৮১০ সালে সেখানে অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন হয় এবং ফলে সেখানকার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ১৮১৩ সালে কোম্পানীর নূতন সনন্দে কিছু সুযোগ-সুবিধা উল্লিখিত হলেও কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার সেখানে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত। ১৮২৪ সাল পর্যন্ত চলল একইভাবে। দেশের অভ্যন্তরে ইউরোপীয়দের জমি নিতে দেওয়া হল না; নীলকর সাহেবরা জমি চেয়ে বিফল হল। এই সময় বাংলা গভর্নমেণ্ট এদেশে কফি চাষের ইচ্ছা পোষণ করল। তাই ইউরোপীয়দের কিছু জমি দেওয়া হল নির্দিষ্ট কয়েকটি সর্তে। কোম্পানীর এই অনিচ্ছা এবং সর্ত আরোপের কড়াকড়ির জন্য কোলকাতার ইউরোপীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। তারই ফলে ১৮২৭ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে টাউন হলে তাঁরা একটি সভা আহ্বান করলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল: পূর্ব এবং পশ্চিম ভারত হতে যে চিনি রপ্তানী হয় তার শুল্কের হার সমান করার জন্য এবং এদেশে বৃটিশ প্রজাদের অবাধ বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়ার জন্য পার্লামেণ্টের কাছে আবেদন করা। কলোনাইজেসন সম্পর্কে এটাই হল প্রথম প্রকাশ্য সভা। কিন্তু দুঃখের বিষয় একজন পাদ্রী এই সভায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে কোনরূপ প্রতিবাদ না করে গোপনে এদেশীয় লোকদের কলোনাইজেসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তাঁর যুক্তি হল: এর ফলে দেশীয় জমিদারদের বঞ্চিত করে ইউরোপীয়গণ জমি অধিকার করবে এবং তাদের সাহায্যে এদেশের অধিবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হবে। এমন একটি হীন সর্বনাশা প্রচারকার্য দেশের কতদূর ক্ষতি করতে পারে তা চিন্তা করে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীগণ শঙ্কিত হলেন। তাই সংবাদ-কৌমুদীর মাধ্যমে তাঁরা প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরলেন। ১৮২৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'একজন জমিদার' স্বাক্ষরিত একটি দীর্ঘ পত্র ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হল। পত্রে টাউন হলের সভার বিবরণ ও উক্ত পাদ্রীর গোপন চক্রান্তের উল্লেখ করে এদেশীয় জমিদারদের অধীনে রায়তদের দুরবস্থার পরিচয় দেওয়া হল। এই সঙ্গে নীলকর সাহেবদের চেষ্টায় বহু পতিত জমিতে চাষ, তাদের অধীনে রায়তদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, বহু সংখ্যক

লোকের জীবিকার সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ও বিশদভাবে উল্লিখিত হল। এরপর স্পষ্ট মন্তব্য করা হল যে ইউরোপীয়গণ এদেশে কৃষি-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সবশেষে ঘোষিত হল : যারা এদেশে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক শিক্ষাবিস্তারে বিরোধী এবং ইউরোপীয়গণের বসবাস তথা কৃষি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণে বিরোধী তারা এদেশের বর্তমান অধিবাসীদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের শত্রু।

জনৈক পাদ্রী যখন এদেশের একদল লোককে কলোনাইজেসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছিলেন তখন সংবাদ কৌমুদীর পৃষ্ঠায় এই ধরণের আলোচনা খুবই ফলপ্রদ হল। ১লা মার্চ তারিখে বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় এর একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হল এবং সেইসঙ্গে পত্রিকা এই আলোচনার প্রশংসা করে মন্তব্য করল, 'It is to be hoped, however, that the eyes of the deluded natives will now be opened to the true state of the case and they will learn to view in their true light the disgraceful efforts of which we allude.' 'হরকরা' এই আলোচনাকে স্বাগত জানালেও কোম্পানী ও রক্ষণশীল জমিদারদের সমর্থক 'জন বুল' পত্রিকা তাকে ব্যঙ্গ করল। এই ব্যঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করে হরকরায় পরে বলা হল যে সাধারণ বুদ্ধি ও সততা নিয়ে কোলকাতা ও মফস্বলের অধিবাসীদের অবস্থার তুলনা করলেই এদেশে ইউরোপীয়দের বসবাসের ফল প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে।

এরপর ১৮২৯ সালের ২৮শে জানুয়ারী কোলকাতার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণ এদেশে ইউরোপীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য জমি ক্রয়ের সুযোগ প্রার্থনা করে গভর্নমেন্টের কাছে একটি আবেদন করলেন। এই আবেদনের ভিত্তিতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সকৌন্সিল গভর্নর জেনারেল ইউরোপীয়দের জমি সংগ্রহের ব্যাপারে বাধা অপসারণের জন্য একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ১৮২৪ সালের ৭ই মে তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্তের কড়াকড়ি কিছু পরিমাণ শিথিল করতে সম্মত হলেন। ফলে এদেশীয় রক্ষণশীল জমিদারগণ প্রমাদ গণলেন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বাংলার জমিদার ও তালুকদারগণের পক্ষ হতে পার্লামেন্টে একটি আবেদন পেশ করলেন। আবেদনের মোটামুটি বক্তব্য হল : ইউরোপীয়দের

যেন এদেশে কৃষি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করার অনুমতি না দেওয়া হয়। কারণ নীলকর সাহেবরা চাষীদের উপর অত্যাচার করছে, ধানের জমিতে নীল চাষ করছে, ফলে চালের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং এরা যদি গ্রামাঞ্চলে জমি ক্রয় করার অবাধ সুযোগ পায় তাহলে এদেশীয় প্রজাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ব্যবসায়ীদের আবেদন ও গভর্নর জেনারেলের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সিদ্ধান্ত কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান হল। কিন্তু ইতিমধ্যে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ তাঁদের ৮ই জুলাই তারিখের চিঠিতে গভর্নর জেনারেলের ১৮২৪ সালের ৭ই মে তারিখের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে জানিয়ে দিলেন যে ইউরোপীয়দের জমি সংগ্রহের ব্যাপারে যেন উক্ত সিদ্ধান্তই যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়।

কোর্ট অব ডিরেক্টরসের এই নির্দেশের ফলে ব্যবসায়ীগণ এবং কলোনাইজেসনের সমর্থকগণ ক্ষুব্ধ হলেন। তাই ১৮২৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে শেরিফকে একটি সভা আহ্বান করার জন্য আবেদন করা হল ; এই আবেদনে অন্যান্যদের সঙ্গে রামমোহনেরও স্বাক্ষর ছিল। সভা হল ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে। সভায় কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যনীতির ফলে এদেশের চরম দুর্দশা ও এদেশে ইউরোপীয়গণের বসবাসের বাধা দূর করা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর একটি প্রস্তাব পেশ করেন। রামমোহন দ্বারকানাথের প্রস্তাবটিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, 'From personal experience I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with the European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs, a fact which can be easily proved by comparing the condition of those of my countrymen who have enjoyed this advantage, with that of those who unfortunately have not had that opportunity ; and a fact which I could, to the best of my belief, declare on solemn oath before any assembly.' নীলকর সাহেবদের সম্বন্ধে দ্বারকানাথ যা উল্লেখ করেছিলেন রামমোহন তা সমর্থন করে বললেন যে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে

তিনি জেনেছেন যে নীল চাষের ফলে এদেশে আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। নীলকরদের দ্বারা কিছু ক্ষতি হলেও, সরকারী ও বেসরকারী সকল শ্রেণীর ইউরোপীয়দের মধ্যে তাঁদের দ্বারাই এদেশের উপকার হয়েছে অনেক বেশী। ১৮২৯ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে Mr. Nathaniel Alexander-কে লিখিত চিঠিতে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'But, my dear sir, you are well aware that no general good can be effected without any partial evil.' দেশের সামগ্রিক উন্নতির কথা চিন্তা করে রামমোহন সেদিন এই আংশিক ক্ষতি মেনে নিয়েছিলেন। টাউন হলের সভায় দ্বারকানাথের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ফলে রক্ষণশীল জমিদারসম্প্রদায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় সেই ক্রোধ নানাভাবে প্রকাশ পেল। চন্দ্রিকা স্পষ্ট মন্তব্য করল যে এই সভার গৃহীত প্রস্তাবে এদেশের ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, জমিদার-ইজারাদার সকলেই শঙ্কিত। কলোনাইজেসনে দেশের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ইউরোপীয়গণ এদেশে বসতি স্থাপন করলে ও কৃষি-শিল্পে আত্মনিয়োগ করলে দেশীয় প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকবে না। তারা জাতিচ্যুত হবে, জীবিকা হতে বঞ্চিত হবে এবং জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে নিত্য বিরোধের সম্মুখীন হবে। এছাড়া দেশের অন্যান্য শ্রমজীবীদেব ক্ষতি ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথাও নানাভাবে বর্ণিত হল। চন্দ্রিকার এই প্রচারকে মিথ্যা এবং আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করার জন্য এগিয়ে এল সংবাদ কৌমুদী। ১৮৩০ সালের ১লা জানুয়ারী ও ১০ই জানুয়ারী তারিখে 'একজন নিরপেক্ষ জমিদার' স্বাক্ষরযুক্ত দুটি পত্র প্রকাশিত হল। এ দুটি পত্রে যে সুগভীর অর্থনীতিজ্ঞান এবং সুতীব্র ইতিহাস-সচেতনা প্রকাশ পেল তা বিস্ময়কর। সমগ্র পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে একদিকে জমিদারদের স্বার্থরক্ষার হীন প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে জনসমাজের কল্যাণের ছবি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হল। চন্দ্রিকার সাহায্যে এগিয়ে এল শুধুমাত্র জনবুল। কিন্তু সংবাদ-কৌমুদীর উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে অনেকেই সমর্থন জানাল। ইণ্ডিয়া গেজেটে ও হরকরায় কৌমুদীতে প্রকাশিত রচনার ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হল ; কলোনাইজেসনের সমর্থন জানাল 'বঙ্গদূত', জানাল 'রিফর্মার'।

পরবর্তীকালে রামমোহন যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন পুনরায় তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

॥ চোদ্দ ॥

রামমোহন সহমরণ বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক উৎসর্গ করেছিলেন হেষ্টিংস-পত্নীর নামে। তাঁর মনে আশা ছিল হয়ত এদেশীয় স্ত্রীলোকদের দুঃখদুর্দশার বিবরণ পাঠ করে হেষ্টিংস-পত্নীর মনে সহানুভূতির উদ্রেক হবে এবং তার ফলে স্বয়ং হেষ্টিংস সতীদাহ নিবারণে ব্রতী হবেন। কিন্তু কার্যতঃ তা হল না। ১৮২২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী গভর্নমেণ্টের পক্ষ হতে একটি আদেশ জারী করা হল। ঐ আদেশে দারোগা-পুলিশদের নির্দেশ দেওয়া হল যে তাদের থানার মধ্যে সতীদাহ হলে একজন হিন্দু বরকন্দাজ নিয়ে তারা সেখানে যাবে অথবা তাদের জমাদারদের পাঠাবে। সেখানে যে নারী সতী হবে সে যদি গর্ভবতী কিংবা নাবালিকা হয় অথবা তাকে যদি কোন রকম মাদকদ্রব্য সেবন করান হয় তাহলে তারা সেই সতীদাহ বন্ধ করে দেবে।

ইতিমধ্যে রামমোহনের সংবাদকৌমুদী প্রকাশিত হয়েছে। রামমোহন ঐ পত্রিকা মারফৎ সতীদাহের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করলেন। সংবাদকৌমুদীর সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সতীদাহের সমর্থক। তাঁর সঙ্গে রামমোহনের মতবিরোধ ঘটল। ভবানীচরণ সংবাদকৌমুদী পরিত্যাগ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে নূতন পত্রিকা প্রকাশ করলেন। চন্দ্রিকা ক্রমে রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থক হয়ে উঠল। এই কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় সতীদাহের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা আলোচনা প্রকাশ হতে লাগল। সতীদাহের প্রসঙ্গে সমস্ত দেশই তখন আলোড়িত। তাই তর্কযুদ্ধ শুধুমাত্র এই দুটি পত্রিকাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। 'জনবুল' পত্রিকাতেও বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হল। শুধু তাই নয়, ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যেও সতীদাহ আলোচনার বস্তু হয়ে উঠল। সতীদাহ প্রথার ভয়াবহ নৃশংসতার পরিচয় পেয়ে তাঁরা এই প্রথার উচ্ছেদের জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌কে চাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু এদেশীয় জনসাধারণের ধর্মে হস্তক্ষেপ করলে দেশময় বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তাই সেই বিপদের আশঙ্কায় কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ অথবা গভর্নর জেনারেল সেদিন এ প্রথার উচ্ছেদে সায় দিলেন না। গভর্নর জেনারেলের পক্ষ হতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌কে জানান হল যে

এই সমস্যাটি ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে এদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করাই যুক্তিযুক্ত। এখানকার অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রথার সমর্থক। সেদিন এই ধারণা করার যথেষ্ট কারণ ছিল। সমাচার চন্দ্রিকার মাধ্যমে এদেশের অধিকাংশ হিন্দুই সতীদাহ সমর্থনে নিজেদের মত ব্যক্ত করেছিলেন এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের মধ্যে ধনী, শিক্ষিত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব ছিল না। তাই কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ও গভর্নমেন্ট কর্তৃক পরোক্ষ উপায় হিসাবে উন্নততর শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হল। ১৮২৭ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁর 'মিনিট'-এ লিখেছেন, 'I would rathar wait a few years for the gradual consummation of this desirable event, than risk the violent and uncertain, and perhaps dangerous expedient of prohibition on the part of the government.'

লর্ড আমহার্ষ্টের পর গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। বেন্টিঙ্ক ছিলেন অনেক বেশী সাহসী এবং সহানুভূতিশীল। সতীদাহের ন্যায় একটি ভয়াবহ প্রথাকে সাম্রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে কোন ভাবী আশঙ্কার কথা চিন্তা করে সময়ের হাতে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিলেন না। তিনি এই প্রথার উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হলেন। তাই এ সম্বন্ধে তিনি দেশের বিভিন্ন অফিসারদের মত চেয়ে পাঠালেন এবং অধিকাংশ মতই এল তাঁর স্বপক্ষে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে প্রাচ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন (Horace Hayman Wilson) কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষই সমর্থন জানালেন।

১৭৫১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮২৯ সালে রামমোহন 'সহমরণ বিষয়' নামে আর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। 'ইহা 'বিপ্রনামা' এবং 'মুগ্ধবোধছাত্র' নামে দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে লিখিত। পত্রগুলি সম্ভবতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল'। রামমোহনের বক্তব্য ছিল, সমস্ত শাস্ত্রে কাম্যকর্ম নিন্দিত হয়েছে। সতীদাহ কাম্যকর্ম সুতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য অনুসারে উহা পালনীয় নয়। বিপ্রনামা ও মুগ্ধবোধছাত্রের সমস্ত বক্তব্য যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণাদির দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণ করে রামমোহন তীব্রভাবে মন্তব্য করলেন,

'চক্ষুর্মুদ্রিত হইয়া শাস্ত্রদৃষ্টি থাকিতেও কেনো কূপে পতিত হও এবং অন্যকে নিপাত কর।'

এদিকে বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি এ ব্যাপারে রামমোহনের অক্লান্ত প্রচেষ্টার পরিচয় পেয়ে তাঁকে তাঁর মতামত লিখিত-ভাবে পেশ করতে বললেন এবং রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করে সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অবশেষে ১৮২৯ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তাঁর অবিস্মরণীয় 'মিনিট' রচনা করলেন। সেখানে তিনি রামমোহনের সঙ্গে তাঁর আলোচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখলেন যে রামমোহন আইন পাশ করে সতীদাহ নিবারণ অপেক্ষা পুলিশের পরোক্ষ সহযোগিতায় ধীরে ধীরে এই প্রথার বিলোপে পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে রামমোহনের যুক্তি হল, আইন পাশ হলে জনসাধারণের পক্ষে ভুল বুঝার সম্ভাবনা বেশী। তাদের ধারণা হবে যে কোম্পানী প্রথমে তাদের ধর্মরক্ষার আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু পরে ক্ষমতায় পরিপূর্ণভাবে আসীন হওয়ার পর কোম্পনী সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে উদ্যত হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে তাদের মনে হবে যে এর পর পূর্ববর্তী মুসলমান শাসকদের ন্যায় কোম্পানীও এদেশের অধিবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কার্যে আত্মনিয়োগ করবে। এই আশঙ্কা সত্য হলেও বেন্টিঙ্ক তার জন্য পিছিয়ে গেলেন না। অসহায় হিন্দুরমণীদের কান্নাকরুণ মূর্তি তাঁকে বিচলিত করেছিল গভীরভাবে। তাই অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি উজাড় করে তিনি নিজেকে প্রকাশ করলেন: 'The first and primary object of my heart is the benefit of the Hindoos. I know nothing so important to the improvement of their future condition, as the establishment of a purer morality, whatever their belief, and a more just conception of the will of God. The first step of this better understanding will be dissociation of religious belief and practice from blood and murder...No innocent blood shall be split, there can be no exception ;···I write and feel as a Legislator for the Hindoos, and as I believe many enlightened Hindoos think and feel.'

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। সারা দেশের দরদী মানুষ ধন্য ধন্য করে উঠল। প্রশংসা করল গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে, অভিনন্দন জানাল রামমোহনের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে। সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের ভূমিকা স্মরণ করে বিদেশী মহিলা মিসেস্ মার্টিন (Frances Keith Martin) ২৬শে নভেম্বর তারিখে বেঙ্গল হরকরায় এক প্রশংসাসূচক পত্র লিখলেন। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন যে রামমোহনের অসাধারণ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই এই শুভ সূচনা সম্ভব হল ; তাই এর সবটুকু কৃতিত্ব রামমোহনেরই প্রাপ্য। এই সঙ্গে তিনি এদেশবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'in commemorating the amiable and highly politic administration of Lord Bentinck, may they never cease to remember the glowing sympathy, intelligence and fearless energy displayed through a course of eighteen years, by their great and at length successful advocate, Rammohun Roy.'

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়ে গেল। ফলে একদিকে রামমোহন ও তাঁর সমর্থকেরা উল্লসিত হলেন, অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় দারুণ বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের মতে এই আইন হিন্দুদের চরম সর্বনাশ করল। তাঁরা তৈরী হলেন প্রতিবাদের জন্য। ১৮৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা গভর্নর জেনারেলের কাছে একটি আবেদন পেশ করার জন্য গভর্নমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন নিমাইচরণ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি দে, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র ও রামগোপাল মল্লিক। সতীদাহ সমর্থন করে আবেদনে বলা হল : 'Under the sanction of immemorial usage as well as precept, Hindoo widows perform, of their own accord and pleasure, and for the benefit of their husbands' souls and for their own, the sacrifice of self-immolation called suttee, which is not merely a sacred duty but a high privilege to her who sincerely believes in

the doctrines of their religion'; এই সঙ্গে অন্যায়ভাবে ধর্মে হস্তক্ষেপ করার কথাও উল্লিখিত হল। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন মহারাজা শ্রীগিরিশচন্দ্র বাহাদুর ও অপর আটশত বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই আবেদনপত্রের সঙ্গে সতীদাহ সমর্থনে শাস্ত্রবাক্যসমূহের একটি সংকলনও যুক্ত করে দেওয়া হল। এই সংকলনপত্রে একশ কুড়িজন পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন।

গভর্নর জেনারেল আবেদনপত্র গ্রহণ করেন কিন্তু আবেদনে কোন সাড়া দেন নি। তিনি দরখাস্তকারীদের বলেছিলেন যে তাঁরা ইচ্ছা করলে এই আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে রাজার কাছে আবেদন করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি দরখাস্ত যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

গভর্নর জেনারেলের কাছে রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ের আবেদন বিফল হল। রামমোহন ও তাঁর সমর্থকদের জয় তাঁদের পীড়িত করল। আরও একটি ব্যাপারে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তা হল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। ৮ই জানুয়ারী তারিখে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডীড তৈরী হয়েছে; ২৩শে জানুয়ারী নূতন গৃহের উদ্বোধন। রক্ষণশীল সম্প্রদায় প্রমাদ গণলেন। সনাতন হিন্দুধর্মের ভাবী সর্বনাশ তাঁদের বিচলিত করল। তাঁরা শঙ্কিত হলেন, সেইসঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধও হলেন। ১৭ই জানুয়ারী (৫ই মাঘ) তারিখে 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হল। সনাতন হিন্দুধর্ম ও তার আচার-আচরণ রক্ষাই হল ধর্মসভার উদ্দেশ্য। কমিটির সদস্য হলেন—রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, তারিণী চরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ দে, গোলকনাথ মল্লিক ও নীলমণি দে। বৈষ্ণবদাস মল্লিক হলেন কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় ঠিক হল যে সতী-আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে রাজার কাছে আবেদন প্রেরিত হবে। প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের জন্য চাঁদা তোলা হবে। ধর্মসভার একটি নিজস্ব বাড়ী প্রয়োজন, কুড়ি হাজার টাকা সংগৃহীত হলে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

এদিকে সতীদাহ নিবারণের ন্যায় একটি মহৎ কার্য সম্পাদন করার

জন্য গভর্নর জেনারেলকে অভিনন্দিত করতে দেশের দরদী মানুষ উৎসাহিত হলেন। রামমোহন ও তাঁর সহকর্মীরা প্রস্তুত হলেন, অন্যদিকে খৃষ্টানদের মধ্যেও পৃথকভাবে আর একটি প্রস্তুতি চলল। ১৮৩০ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে টাউন হলে এ সম্পর্কে খৃষ্টানদের একটি সভা হল। সিভিল ও মিলিটারী বিভাগের কর্মী, মার্কেন্টাইল হাউসের সদস্য প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মিঃ জে, এম, গর্ডন। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গভর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানাবার জন্য মিঃ গর্ডনের নেতৃত্বে বহু ব্যক্তি বেলা প্রায় ১২টায় গভর্নমেন্ট হাউসে যাত্রা করল। সেখানে তাঁদের পৌঁছবার পূর্বেই এদেশীয় ব্যক্তিদের পক্ষ হতে অভিনন্দন জানাবার জন্য একটি ছোট দল অপেক্ষা করছিল। এই দলের মধ্যে ছিলেন, রায় কালীনাথ চৌধুরী, বৈকুণ্ঠনাথ রায়, সত্যকিঙ্কর ঘোষাল, কুঞ্জবিহারী রায়, হরিহর দত্ত ও রামমোহন রায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এর আগের দিন সকালে রমানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর জন্য তাঁর ভ্রাতা, রামমোহনের অন্যতম সুহৃৎ ও সহকর্মী দ্বারকানাথ ঠাকুর এখানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। গভর্নর জেনারেলের নির্দেশমত আগে দেশীয় ব্যক্তিদের আহ্বান করা হল। রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীরা দোতলায় গেলেন। সেখানে লর্ড বেণ্টিঙ্ক, লেডী বেণ্টিঙ্ক এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারগণও উপস্থিত ছিলেন। রামমোহন তাঁদের অভিপ্রায় জানালেন। কালীনাথ রায় বাংলা ভাষায় রচিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করলেন। পরে এর ইংরাজী তর্জমা পাঠ করলেন হরিহর দত্ত। এ দেশীয় ব্যক্তিদের পক্ষ হতে অভিনন্দন জানান শেষ হলে খৃষ্টানদের পক্ষ হতে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন মিঃ গর্ডন। রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীদের প্রদত্ত অভিনন্দনের বাংলা ও ইংরাজী তর্জমা এবং বেণ্টিঙ্কের উত্তর ১৮ই জানুয়ারী তারিখের গভর্নমেন্ট গেজেটের প্রথম সাপ্লিমেণ্টে প্রকাশিত হয়; মিঃ গর্ডন কর্তৃক পঠিত অভিনন্দনপত্র তৎসহ বেণ্টিঙ্কের উত্তর প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় সাপ্লিমেণ্টে।

এদিকে ধর্মসভার কাজ-কর্ম জোরের সঙ্গেই চলতে লাগল। ইংলণ্ডে রাজার কাছে সতী-আইনের বিরুদ্ধে আবেদন করার জন্য তাঁরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, দ্বারে দ্বারে যেয়ে চার পয়সা পর্যন্ত সাহায্য গ্রহণ করতে লাগলেন। এমনকি চাঁদা দিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে জ্যাতিচ্যুত করার ভয়ও

দেখাতে লাগলেন। ধর্মসভার পক্ষ হতে ইংলণ্ডে আবেদন নিয়ে যাওয়ার জন্য সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী মিঃ ফ্রান্সিস বেথিকে (Mr. Francis Bathie) নিয়োগ করা হল। আবেদনপত্রে অসংখ্য ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। শুধুমাত্র কোলকাতার অধিবাসীরাই নন, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, কাশীপুর, ভবানীপুর এমন কি যশোর, ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি জায়গার অধিবাসীরাও এবং সেই সঙ্গে বহু বিদেশী ব্যক্তিও এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। আবেদনপত্রটি ইংরাজীতে রচনা করেন স্বয়ং রাধাকান্ত দেব। ২৭শে জুলাই মিঃ বেথির ইংলণ্ড যাত্রার দিন ধার্য হয়। তাই রামমোহনও নিশ্চেষ্ট রইলেন না। তিনিও রক্ষণশীল হিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আবেদন করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁরও ইংলণ্ড যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠল।

॥ পনের ॥

এদেশে শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অজ্ঞানতার অন্ধকারই কুসংস্কারের ভিত্তিভূমি, তাই তিনি চেয়েছিলেন জ্ঞানের আলোয় প্রতিটি চিত্তকে প্রদীপ্ত করে তুলতে। শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এদেশের প্রতিটি মানুষ যেন আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় সঞ্জীবিত হতে পারে—এই ছিল তাঁর অন্তরের অভিলাষ। তাই রামমোহন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কেরীকে একখণ্ড জমি উপহার দিয়েছিলেন, এদেশে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ডেভিড হেয়ারকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন, সমস্ত অপমান নীরবে মাথা পেতে নিয়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সর্বোপরি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের জন্য গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের কাছে এক দীর্ঘ আবেদন পেশ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদেশী ইউনিটেরিয়ান-দের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং রামমোহনের এ আহ্বান বিফল হয়নি।

স্কচ মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডফ্ এলেন ১৮৩০ সালে। খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্যই স্কটল্যাণ্ড মিশনের জেনারেল এসেমব্লী কর্তৃক ডফ্ সাহেব এদেশে প্রেরিত হন; কিন্তু সেই সঙ্গে রামমোহনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারেও আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা রামমোহনের সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই সফল হয়।[১] সে সময় দেশে ইংরাজী শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন থাকলেও মিশনারীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের প্রতি হিন্দুসমাজের ভাল ধারণা ছিল না। সেখানে শিক্ষাগ্রহণ করতে গেলে ছাত্রদের পক্ষে খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী,—এই আশঙ্কায় কেউই এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতেন না। তাই ডফ্ সাহেবের স্কুল স্থাপনের পথে নানা বাধা-বিঘ্ন দেখা দিল। অগত্যা তিনি রামমোহনের শরণাপন্ন হলেন। রামমোহন সানন্দে তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ নূতন গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য Dr. George Smith রচিত Life of Alexander Duff গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তাই যেখানে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ীটি তিনি ডফের স্কুলের জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, স্কুলের প্রথম পাঁচটি ছাত্রকে তিনি নিজেই সংগ্রহ করে দেন। ১৮৩০ সালের ১৩ই জুলাই এই স্কুলের উদ্বোধন হয়। রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। ডফ্ সাহেব যখন ছাত্রদের হাতে বাইবেল দিয়ে তা পাঠ করতে বললেন তখন ছাত্রদের মধ্যে দ্বিধা দেখা দিল। এই দ্বিধা ও আপত্তি লক্ষ্য করে রামমোহন তাদের বুঝিয়ে বলেন যে ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা আর সেই ধর্মে দীক্ষিত হওয়া এক জিনিষ নয়। ডঃ উইলসন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করে হিন্দু হননি, আবার তিনি নিজেও কোরাণ ও বাইবেল উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও মুসলমান অথবা খৃষ্টান হননি। সুতরাং অমূলক আশঙ্কা না করে ছাত্রদের উচিত বাইবেল পাঠ করে তা বিচার করা। রামমোহন প্রায় একমাস প্রতিদিন দশটার সময় স্কুলে উপস্থিত হতেন এবং স্কুলের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। রামমোহনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কালীনাথ রায়চৌধুরী তাঁর স্বগ্রাম টাকীতে একটি স্কুল স্থাপনের জন্য ডফ্ সাহেবকে একটি বাড়ী ও অন্যান্য খরচপত্র সাহায্য করেন। তাই রামমোহনের সহযোগিতার কথা সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করেছেন আলেকজাণ্ডার ডফ্।

রামমোহন এদেশে ইংরাজীশিক্ষা বিস্তারে যেমন উৎসাহী ছিলেন তেমনি আবার ইউরোপীয়গণের বাংলাশিক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। তিনি জানতেন যে উভয়ে উভয়ের ভাষা সম্যক্রূপে আয়ত্ব করতে পারলে উভয়েরই মঙ্গল। ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে একের পক্ষে অন্যের কাছে আসা সহজেই সম্ভব। তাই রামমোহন ইউরোপীয়গণের জন্য বাংলাভাষার একটি ব্যাকরণ ইংরাজীভাষায় রচনা করেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৮২৬ সালে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পরবর্তীকালে রামমোহন 'The English in India should adopt Bengali as their language' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন।[১]

এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য রামমোহন শুধুমাত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি সেইসঙ্গে স্কুলপাঠ্যপুস্তকও রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন। ১৮১৭ সালে 'ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি' স্থাপিত হলে রামমোহন তার সঙ্গে সংযোগ

১। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

স্থাপন করেন। যদিও এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতা স্বয়ং রাধাকান্ত দেব, তবুও রামমোহন সমস্তরকম সহযোগিতা করতে কুণ্ঠিত হননি। উদ্দেশ্য যেখানে মহান্ সেখানে কোন সংকীর্ণতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। এই সোসাইটির তৃতীয় বিবরণ হতে জানা যায় যে রামমোহন বাংলা ও ইংরাজীভাষায় একটি ভূগোল রচনা করে প্রকাশের জন্য সোসাইটিকে অর্পণ করেন। তাছাড়া Ferguson রচিত 'Introduction to Astronomy' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কার্যও গ্রহণ করেছিলেন ; এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন মিঃ গর্ডন। সোসাইটির সপ্তম রিপোর্ট হতে জানা যায় 'The Conviction that a *Bengalee Grammar*, better adopted to the instruction of native youths than the one on their list, has led your committee to solicit the services of Baboo Rammohun Roy in preparing one ; they are happy to report, that this gentleman has cheerfully engaged to give his immediate attention to the execution of this work.' স্কুল-বুক সোসাইটির অভিপ্রায়ে রামমোহন সানন্দে বাংলাভাষায় ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাকরণের নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। সোসাইটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাসে, রামমোহন তখন ইংলণ্ডে। এই গ্রন্থের প্রথমে সোসাইটি কর্তৃক একটি ভূমিকা সংযুক্ত হয়েছিল। ঐ ভূমিকায় বলা হয়: 'সর্ব্বদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ যদ্দ্বারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনাপূর্ব্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে সম্যক্‌রূপে রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালকদিগ্যে আপন ভাষাব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষাতে শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে অন্য অন্য ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে। এ কারণ স্কুল-বুক সোসাইটির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় ঐ গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণ তদ্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমনসময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপিমাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পুনর্দ্দৃষ্টিরও সাবকাশ হয় নাই, পরে যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ ও বিবেচনার ভার স্কুল-বুক সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন, তেঁই যত্নপূর্ব্বক সম্পন্ন করিলেন।' ৯৭ পৃষ্ঠার এই পুস্তকে রামমোহন যতদূর সম্ভব বিশদভাবে সমস্ত বিষয় আলোচনা

করেছেন। সে-সময়ে এই পুস্তক উৎকৃষ্ট ব্যাকরণহিসাবে সর্বত্র আদৃত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে রামমোহনের অবদান স্মরণীয়। একথা সত্য যে বাংলাগদ্যের চর্চা রামমোহনের পূর্বেই শুরু হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশনারীরা এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা গদ্য চর্চায় রামমোহনের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। সাধারণপাঠ্যগ্রন্থের তিনিই প্রথম রচয়িতা। সাধারণের মধ্যে গদ্যগ্রন্থ পাঠের অভ্যাস না থাকার জন্য যখন তিনি কোলকাতায় এসে প্রথম বেদান্তের অনুবাদ প্রকাশ করলেন তখন সেখানে বাংলাগদ্যের অন্বয়রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের যে রূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের এরকম লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে বুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা বুৎপন্ন লোকের সহিত বসবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। জে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন জে হেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না……।'

বাংলা গদ্যের অনুদ্ঘাটিত পথে রামমোহন সুগভীর নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অগ্রসর

হয়েছিলেন। সেদিন সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে তিনি শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে ব্রতী হন এবং আপন প্রতিভার মোহনস্পর্শে তা সাধারণের বোধগম্য করে তোলেন। রামমোহনই বাংলা ভাষায় ভাবগভীর প্রবন্ধরচনার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তকগুলির মধ্যে এই ভাষা নূতন মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর গুরুত্বে এবং প্রকাশভঙ্গীর দৃঢ়তায়, ঋজুতায় ও স্বচ্ছতায় রামমোহনের গদ্য এক লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। সংস্কৃতশব্দের বাহুল্যবর্জিত, আড়ষ্টতাহীন, সতেজ ও সাবলীল গদ্যের রচয়িতা হিসাবে বাংলাসাহিত্যে রামমোহনের স্থানটি সুচিহ্নিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রাণিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।' তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে, রামমোহন বাংলা গদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা।

এই প্রসঙ্গে রামমোহনের ব্রহ্মসংগীতগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর শাস্ত্রবিচার সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি অতি উচ্চ দার্শনিক বিষয়বস্তুর জন্য এবং অতিরিক্ত বিচার-বিশ্লেষণের জন্য অনেকক্ষেত্রে কিছুপরিমাণে নীরস এবং উন্নততর শিল্পকর্মের পরিপন্থী। কিন্তু ব্রহ্মসংগীতগুলির মধ্যে রামমোহনের কবিমন এক আশ্চর্য-সুন্দর শিল্পসুষমায় নিজেকে প্রকাশ করেছে। ভাবকল্পনার ঐশ্বর্যে ও প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্যে এই সংগীতগুলি বাংলাসাহিত্যের এক বিশিষ্ট এবং অভিনব সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত এরই চরমতম এবং সার্থকতম পরিণতি।

॥ ষোল ॥

রামমোহনের কর্মজীবন যেমন বিচিত্র ও বিপুল, তেমনি সংঘাত-সংকুল। কর্ম-জীবনের এই সংঘাত তাঁর পারিবারিক জীবনকে জটিল করে তুলেছিল। তাই সুখী, নির্বিবাদী জীবনের মসৃণ পথে অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। নিরন্তর দুঃখ ও অশান্তির দুঃসহ গুরুভার তাঁকে পীড়িত করেছিল গভীরভাবে।

রামমোহন ১৮১৪ সালের মাঝামাঝি রংপুর ত্যাগ করে কোলকাতায় আসেন। ঐ বৎসরের শেষের দিকে তিনি লাঙ্গুলপাড়ায় তাঁর পৈতৃক বাড়ীর অংশ ভাগিনেয় গুরুদাসকে দান করেন। ইতিমধ্যে কোলকাতায় তিনি দুটি বাড়ী ক্রয় করেন; তাছাড়া লাঙ্গুলপাড়ার নিকটবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে একটি বাগান ও বাড়ী তৈরী শুরু করেন। কোলকাতার জীবনে রামমোহন যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচারে ও শাস্ত্রবিচারে নিযুক্ত হলেন, তখন শুধুমাত্র হিন্দুসমাজে নয়, তাঁর পরিবারের মধ্যেও দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাঁর জননী, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়রাও তাঁর সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করলেন, এমনকি তাঁর ক্ষতিসাধনেও সচেষ্ট হলেন। ফলে ১৮১৭ সালের জানুয়ারী মাসে রামমোহন তাঁর পরিবারসহ লাঙ্গুলপাড়া হতে রঘুনাথপুরের নূতন বাড়ীতে চলে এলেন; রঘুনাথপুরের বাড়ী তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এর কয়েকমাস পরে, অর্থাৎ ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়।[১] রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ উভয়েরই জননী হলেন রামমোহনের দ্বিতীয় স্ত্রী শ্রীমতিদেবী; তৃতীয় স্ত্রী উমাদেবী ছিলেন নিঃসন্তান।

এরপর রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ ১৮১৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে কোলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি ডিভিসনে রামমোহনের নামে একটি মামলা রুজু করেন।[২] গোবিন্দপ্রসাদের বক্তব্য হল: রামমোহন যে-সকল বিষয়সম্পত্তি

১। মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'সেকালের লোক' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। এই মামলার বিস্তারিত বিবরণের জন্য রমাপ্রসাদ চন্দ্র ও যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত Selections from Official Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ভোগদখল করছিলেন তা রামমোহনের নিজস্ব নয় ; হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের সম্পত্তি। এতে তাঁর পিতা জগমোহনেরও অংশ ছিল। সুতরাং পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে এই সমস্ত সম্পত্তিতে তাঁরও অংশ আছে। রামমোহন গোবিন্দপ্রসাদের এ দাবী সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য হল : রামকান্ত তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার পর হতে রামমোহন সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বাস করছিলেন। পিতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি ব্যাপারে তাঁর কোন যোগ ছিল না। সমস্ত সম্পত্তিই তিনি তাঁর স্বোপার্জিত অর্থে ক্রয় করেন। সুতরাং এই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তিতে গোবিন্দপ্রসাদের কোন অংশ থাকতে পারে না। এই মামলায় রামমোহনের পক্ষে তাঁর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র গুরুপ্রসাদ রায় ও রামতনু রায়, ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, হুগলী জেলার প্রভাবশালী জমিদার রাজীবলোচন রায়, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী এবং রামমোহনের কয়েকজন কর্মচারী সাক্ষী ছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষের সাক্ষীরা সকলে হাজির হননি। সাক্ষ্য-তালিকাভুক্ত সতের জনের মধ্যে মাত্র পাঁচজন উপস্থিত হয়েছিলেন। রামমোহন-জননী তারিণীদেবীও ছিলেন গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষের একজন সাক্ষী ; কিন্তু তিনি উপস্থিত হননি। মামলা খরচসহ ডিসমিস হয়ে গেল। কোর্টের রায় হল ১৮১৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে।

রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস ও প্রচারকার্য তারিণীদেবীর পৌত্তলিক মনের সংস্কারে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। তাই বিধর্মী রামমোহনের সর্বনাশই হল তাঁর চরম লক্ষ্য। এরই জন্য পৌত্র গোবিন্দপ্রসাদকে তিনি রামমোহনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার জন্য প্ররোচিত করেন। আদালতে সাক্ষী দিতে তারিণীদেবী উপস্থিত হননি। কিন্তু তাঁকে জেরা করার জন্য রামমোহনের পক্ষ হতে যে সমস্ত প্রশ্ন তৈরী করা হয়েছিল তার মধ্যে এর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সেই সমস্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে কয়েকটি হল : 'আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যেভাবে হিন্দুধর্মের পূজা অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ার প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই ? আপনি, বাদী এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই ? আপনি কি

বারবার বলেন নাই যে, আ নি রামমোহনের সর্বনাশ সাধন করিতে চান, এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্বনাশ সাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্ব সমক্ষে বলেন নাই, যে হিন্দু প্রতিমা পূজা ত্যাগ করে, তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? হিন্দুধর্মের প্রতিমা পূজা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই? বাদী, আপনি ও বিবাদীর অন্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কি এই বিষয়ে পরামর্শ হয় নাই? ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে বিবাদী যদি আপনার ইচ্ছা ও অনুরোধ এবং পূর্বপুরুষের প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন, তাহা হইলে এই মকদ্দমা হইত না—একথা আপনার জ্ঞান বিশ্বাস মত শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি? বিবাদী প্রতিমা পূজা বজায় রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে সর্বস্বান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য করা, এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কি আপনার বিবেক বুদ্ধিতে অনুচিত নয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না? এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতাস্থ সিমলার বাড়ীতে আসিয়া কি বিগ্রহ সেবার জন্য কিছু জমি চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্তে দরিদ্রের সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমা পূজার জন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই?'

তারিণীদেবী পরে বুঝেছিলেন যে এতদূর অগ্রসর হওয়া ঠিক হয়নি। রামমোহন প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন একথা সত্য, কিন্তু এও সত্য যে আদালতে শপথ করে তাঁর নামে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া ধর্মপ্রাণা তারিণীদেবীর পক্ষে অসম্ভব। রাগে, বিদ্বেষে, অভিমানে, উত্তেজনায় গোবিন্দপ্রসাদকে তিনি এক সময় সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু এটা যে কতখানি অন্যায় সে-সত্য পরে তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। তাই তিনি আদালতে উপস্থিত হননি। শুধু তাই নয়, এই ব্যাপারের পর তিনি সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এই মামলা ডিসমিস হয় ১৮১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৮২০ সালে তিনি সংসার ত্যাগ করে সম্পূর্ণ একাকী পুরীধামে চলে যান। সেখানে তিনি নিত্য মন্দির প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতেন। দু'বৎসর পরে ১৮২২ সালের ২১ শে এপ্রিল তারিখে বৈষ্ণবের সেই পুণ্যতীর্থে তারিণীদেবীর

মৃত্যু হয়। সমস্ত বিরোধ-সংঘাতের মাঝেও তারিণীদেবীর প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধা ছিল অটুট এবং সংসার হতে বিদায় নিয়ে পুরী যাওয়ার সময় জননী তারিণী-দেবীও পুত্র রামমোহনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ডাঃ কার্পেন্টারের লেখায় এর উল্লেখ আছে।

এর কিছুদিন পরে রামমোহনের দ্বিতীয় স্ত্রী শ্রীমতিদেবীর মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতি দেবীর কঠিন পীড়ার সংবাদ আসিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাধাপ্রসাদকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং এই কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যদি তোমার মাতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া দেখ, অতিশীঘ্র আমাকে সংবাদ দিবে; আর যদি তিনি মৃত্যুমুখে পতিতা হন, তবে কোনক্রমে তাঁহার মুখাগ্নি করিও না। অল্পকাল পরেই শ্রীমতিদেবীর মৃত্যুসংবাদ আসিল।'

রামমোহনের নামে মামলা রুজু করার পর তারিণীদেবীর ন্যায় গোবিন্দপ্রসাদও অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাই পরে ক্ষমা প্রার্থনা করে পিতৃব্য রামমোহনকে তিনি একটি পত্র লেখেন। পত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

শ্রীকৃষ্ণ শরণং

সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দেব শর্ম্মণঃ প্রণামা পরার্দ্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্য অন্য লোকের কথা প্রমাণ মহাশয়ের নামে হিস্য পাইবার প্রার্থনায় শুপরেম কোর্টে একুইটিতে অযথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাশয়েরও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্য্যাদা করিয়া জদি আমাকে নিকটে জাইতে অনুমতি করেন তবে আমি নিকট পৌছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি।

শ্রীচরণাম্বুজেষু ইতি।—

সন ১২২৬ সাল তাং ১৪ কার্ত্তিক।

গোবিন্দপ্রসাদের এই পত্রের উত্তরে রামমোহন কী লিখেছিলেন তা জানা যায় নি,

কিন্তু গোবিন্দপ্রসাদের এ অনুতাপ যে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তার প্রমাণ আছে। আসলে মামলা রুজু করার পশ্চাতে তারিণীদেবী ও গোবিন্দপ্রসাদের উদ্দেশ্য এক ছিল না। গোবিন্দপ্রসাদ শুধুমাত্র ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারেই উৎসাহিত হননি, সেইসঙ্গে ধনী পিতৃব্যের সম্পত্তির প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন লোভও তাঁর ছিল। তাই তারিণীদেবী শ্রীক্ষেত্রে চলে যাওয়ার পর ১৮২১ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে রামমোহনের নামে আর একটি মামলা রুজু করা হল।[১] এবারে বাদী হলেন গোবিন্দপ্রসাদের জননী দুর্গাদেবী। দুর্গাদেবীর পক্ষে মামলা করা কোনমতেই সম্ভব হত না যদি এ বিষয়ে গোবিন্দপ্রসাদের পূর্ণ সমর্থন না থাকত। দুর্গাদেবীর আর্জি হল, তিনি রামমোহনকে ৪৫০০ টাকা ধার দিয়েছিলেন এবং সেই টাকায় রামমোহন গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর নামে দুটি তালুক ক্রয় করেন এবং ঐ তালুক দুটি তিনি লিজ হিসাবে ব্যবহার করেন। এখন লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ায় তালুকদুটি দুর্গাদেবী দাবী করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে রামমোহন তাঁর জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি দুর্গাদেবীর দাবী অস্বীকার করে বলেন যে সম্পূর্ণভাবে স্বোপার্জিত অর্থেই তিনি ঐ দুটি তালুক ক্রয় করেন এবং দুর্গাদেবীর কাছে কোনদিন তিনি অর্থ ধার করেননি। দুর্গাদেবী তাঁর দাবী প্রমাণ করার জন্য একটিও সাক্ষীকে আদালতে হাজির করতে পারলেন না। তাই ১৮২১ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে মামলা খরচসহ ডিসমিস হয়ে গেল।

এই সমস্ত মামলায় গোবিন্দপ্রসাদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয় এবং তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। যদিও তিনি বারবার রামমোহনকেই আঘাত দিতে চেয়েছিলেন তবুও শেষ পর্যন্ত তাঁকে রামমোহনেরই শরণাপন্ন হতে হয়। রামমোহন ভ্রাতুষ্পুত্রের দুরবস্থার পরিচয় পেয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। তাঁর পূর্বতন মনিব ও বন্ধু জন ডিগবী তখন ইংলণ্ড হতে ফিরে এসে বর্ধমানের কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। রামমোহন গোবিন্দপ্রসাদের চাকরির জন্য ডিগবীকে অনুরোধ করেন। বোর্ড অব রেভিনিউকে লিখিত ডিগবীর এক চিঠিতে এর উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, 'Gobindaprasad Roy his cousin···ruined himself by an unsuccessful lawsuit in the Supreme Court

১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য রমাপ্রসাদ চন্দ্র ও যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত Selections from Official Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

which he had carried on during my absence in Europe against his uncle Rammohun Roy, the latter, after my return, from compassion for his nephew's distress was induced to request me to give him a situation to keep him from starving.' ডিগবী রামমোহনের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। ১৮২২ সালে গোবিন্দপ্রসাদ বর্ধমানে আবগারী বিভাগে তহসিলদার নিযুক্ত হন। তাঁর জামিনদার হন দ্বারকানাথ ঠাকুর। এব্যাপারেও রামমোহনের সুপারিশ সহজেই অনুমেয়।

এই পর্বে আরও একটি মামলায় রামমোহন জড়িয়ে পড়েন। বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ তাঁর কাছে রামকান্তর তিনটি কিস্তিবন্দীর দরুণ টাকা দাবী করে ১৮২৩ সালের ১৬ই জুন তারিখে কোলকাতা প্রভিন্সিয়াল কোর্টে রামমোহন ও গোবিন্দপ্রসাদের নামে তিনটি মামলা রুজু করেন। জবাবে রামমোহন বলেন যে তাঁর পিতা রামকান্তর দেনা অথবা কিস্তিবন্দী সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না, তাছাড়া তিনি ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্নতার জন্য রামকান্তর জীবদ্দশা হতেই পৃথকভাবে বাস করেন; রামকান্তর মৃত্যুর পরও তিনি পিতার কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে গ্রহণ করেননি। সুতরাং রামকান্তর দেনা পরিশোধ করতে তিনি দায়ী নন। মামলাটি প্রভিন্সিয়াল কোর্টে খরচসহ ডিসমিস হয়ে যায়। পরে তেজচাঁদ সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করেন। এবারেও মামলার ফল একই হয়। ১৮৩১ সালের ১০ই নভেম্বর যখন রায় প্রকাশ হয়, রামমোহন তখন ইংলণ্ডে।

রামকান্তর দেনার জন্য তাঁর মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে রামমোহনের নামে নালিশ করার পশ্চাতে অন্য কারণ ছিল। রামমোহনকে যে কোন প্রকারে হয়রান ও ক্ষতিগ্রস্ত করাই ছিল তেজচাঁদের আসল উদ্দেশ্য। রামমোহন তাঁর জবাবে এ বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস তেজচাঁদের পুত্র প্রতাপচাঁদের দেওয়ান ছিলেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদ্বয়ের সঙ্গে যখন বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা ব্যাপারে তেজচাঁদের মামলা হয়, তখন গুরুদাস প্রতাপচাঁদের পত্নীদ্বয়ের পক্ষ অবলম্বন করেন। যেহেতু গুরুদাসের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ছিল সেইজন্য তেজচাঁদের ধারণা হয়েছিল যে এ ব্যাপারে গুরুদাস

রামমোহনের পরামর্শে চালিত। এই আক্রোশের ফলেই তেজচাঁদ রামমোহনের নামে মামলা রুজু করেন। তেজচাঁদের এই সন্দেহের সমর্থনে আর একটি প্রমাণ আছে। এই মামলা শুরু হওয়ার পর ১৮২৩ সালের ১৮ই নভেম্বর তেজচাঁদ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রার্থনা জানিয়ে গভর্নর জেনারেলের কাছে একটি আবেদন করেন। ঐ আবেদনে তিনি কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছিলেন, যাঁরা তাঁর মৃত পুত্রের পত্নীদ্বয়কে মামলাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্ররোচিত করেছিলেন। তেজচাঁদ কর্তৃক উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুদাস ও রামমোহনের নাম দেখা যায়। সুতরাং এই মামলার মূল কারণ যে কোথায় নিহিত তা সহজেই অনুমেয়।

তেজচাঁদের আক্রোশের শেষ এখানেই নয়। এর পর এক গভীর চক্রান্ত সৃষ্টি করে রামমোহনকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ করার চেষ্টা করা হয়। রামমোহনের প্রথম পুত্র রাধাপ্রসাদ বর্ধমান কালেক্টরীতে সেরেস্তাদারের কাজ করতেন। এই চক্রান্তের ফলে তিনি কোম্পানীর এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা আত্মসাতের মামলায় জড়িয়ে পড়েন। ১৮২৫ ও ১৮২৬ এই দুবৎসর নানা অশান্তি ও দুর্ভোগের পর তিনি এই অপবাদ হতে অব্যাহতি পান। যদিও রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে এব্যাপারে জড়িত ছিলেন না, তবুও পুত্রের এই অযথা দুর্ভোগে তিনি যথেষ্ট মনঃকষ্ট পান এবং গভীরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৮২৮ সালের ২৩শে জুলাই গভর্নর জেনারেলের কাছে একটি আবেদনে রাধাপ্রসাদ রামমোহনের এই সময়কার অবস্থার উল্লেখ করে লেখেন ; '...from the effect of which he could not recover even after a year and a half, as certified by his medical attendant Mr. Alexander Halliday.'

মামলা-মকদ্দমার পর্ব শেষ হল, কিন্তু শেষ হল না অশান্তির আর দুর্ভোগের। শান্ত, নির্বিবাদী জীবনের মসৃন পথে তিনি যাত্রা করেন নি ; কর্মজীবনে বিরোধ-সংঘাতকে বরণ করে কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তাই কাঁটার আঘাতে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছিল, যদিও আঘাত পেয়েও অটল ছিলেন তিনি। কর্মজীবনের শুরু থেকেই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আক্রমণে তিনি যথেষ্ট বেদনা পেয়েছিলেন। সেই আক্রমণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারপর যখন সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়ে গেল এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হল তখন প্রচণ্ড ক্রোধে

সেই আক্রমণ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপক্ষ হিসাবে ধর্মসভা গড়ে উঠল। রামমোহনকে সকলের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চলতে লাগল, আর সেই প্রচেষ্টায় সমগ্র দেশটাই হয়ে উঠল আশ্চর্যভাবে সরব। দেশের এই আলোড়িত অবস্থার একটি বর্ণনা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর History of the Brahmo Samaj গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমসাময়িক পত্রপত্রিকাতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। নদীর ধারে স্নানের ঘাটে, হাটে-বাজারে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বৈঠকখানায়, সর্বত্রই ঐ একই আলোচনা। রামমোহনকে ব্যঙ্গ করে ছড়া রচিত হল, গান বাঁধা হল, আর তা মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল কোলকাতা ছাড়িয়ে সারা দেশে। এক বিরাট সম্প্রদায়ের ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ঘৃণা আর ক্রোধ লক্ষ তীরের তীক্ষ্ণতায় রামমোহনকে বিদ্ধ করতে লাগল।

শুধু এই নয়; রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় রামমোহনের চরম সর্বনাশ করার জন্য ব্রতী হলেন। তাঁরা রামমোহনের প্রাণসংহারের চেষ্টা করতে লাগলেন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল; তাই রামমোহনও বাধ্য হয়ে সতর্ক হলেন। ১৮৩০ সালের প্রথমদিকে তিনি এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে মিঃ মণ্টাগোমারি মার্টিন (Mr. Montagomari Martin) নামে জনৈক ইংরাজ ব্যক্তির শরণাপন্ন হন। মিঃ মার্টিন ছিলেন 'বেঙ্গল হেরাল্ড' নামক পত্রিকার সম্পাদক। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও নীলরতন হালদারের সঙ্গে রামমোহনও ছিলেন এই পত্রিকার একজন স্বত্বাধিকারী। মিঃ মার্টিন রামমোহনের অনুরোধে তাঁর বাড়ীর একটি ঘর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে তোলেন। আগ্নেয় অস্ত্র, বারুদ এবং ছোরা সংগ্রহ করা হল এবং বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য বরকন্দাজ নিযুক্ত করা হল। তাদের রীতিমত বন্দুক ছোঁড়াও শেখান হল। রামমোহন যখন বাইরে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে থাকতেন মিঃ মার্টিন ও অন্যান্য দেহরক্ষীগণ; সেই সময় সকলের কাছেই থাকত প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র।

রামমোহন যখন প্রথম কোলকাতায় বসবাস করতে আসেন তখন তিনি ছিলেন প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক। কোলকাতার ধনীসমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। কোলকাতায় তিনি 'বেনিয়ান'-এর কাজ করতেন; সে কালের সুপ্রীম

কোর্টের জুরির তালিকায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও কোলকাতার জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে স্বদেশের হিতার্থে একদিকে যেমন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, অন্যদিকে অর্থব্যয়ও করেছিলেন অকাতরে। তাই এই সময় তাঁর অত্যধিক অনটন দেখা যায়। ১৮৩০ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর মাণিকতলার বাড়িটি বিক্রয় হয়। ৯ই জানুয়ারী তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-এ এ সম্বন্ধে একটি নিলাম ইস্তাহার মুদ্রিত হয়। তাতে লেখা ছিল : 'ইশতেহার। স্থাবর ধন পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক। সন ১৮৩০ সালে আগামি ২১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার টালা কোম্পানী সাহেবরা তাহাদের নীলাম ঘরে নীচের লিখিত স্থাবর ধন পবলিক অক্সেনে অর্থাৎ নীলাম করিবেন বিশেষতঃ অপর সর্ক্যুলর রোড সিমলায় মাণিকতলাস্থিত বাটি ও বাগান যাহাতে এক্ষণে বাবু রামমোহন রায় বাস করেন। ঐ বাটীর উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান ছয় কামরা দুই বারান্দা ও নীচের তালায় অনেক কুটরী আছে এবং ঐ বাটীর অন্তঃপাতি গুদাম ও বাবুর্চিখানা ও আস্তাবল প্রভৃতি আছে এবং ১৫ বিঘা জমীর এক বাগান ঐ বাগানে অতি উত্তম সমভূমি ও পাকারাস্তা ও তাহাতে নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে ঐ বাগান কলিকাতা সীমার মধ্যস্থ গবর্নমেণ্ট হৌস হইতে গাড়িতে বিশ মিনিটে পঁহুছান যায়।'[১] ঐ বৎসর ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে বন্ধু রাজীবলোচন রায়ের কাছে রামমোহন একটি ডিক্রি বিক্রয় করেন। ১৮১৭ সালে হুগলী জেলার জাহানাবাদ পরগণার লাট গোপালনগর বন্ধক রেখে হয়দর বখ্শ চৌধুরীকে তিনি ৬০০০টাকা কর্জ দেন। ঐ দেনা পরিশোধ না করার জন্য ১৮২০ সালের ডিসেম্বর মাসে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করে রামমোহন ৭২০৪ টাকার ডিক্রি পান। কিন্তু এই ডিক্রি জারী না হওয়ায় ১৮৩০ সালে আরও দশ বৎসরের সুদ সমেত মোট ১৪২০৮ টাকা হয়। রামমোহন ৮৬০০ টাকায় ঐ ডিক্রিটি রাজীবলোচনকে বিক্রয় করেন। তাঁর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি হয় যে রাজীবলোচন যদি সম্পূর্ণ টাকা আদায় করতে সক্ষম হন তাহলে সমস্তই তিনি গ্রহণ করবেন, আর যদি কিছুই আদায় করতে না পারেন তাহলে রামমোহনের কাছে টাকা দাবী করতে পারবেন না।[২] এই অবস্থায় রামমোহনের ইংলণ্ড যাওয়ার সময় হল। পাথেয়ের

১। সংবাদ পত্রে সেকালের কথা।

২। ১৩৪২ সালের ভাদ্রমাসের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় এই দলিলের একটি ফটোষ্টাট কপি মুদ্রিত আছে।

জন্য এবং সতীদাহ সম্পর্কে রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ের আবেদনের বিরুদ্ধে পাল্টা আবেদন করার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু রামমোহন এই মহৎ কার্যের জন্য অর্থ সাহায্য গ্রহণে রাজী হলেন না; তিনি ধন্যবাদের সঙ্গে তা ফিরিয়ে দিলেন। অথচ এই সময় তাঁর নিজস্ব অর্থ যথেষ্ট ছিল না।

কোলকাতার জীবনে রামমোহন কিছু সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বেশী পেয়েছিলেন নিন্দা ও নির্যাতন। আত্মীয়-স্বজন, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ সকলে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এরপর যখন রামমোহনের ইংলণ্ড গমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল তখন সমগ্র দেশের ঘৃণা ও নিন্দা অকস্মাৎ উত্তাল হয়ে উঠল। একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ সন্তান সমুদ্রযাত্রা করবেন, ম্লেচ্ছদের দেশে উপস্থিত হবেন, এসংবাদে ক্রুদ্ধ সমাজ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হল। সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুতির ভয় দেখাল, সম্পত্তিচ্যুতির ভয় দেখাল এবং নিন্দা ও কুৎসিত মন্তব্যে বিদ্ধ করল তাঁকে। সমাচার চন্দ্রিকার পৃষ্ঠায় সেই বিদ্বেষ শালীনতার সীমা অতিক্রম করল। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আপন প্রতিজ্ঞায় অটল রামমোহন এগিয়ে গেলেন তাঁর দুশ্চর সাধনার দুর্গম পথে; স্বদেশের হিত-কামনায় ইংলণ্ড যাওয়ার জন্য সাগরে পাড়ি দিলেন তিনি। উদার বিস্তৃত সফেন সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে উনিশ শতকে এই প্রথম বাঙালীর অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল; বিশ্বমৈত্রীর পথে এই তার প্রথম অভিযান।

তৃতীয় পর্ব

॥ এক ॥

রামমোহন ইংলণ্ড রওনা হলেন ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে। কিন্তু এ বাসনা তাঁর বহুদিনের। দীর্ঘদিন আগে যখন তিনি ডিগবীর সঙ্গে থাকতেন, তখন হতেই তাঁর মনে এ ইচ্ছা জাগে। ডিগবীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এবং ইংরাজী পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে ইংলণ্ড দেখার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তাই কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁরাই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর এই বাসনার কথা উল্লেখ করেছেন। রামমোহন নিজেও ১৮১৬-১৭ সালে লণ্ডনে ডিগবীকে লিখিত পত্রে এ বিষয় জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'But you may depend upon my setting off for England within a short period of time; and if you do not return to India before October next, you will most probably receive a letter from me, informing you of the exact time of my departure for England, and of the name of the vessel on which I shall embark.' কিন্তু জাহাজের নাম জানিয়ে দ্বিতীয় পত্র লেখা সেদিন রামমোহনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। স্বদেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণচিন্তা তাঁর দিনরাতের প্রতিটি মুহূর্ত এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে একথা চিন্তা করার অবকাশ ছিল না তাঁর।

প্রায় বার বৎসর এই ভাবেই কাটল। এরপর অকস্মাৎ একটি সুযোগ এল। দিল্লীর বাদশা তাঁর নিজের প্রয়োজনে রামমোহনকে ইংলণ্ড পাঠাতে মনস্থ করলেন।[১] দিল্লীর সিংহাসনে দ্বিতীয় আকবর তখন নামেমাত্র বাদশা। কোম্পানী তাঁকে যে বৃত্তি দিত তা সন্ধির সর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট বৃত্তি অপেক্ষা অল্প এবং তাঁর প্রয়োজনের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। এই অল্প পরিমাণ বৃত্তিতে তাঁর সমস্ত অভাব পূরণ না হওয়ার জন্য অর্থাভাবে তিনি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করছিলেন। তাই তিনি ইংলণ্ডে রাজার কাছে এ বিষয়ে আবেদন করার সংকল্প করেন। তাঁর এই দৌত্যকার্যের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দিল। রামমোহনের

১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত Raja Rammohun Roy and the Last Moghuls গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

খ্যাতি তখন দেশময় পরিব্যাপ্ত ; তাছাড়া তাঁর ইংলণ্ড গমনের বাসনাও লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই বাদশার প্রতিনিধি দবিরউদ্দৌলা ১৮২৮ সালে কোলকাতায় রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই দৌত্যকার্যের বিষয় জানান। রামমোহন সানন্দে সম্মত হন। বাদশার ইচ্ছানুসারে তিনি ইংরাজী ও ফারসী ভাষায় আবেদনপত্র প্রস্তুত করেন। ১৮২৯ সালের আগষ্ট মাসে বাদশা রামমোহনকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে দৌত্যকার্যের উপযোগী ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রদান করেন। কিন্তু এই সময় সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনে রামমোহন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে ডিসেম্বর মাসে এ সম্বন্ধে আইন পাশ হয়ে গেল। দেশময় একটা বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হল ; তাই আপাততঃ রামমোহনের ইংলণ্ড যাত্রা স্থগিত হয়ে গেল। এরপর রক্ষণশীল হিন্দুগণ যখন এই আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন রামমোহনও পুনরায় ইংলণ্ড যাত্রার জন্য তৈরী হলেন।

দিল্লীর বাদশা রামমোহনকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন এবং 'রাজা' উপাধি প্রদান করেছিলেন। রামমোহন তা অনুমোদনের জন্য ১৮৩০ সালের ৮ই জানুয়ারী গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন করলেন। আবেদনে তিনি লিখেছেন, 'His Majesty, however, being of opinion that it is essentially necessary for the dignity of His Royal House that I, as the representative thereof to the most powerful Monarch in Europe, and Agent for the settlement of His Majesty's affairs with the Honourable East India Company, should be invested with the title above mentioned, has graciously forwarded to me a seal engraved for the purpose at Delhi. I therefore take the liberty of laying the subject before your Lordship, hoping that you will be pleased to sanction my adoption of such title accordingly.' কিন্তু ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এই আবেদনের উত্তরে সেক্রেটারী জানালেন যে সকৌন্সিল গভর্নর জেনারেল রামমোহনকে দিল্লীর বাদশার দূত হিসাবে স্বীকার করলেন না এবং তাঁর উপাধিও অনুমোদন করলেন না। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে। দিল্লীর বাদশার

আবেদন প্রস্তুত করার সময় রামমোহন গভর্নমেণ্টের নিকট কয়েকটি সরকারী নথিপত্র প্রার্থনা করেন, কিন্তু গভর্নমেণ্ট তা দিতে অস্বীকার করে। এরপর 'জনবুল' পত্রিকা মন্তব্য করে যে রামমোহন সরকারী অফিসে ঘুষ দিয়ে ঐ সমস্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করেছেন। রামমোহন এই মিথ্যা অপবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধানের জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। দিল্লীর রেসিডেণ্টের উপর এই অনুসন্ধানের ভার অর্পিত হয়। কিন্তু অনুসন্ধানের পর তিনি তাঁর রিপোর্টে রামমোহন সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি।

যাই বা হোক, গভর্নমেণ্ট যখন রামমোহনকে দিল্লীর বাদশার দূত হিসাবে অনুমোদন করলেন না, তখন তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগেই যাওয়া মনস্থ করলেন। এ বিষয়ে তিনি গভর্নর জেনারেলকে লিখেছেন, 'I am now resolved to proceed to that land of liberty by one of the vessels that will sail in November, and from a due regard to the purport of the late Mr. Secretary Stirling's letter of 15th January last, and other considerations, I have determined not to appear there as the Envoy of His Majesty Akbar the Second, but as a private individual.'

রামমোহন যখন প্রথম ইংলণ্ড যাওয়ার বাসনা করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষায় ও সভ্যতায় উন্নত একটি দেশকে প্রত্যক্ষ করা এবং সেখানে জ্ঞানার্জন করা। কিন্তু পরবর্তীকালে কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য তাঁকে বিলাতযাত্রায় প্রণোদিত করে। প্রথমতঃ, দিল্লীর বাদশার দৌত্যকার্য; দ্বিতীয়তঃ, সতীদাহ নিবারণ আইনের প্রতিবাদে রক্ষণশীল হিন্দুদের আবেদনের বিরুদ্ধে পাল্টা আবেদন এবং তৃতীয়তঃ, কোম্পানীর সনন্দ আইন। ১৮১৩ সালের সনন্দ আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মেয়াদ বিশ বৎসর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ১৮৩৩ সালে। এই সময় আবার নূতন সনন্দ পাশ হবে। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে তা একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে ঐ সময়ে রামমোহন ইংলণ্ডে উপস্থিত থাকার বাসনা করেন। তাই ইংলণ্ড-যাত্রা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'My expectation having

been at length realised, in November 1830, I embarked for England, as the discussion of the East India Company's charter was expected to come on, by which the treatment of the natives of India, and its future government, would be determined for many years to come, and an appeal to the King in Council, against the abolition of the practice of burning widows, was to be heard before the Privy Council; and His Majesty the Emperor of Delhi had likewise commissioned me to bring before the authorities in England certain encroachments on his rights by the East India Company.'

রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে রইল পাচক রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, দুজন ভৃত্য রামহরি দাস ও সেখ বক্সু এবং দ্বাদশ বৎসরের বালক রাজারাম। ১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে তাঁর সঙ্গীরা কোলকাতা হতে 'আলবিয়ন' নামক জাহাজে রওনা হল। 'আলবিয়ন' পালের জাহাজ, তার গতি মন্থর। রামমোহন ১৯শে নভেম্বর সকাল দশটায় 'ফর্বস' নামক দ্রুতগতি ষ্টীমারে রওনা হয়ে পরের দিন সকালে খাজুরিতে ইংলণ্ডগামী 'আলবিয়নে' ওঠেন। প্রায় ১৫ জন এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ষ্টীমারে তাঁর সঙ্গে খাজুরি পর্যন্ত এসে তাঁকে বিদায় জানিয়ে যান। ১৮৩০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের 'Bengal Chronicle'-এ এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

রাজারামের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে মতদ্বৈত বর্তমান।[১] তাঁর যে পরিচয় সাধারণের মধ্যে প্রচলিত তা হল তিনি রামমোহনের পালিতপুত্র। মিঃ ডিক নামে জনৈক সিভিলিয়ান হরিদ্বারের এক মেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় শিশু রাজারামকে কুড়িয়ে পান এবং লালনপালন করেন। তারপর তিনি যখন বিলাত যান তখন রামমোহন ঐ বালকটিকে আশ্রয় দেন। ডিক সাহেব পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন নি;

১। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তাই সেই থেকে রাজারাম রামমোহনের কাছে পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত হন। রাজারামের প্রতি রামমোহনের স্নেহ ছিল কিছু পরিমাণে বেশী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উল্লিখিত একটি ঘটনা হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'এক দিবস মধ্যাহ্নে আমি রাজার বাটীতে গমন করিলাম রাজা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রাজারাম আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "একটা তামাসা দেখিবে তো এস।" আমি তাহার সহিত গমন করিলাম। রাজারাম ধীরে ধীরে রাজার শয্যার নিকটে গমন করিল, এবং হঠাৎ রাজার বক্ষঃস্থলের উপর ঝম্প দিয়া পড়িল। রাজা জাগ্রৎ হইলেন, এবং 'রাজারাম' 'রাজারাম' বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।'

'আলবিয়ন' জাহাজে রামমোহনের সহযাত্রী ছিলেন হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ জেমস সাদারল্যাণ্ড। এই যাত্রা সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথা ১৮৩৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'Sutherland's Reminiscences of Rammohun Roy' নামে সেটি পুনর্মুদ্রিত করেন। এই স্মৃতিকথা হতে রামমোহনের এই সময়কার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। রামমোহন জাহাজে তাঁর নিজের ঘরেই আহার করতেন। তাঁর ভৃত্যেরা সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হলে তিনি তাদেরকে নিজের কেবিনের মধ্যেই আশ্রয় দিয়েছিলেন। জাহাজে অধিকাংশ সময় তিনি সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠ করতেন। মধ্যাহ্নের পূর্বে এবং সন্ধ্যায় ডেকের উপর বেড়াবার সময় তিনি অনেকের সঙ্গে উৎসাহভরে আলাপ-আলোচনা করতেন। রাত্রে খাওয়ার পরও তিনি সকলের সঙ্গে বসে নানা ধরণের আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। জাহাজের সকল যাত্রীই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রত্যেকেই তাঁকে যত্ন করার জন্য ব্যস্ত হতেন। এমনকি জাহাজের খালাসীরাও তাঁর সেবা করার জন্য তৎপর থাকত। তিনি সবসময়ই শান্ত ও প্রফুল্ল থাকতেন; একমাত্র বায়ু প্রতিকূল হলেই তাঁর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠত। কারণ প্রতিকূল বায়ুতে জাহাজের গতি ব্যাহত হবে, ফলে হয়ত ইংলণ্ডে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই কোম্পানীর নূতন সনন্দ সম্পর্কে আলোচনা শেষ হয়ে যাবে।

উত্তমাশা অন্তরীপে জাহাজ উপস্থিত হলে রামমোহন অল্প সময়ের জন্য তীরে অবতরণ করেন। এক দুই ঘণ্টা পরে যখন তিনি জাহাজে ফিরে আসেন তখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে। যে সিঁড়ি দিয়ে জাহাজে উঠানামা করতে হয় সেটি ভালভাবে সংস্থাপিত না হওয়ার জন্য তিনি পড়ে যান এবং গুরুতরভাবে আহত হন। এই আঘাতে তাঁর একটি পা জখম হয়। দীর্ঘ আঠার মাস তিনি যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেন। পরে সুস্থ হলেও ইহজীবনে তিনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করতে পারেন নি।

ভগ্নপদে রামমোহন যখন জাহাজে একান্তভাবে অসহায় তখন ফরাসী বিপ্লব সার্থক হয়েছে। স্বাধীন পতাকাশোভিত দুটি ফরাসী জাহাজ দেখে স্বাধীনতার পুজারী রামমোহন আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। এক মুহূর্তে সমস্ত শারীরিক কষ্ট বিস্মৃত হয়ে ঐ জাহাজে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তাঁকে ফরাসী জাহাজে নিয়ে যাওয়া হল। ফরাসীরা রামমোহনকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ফ্রান্সের স্বাধীন পতাকাকে অভিবাদন করে রামমোহনের অন্তর এক সুগভীর তৃপ্তিতে ভরে উঠল। জাহাজ হতে চলে আসার সময় তাঁর উল্লসিত অন্তর বারবার উচ্চারণ করল: 'glory, glory, glory to France !'

ফরাসী বিপ্লবের মধ্যদিয়ে মানুষের মুক্তিস্বপ্ন সফল হল। এই মুক্তিস্বপ্নই আচ্ছন্ন করেছিল রামমোহনের সমস্ত অন্তর। তাঁর স্বদেশেরও মুক্তি চাই। তাই জীবনের সারাটি পথে তিনি শুধু একটি চিন্তাই করেছেন—তা হল ভারতবর্ষের কল্যাণ। সমুদ্রপথে রিফর্ম বিলকে কেন্দ্র করে সেই একই চিন্তা। জাহাজ যতই ইংলণ্ডের সমীপবর্তী হতে লাগল রামমোহন ততই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। পার্লামেন্টের সংবাদের জন্য তাঁর চিত্ত অধীর হয়ে উঠল। অবশেষে জাহাজ বিষুবরেখার নিকটবর্তী হলে ইংলণ্ড হতে আগত একটি জাহাজের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। সেই জাহাজের আরোহীদের কাছ হতে কিছু সংবাদপত্র সংগৃহীত হল। সংবাদপত্র হতে জানা গেল যে ইংলণ্ডে মন্ত্রীসভার পরিবর্তন ঘটেছে; ডিউক অব ওয়েলিংটনের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন লর্ড গ্রে। রামমোহন আনন্দিত হলেন; তাঁর আশা হল, ইংলণ্ডে মন্ত্রীসভার এই পরিবর্তন ভারতবর্ষের পক্ষে শুভ। এর কিছু পরে রামমোহনের জাহাজ যখন প্রায় ইংলিশ চ্যানেলের কাছাকাছি যেয়ে উপস্থিত

হল তখন আর একটি জাহাজের সঙ্গে দেখা হল। সেই জাহাজের আরোহীদের কাছ হতে জানা গেল যে পার্লামেণ্টে রিফর্ম বিল দ্বিতীয়বার পাঠের সময় রক্ষণ-শীলদের পক্ষে একটিমাত্র ভোট বেশী ছিল। এই সংবাদে রামমোহন উৎফুল্ল হলেন। রিফর্ম বিল পাশ হবে—এই আশা নিয়ে তিনি হাজির হলেন ইংলণ্ডে। সমগ্র ইংলণ্ড সেদিন আড়োলিত। সর্বত্রই রিফর্ম বিলের আলোচনা। উৎসাহে, আনন্দে, আশায় ইংলণ্ডের অন্তর মথিত। সেই শুভলগ্নে রামমোহন ইংলণ্ডে উপস্থিত হলেন।

১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে রামমোহন লিভারপুলে অবতরণ করলেন। রাম-মোহনের আগমন সংবাদ পেয়ে উইলিয়ম র‍্যাথবোন (Rathbone) রামমোহনকে তাঁর 'গ্রীণব্যাঙ্ক' নামক বাসভবনে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু রামমোহন স্বতন্ত্রভাবে থাকার জন্য Radley's Hotel-এ আশ্রয় নিলেন। এখানে বহু ব্যক্তি রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রামমোহনের পূর্বে তাঁর খ্যাতি এদেশে পৌঁছেছিল; তাই প্রতিদিন বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে আসতেন, রামমোহনও অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বাইরে যেতেন। রামমোহনের সারাদিনের সমস্ত সময় এইভাবেই অতিবাহিত হত। এখানে তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল ধর্ম এবং রাজনীতি। লিভারপুলে রামমোহন জনৈক বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অতীব প্রীত হন। ইনি যুবা বয়সে জাহাজের কোন সামান্য কার্যে নিযুক্ত হয়ে কোলকাতায় আসেন। সেই সময় রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি তাঁর মানিকতলার বাড়ীতে যান। কিন্তু রামমোহন তখন বাড়ীতে না থাকায় তিনি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ হতে স্মরণচিহ্ন স্বরূপ একটি দ্রব্য কুড়িয়ে আনেন এবং সেটি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করার পরও তিনি যত্নপূর্বক সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। একজন বিদেশী সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পরিচয় রামমোহনকে মুগ্ধ করে।

লিভারপুলে রামমোহন সর্বপ্রথম একটি ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয়ে যোগ দেন। সেখানে আচার্য ছিলেন Mr. Grundy নামে জনৈক ব্যক্তি। তিনি তাঁর উপদেশে অন্যের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কথা উল্লেখ করেন। উপাসনার শেষে উপাসকগণ রামমোহনকে কাছ হতে দেখার জন্য তাঁর চারপাশে ভিড় করতে লাগলেন। পরে বাইরে আসার সময় একটি প্রস্তরখোদিত স্মরণচিহ্ন দেখে

রামমোহন শোকার্ত হয়ে ওঠেন। টেট (Tait) নামে জনৈক ইংরাজের সঙ্গে কোলকাতায় রামমোহনের পরিচয় হয়। এটি তাঁরই স্মৃতিচিহ্ন। রামমোহন অল্পক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করে নিলেন এবং তাঁর মানসিক অবস্থার কথা উপস্থিত ব্যক্তিদের বুঝিয়ে বললেন। রামমোহনের আন্তরিকতা ও তাঁর বিশুদ্ধ ইংরাজী জ্ঞান প্রত্যেককে মুগ্ধ করল। বিপুল উৎসাহে তাঁরা তাঁর সঙ্গে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। প্রায় দীর্ঘ একঘণ্টা পরে রামমোহন তাঁদের কাছ হতে মুক্তি পেলেন। লিভারপুলে Cropper এবং Benson নামে দুটি ধনী কোয়েকার পরিবার রামমোহনকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন মতবিশ্বাসের ব্যক্তিগণের সঙ্গে তাঁর সামাজিক মিলনের সুযোগ করে দেন।

লিভারপুলে রামমোহন পরিচিত হন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উইলিয়ম রস্কোর (William Roscoe) সঙ্গে। রস্কোর বয়স তখন আটাত্তর; তিনি তখন পঙ্গু। রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনা তাঁর বহুদিনের। জীবনের প্রথম দিকে তিনি 'Christian Morality, as contained in the Precepts of the New Testament, in the Language of Jesus Christ' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। পরে রামমোহনের 'Precepts of Jesus' প্রকাশিত হলে তিনি উভয় পুস্তকের মধ্যে সাদৃশ্য দেখে পুলকিত হন। তখন হতেই বহুদূরের সেই ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটির কর্মপ্রচেষ্টা তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে এবং তিনি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যস্ত হন। তাই রস্কোর জনৈক বন্ধু Mr. Thomas Hodgson Fletcher যখন লিভারপুল হতে কোলকাতায় আসেন তখন তিনি স্বরচিত কতকগুলি পুস্তক এবং একটি পত্র রামমোহনকে দেওয়ার জন্য তাঁর হাতে দেন। পত্রটিতে রামমোহনের প্রতি রস্কোর আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় আছে। তিনি লিখেছেন, 'We have, for some time past, been flattered with hopes of seeing you in this kingdom, but I fear I am not destined to have that pleasure. At all events, it will be a great gratification to me if I should survive the attacks of the paralytic complaint, under which I have now laboured for some years, till I hear that you have received this very sincere mark of the deep respect

and attachment which I have so long entertained for you, and which I hope to renew in a happier state of being.' রস্কোর পত্র পৌছবার পূর্বেই রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেছিলেন। রামমোহনের লিভারপুলে আগমন সংবাদ পেয়ে রস্কো উৎসাহিত হলেন। রামমোহন রস্কোর গৃহে তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রস্কোর সঙ্গে রামমোহন ইংলণ্ডের অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করেন।

লিভারপুলে রামমোহন বেশীদিন থাকতে পারেন নি; কারণ এই সময় রিফর্ম বিলের জন্য তাঁর যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। তাই তিনি লণ্ডন যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হন। যাওয়ার সময় মিঃ রস্কো রামমোহনের পরিচয় দিয়ে লর্ড ব্রুহামকে (Lord Brougham) একটি চিঠি লিখে দেন। ঐ পত্রে রামমোহনের পরিচয় ও তাঁর ইংলণ্ডে আসার কারণ উল্লেখ করে রিফর্ম বিলের আলোচনা শোনার জন্য হাউস অব কমন্সের গ্যালারীতে রামমোহনের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মিঃ রস্কোর ধারণা ছিল যে রামমোহন খৃষ্টান। তাই কোলকাতায় রামমোহনের কাছে প্রেরিত পত্রে সবশেষে তিনি লিখেছেন, 'I am, my dear Sir, your assured friend and fellow-christian,' এবং মিঃ ব্রুহামকে লিখিত পত্রে রামমোহনের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, '...of whom you must already have frequently heard as the illustrious convert from Hindooism to Christianity,'। রামমোহনের প্রতি মিঃ রস্কোর শ্রদ্ধা ও প্রীতির কারণ হিসাবে এটিও উপেক্ষনীয় নয়।

এপ্রিলের শেষাশেষি রামমোহন লিভারপুল হতে লণ্ডন যাত্রা করলেন। পথে ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করল। এই সময় তিনি ম্যানচেষ্টারে কল দেখতে যান। সেখানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত কর্মী তাঁকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 'The king of Ingee'-কে দেখার জন্য তাঁরা স্ব-স্ব কর্ম পরিত্যাগ করে দলে দলে এমনভাবে ভিড় করতে শুরু করেন যে, সেই ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশের প্রয়োজন হয় এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলে গেট বন্ধ করে দিতে হয়। রামমোহন তাঁদের সম্বোধন করে রিফর্ম বিলের জন্য রাজা ও

মন্ত্রীদের সমর্থন জানাতে অনুরোধ করেন। উপস্থিত জনতাও সানন্দে রামমোহনের কথায় সায় দেন।

রামমোহন লণ্ডনে উপস্থিত হলেন সন্ধ্যার কিছু পরে। প্রথমে তিনি নিউগেট স্ট্রীটের একটি হোটেলে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানকার কদর্য পরিবেশে অস্বস্তি বোধকরার জন্য ঐ রাত্রেই তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করে অ্যাডেলফি (Adelphi) হোটেলে উপস্থিত হন। সেখানে যখন তিনি নিদ্রামগ্ন তখন আধুনিক ব্যবস্থাদর্শনের স্রষ্টিকর্তা জেরিমি বেন্থাম (Jereme Benthan) তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য হোটেলে উপস্থিত হন। বেন্থাম দীর্ঘদিন একমাত্র তাঁর উদ্যানে ছাড়া বাইরে কোথাও যান নি। কিন্তু রামমোহনের আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি সেই রাত্রিকালেই হোটেলে চলে আসেন। রামমোহন নিদ্রিত ছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে বেন্থামের সাক্ষাৎ হয়নি। যাওয়ার সময় বেন্থাম একটি কার্ডে নিজের পরিচয় লিখে রেখে আসেন, পরে বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয়।

লণ্ডনে রামমোহন ১২৫ নং রিজেণ্ট স্ট্রীটের বাড়িতে বাস করেন। সেখানে প্রতিদিন বহু সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। প্রতিদিন বেলা প্রায় ১১টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত তাঁর বাড়ীর সামনে বহু গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত। তিনি প্রতিটি সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে বিপুল উৎসাহে রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করতেন। এইভাবে অনবরত আলোচনা করতে করতে একসময় তিনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে পরিপূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজনে তাঁর চিকিৎসক এই দেখা-সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

লণ্ডন ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েসন রামমোহনকে প্রকাশ্য সভায় অভ্যর্থনা জানায়। ১৮৩১ সালের জুন মাসের 'Monthly Repository'-তে এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাই মনে হয় সম্ভবতঃ মে মাসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসোসিয়েসনের সভ্যবৃন্দ রামমোহনকে সুগভীর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। এই 'Apostle of the East'-এর আগমনের জন্য তাঁরা আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর আগমনে তাঁরা উৎসাহিত ও আনন্দিত হন। এ সম্বন্ধে সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, 'It does so, because in his person

and example, we see an instance of the power of the human mind in recovering itself from the errors of ages.' ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক Sir John Bowring তাঁর ভাষণে বলেন যে রামমোহনের উপস্থিতিতে তাঁর চিত্তে যে আশা ও আনন্দের সঞ্চার ঘটেছে তা অনির্বচনীয়। তিনি বলেন যে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে অভিযাত্রীদল প্রথম 'Golden Cross' দেখে যে আনন্দ উপলব্ধি করেছিল সেই স্বর্গীয় আনন্দে তাঁর চিত্ত পূর্ণ। এর পর তিনি রামমোহনের গৌরবপূর্ণ কার্যাবলীর উল্লেখ করেন এবং যে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তিনি সেই সকল কার্য সম্পাদন করেন তাকে অভিনন্দন জানান। সবশেষে তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, 'That the members of this Association feel deep interest in the amelioration of the condition of the natives of British India; that we trust their welfare and improvement will never be lost sight of the Lagislature and Government of our country; that we have especial pleasure in the hope that juster notions and purer forms of religion are gradually advancing amongst them; and that our illustrious visitor from that distant region, the Rajah Rammohun Roy, be hereby certified of our sympathy in his arduous and philanthropic labours, of our admiration of his character, of our delight at his presence amongst us, and of our conviction that the magnanimous and beneficent course which he has marked out of himself and hitherto consistently pursued, will entitle him to the blessings of his countrymen and of mankind, as it will assuredly receive those of future generation,' এর পর আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট Dr. Kircland আমেরিকায় রামমোহন সম্পর্কে অগাধ বিস্ময় ও কৌতূহল এবং তাঁকে দেখার জন্য তাঁদের ব্যাকুল প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করেন। এই সংবর্ধনার উত্তরে রামমোহন তাঁর বিনীত ভাষণে সকলকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন। খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদ ও ত্রিত্ববাদের প্রসঙ্গে বলেন যে একদিকে বুদ্ধি, শাস্ত্র ও সাধারণজ্ঞান এবং অন্যদিকে অর্থ, ক্ষমতা ও কুসংস্কার

—এই উভয়ের যুদ্ধে একেশ্বরবাদীদের জয় সুনিশ্চিত। রামমোহন অসুস্থ ছিলেন, তাই সংক্ষিপ্ত ভাষণেই তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এই সময় ডাঃ কার্পেণ্টার ছিলেন তাঁর সঙ্গী। কোলকাতায় বসবাসের সময় হতেই ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির মাধ্যমে রামমোহন কার্পেণ্টারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিলাতে এই প্রবাসজীবনে কার্পেণ্টার ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর।

লণ্ডনে বহু সম্ভ্রান্ত ইউনিটেরিয়ান পরিবারের সঙ্গে রামমোহন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। তাঁর ইউনিটেরিয়ান বন্ধুদের মধ্যে Dr. Carpenter, Mr. Estlin এবং Rev. W. G. Fox উল্লেখযোগ্য। তিনি ইউনিটেরিয়ান উপাসনায় যোগদান করতেন এবং 'Monthly Repository' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। কিন্তু তবুও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে রামমোহন কোনদিন এঁদের সঙ্গে অভিন্ন বলে নিজেকে পরিচিত করেন নি। এ সম্বন্ধে ডাঃ কার্পেণ্টার লিখেছেন, 'while in London, he repeatedly attended the worship of the Unitarians, at their different Chapels in or near the metropolis; and he twice attended their anniversary meetings: but it was his system to avoid so far identifying himself with any religious body, as to make himself answerable for their acts and opinions; and he also wished to hear preachers of other denominations who had acquired a just celebrity.'

ইংলণ্ডের সুধীসমাজ রামমোহনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। সুদূর ভারতবর্ষের এই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে তাঁরা সুগভীর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করল। দিল্লীর বাদশা রামমোহনকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন এবং রাজা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু সেদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তা অনুমোদন করে নি। তাই 'private individual' হিসাবে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। কিন্তু ১৮৩৩ সালের নভেম্বর মাসের এসিয়াটিক জার্নাল হতে জানা যায় যে ইংলণ্ডে মন্ত্রীগণ তাঁকে দিল্লীর বাদশার দূত হিসাবে স্বীকার করেন এবং তাঁর 'রাজা'-উপাধি অনুমোদন করেন। আর ইংলণ্ডের সমস্ত জনসাধারণের কাছে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে গৃহীত হলেন। রামমোহনের প্রতি ইংলণ্ডবাসীদের

এই শ্রদ্ধা ও উচ্চধারণায় কোম্পানীর কর্মচারীগণ সন্তুষ্ট হলেন না সত্য, কিন্তু দেশ-ব্যাপী এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনকে উপেক্ষাও করতে পারলেন না। তাই রামমোহনের প্রতি তাঁদের ব্যবহারেও পরিবর্তন দেখা দিল। এই প্রসঙ্গে সাদারল্যাণ্ডের মন্তব্য হল, ভারতবর্ষে যাঁরা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন, তাঁরাই ইংলণ্ডে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এই পরিবর্তন বিশেষরূপে লক্ষিত হল যখন ১৮৩১ সালের ৬ই জুলাই রামমোহনের সম্মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকাশ্য ভোজের আয়োজন করলেন। আগষ্ট মাসের 'Asiatic Journal'-এ এই ভোজসভার বিবরণ প্রকাশিত হয়। কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য প্রায় আশী জন সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। রামমোহনকে সংবর্ধনা জানিয়ে প্রেসিডেণ্ট রামমোহনের যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, যে-সমাদরে রামমোহনকে অভ্যর্থনা করা হল তা ভবিষ্যতে আরও ভারতবাসীকে ইংলণ্ডে আসায় উৎসাহিত করবে। রামমোহন সকৃতজ্ঞ অন্তরে কোম্পানীর দেওয়া সম্মান গ্রহণ করলেন। তিনি ইংরাজ অধিকারের পূর্বের ও পরের ভারতবর্ষের তুলনা করে দেখালেন যে সেখানে বর্তমানে অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান। দেশের উন্নতিসাধনে বিভিন্ন গভর্নর জেনারেলের নাম উল্লেখ করে তিনি বিশেষভাবে উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের কার্যের প্রশংসা করলেন। ইংলণ্ডে অন্যান্য হিন্দুদের আগমনের জন্য তিনি তাঁর সাগ্রহে প্রতীক্ষার কথাও ঘোষণা করেন।

ইংলণ্ডের রাজদরবারেও রামমোহন মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট তাঁকে রাজার নিকট উপস্থিত করেন। ইংলণ্ডের রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের সঙ্গে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়।

এইভাবে অল্পদিনেই রামমোহন ইংলণ্ডের উচ্চসমাজে পরিচিত হলেন। একজন অসাধারণ চরিত্রের মানুষ হিসাবে, একজন সত্যকার মানবহিতৈষী হিসাবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন নির্ভীক আপোষহীন সংগ্রামী হিসাবে ইংলণ্ডের সমাজের সর্বস্তরে তিনি বিপুল সমাদরে অভিনন্দিত হলেন।

॥ দুই ॥

ভারতবর্ষের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রামমোহন ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষে পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটি ১৮৩১ ও ১৮৩২ সালে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করে। এই সিলেক্ট কমিটির কাছে বহু ইউরোপীয় বণিক এবং রাজকর্মচারী সাক্ষী দেন। ভারতবাসী হিসাবে রামমোহনকেও সাক্ষী দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান হয়েছিল, রামমোহন সিলেক্ট কমিটির সামনে হাজির হননি ; তিনি সকল প্রশ্নের লিখিত উত্তর বোর্ড অব কণ্ট্রোলের নিকট প্রেরণ করেন। এই উত্তরগুলি ব্লু বুকে (Blue Book) উপযুক্তভাবে মুদ্রিত হয়। তাছাড়া লণ্ডনের স্মিথ, এল্ডার এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক উহা পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের নাম, 'Exposition of the practical operation of the Judicial and Reveune system of India, and the General Character and Condition of its Native Inhabitants as submitted in Evidence to the Authorities in England.' ভারতের রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ, জনসাধারণের অবস্থা, কলোনাইজেসন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে রামমোহনের বক্তব্য এই পুস্তকের মধ্য হতে জানা যায়।

রামমোহন রাজস্ব বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠান ১৮৩১ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে। মোট ৫৪টি প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন এখানে রায়ত, জমিদার ও গভর্নমেণ্টের রাজস্ব বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণে রায়তদের প্রতি রামমোহনের আন্তরিক সহানুভূতি গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রামমোহনের বক্তব্য হল : পার্মানেণ্ট সেলেটমেণ্ট-এর দ্বারা গভর্নমেণ্ট জমিদারদের রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, কিন্তু রায়তদের খাজনা সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে জমিদারগণ একদিকে তাঁদের পতিত জমিগুলিতে চাষের ব্যবস্থা করে অধিক খাজনা সংগ্রহ করতে লাগলেন, অন্যদিকে আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে রায়তদের খাজনা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। গভর্নমেণ্টের নিকট জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকার জন্য রায়তদের নিকট হতে বেশী খাজনা আদায় করা স্বার্থপর জমিদারদের লক্ষ্য হয়ে উঠল। তাই রায়তদের

অবস্থা দিন দিন করুণ হয়ে উঠল, জমিদারদের দাবী পূরণ করতেই তারা সর্বস্বান্ত হল, নিজেদের জন্য কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। অথচ পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেছিল যে, অসহায় অবস্থা হতে রায়তদের রক্ষা করা হবে গভর্নমেণ্টের কর্তব্য। কিন্তু কার্যতঃ রায়তদের সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করে জমিদারদেরই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হল। রামমোহন লিখেছেন, 'I deeply compassionate···with this difference in regard to the agricultural peasantry of Bengal that there the landlords have met with indulgence from government in the assessment of their revenue, while no part of this indulgence is extended towards the poor cultivators.' নিজেদের রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য গভর্নমেণ্ট জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, কিন্তু রায়তদের খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য জমিদারদের কোন নির্দেশ দেয়নি। জমিদারগণ কর্তৃক ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধির ফলে রায়তগণ যে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তা লক্ষ্য করে খাজনার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্যও গভর্নমেণ্ট আগ্রহী হয়নি। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে রামমোহন লিখেছেন, 'But I am at a loss to conceive why this indulgence was not extended to their tenants, by requiring proprietors to follow the example of government, in fixing a definite rent to be received from each cultivator, according to the average sum actually collected from him during a given term of years; or why the feeling of compassion excited by the miserable condition of the cultivators does not now induce the government to fix a *maximum* standard, corresponding with the sum of rent now paid by each cultivator in one year, and positively interdict any further increase.' এছাড়া গভর্নমেণ্টের বিচার বিভাগও রায়তদের স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত নয়। খাজনা বাকী পড়লে জমিদার রায়তদের বিরুদ্ধে নালিশ করে; ফলে রায়তদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হয়। কিন্তু জমিদারের দাবী ন্যায়সংগত কিনা সে অনুসন্ধান প্রায় কোন ক্ষেত্রেই হয় না। কোর্টের সংখ্যা অল্প হওয়ার জন্য এবং একদিকে জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি

এবং অন্যদিকে রায়তদের দারিদ্র্য ও ভীরুতাজনিত অক্ষমতার জন্য রায়তদের ভাগ্যে সুবিচার আশানুরূপ ঘটে না। এই প্রসঙ্গে রামমোহন স্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'The judicial authorities being few in number and often situated at a great distance, and the landholders and middlemen being in general possessed of great local influence and pecuniary means while the cultivators are too poor and too timid to undertake the hazardous and expensive enterprize of seeking redress, I regret to say that the legal protection of the cultivators is not at all such as could be desired.'

এর পর রামমোহন কালেক্টরদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। জেলার রাজস্বসংক্রান্ত কার্যের জন্য গভর্নমেণ্ট কর্তৃক কালেক্টর নিযুক্ত হয়। কিন্তু এদেশের আবহাওয়া, ভাষা প্রভৃতির জন্য জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ নিতান্তই সামান্য। তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ দু'এক জনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন। আর এই সকল ব্যক্তি গভর্নমেণ্ট অথবা প্রজাদের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতেই ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট এই উভয় পদেই নিযুক্ত থাকেন। অথচ রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে কালেক্টর ও প্রজার মধ্যে বিরোধের বিচারকর্তা হলেন ম্যাজিষ্ট্রেট। সুতরাং কালেক্টরকে যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হয় তাহলে যে সকল প্রজারা নিজেদের অধিকার রক্ষা করার জন্য গভর্নমেণ্টের কাছে বিচারপ্রার্থী হবে তাদের পক্ষে সেই ক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই রেভিনিউ অফিসারদের অবিচার হতে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য রামমোহনের প্রথম প্রস্তাব হল, 'that the collectors should not by any means be armed with magisterial powers.' কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ যেন পৃথক করা হয়। রামমোহন এই সঙ্গে অত্যধিক খাজনা দেওয়া হতে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য যে প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন তা হল, যদি গভর্নমেণ্ট তার রাজস্বের এক অংশ বিলাসসামগ্রী ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর কর ধার্য করে আদায় করে তাহলে সেই অনুপাতে প্রজাদের দেয় খাজনা ও জমিদারদের দেয় রাজস্ব হ্রাস হতে পারে। এছাড়া রাজস্ব বিভাগের

ব্যয় সংকোচ করেও প্রজাদের খাজনা হ্রাস করা সম্ভব। কালেক্টরদের বেতন মাসিক প্রায় ১০০০।১৫০০ টাকা। কিন্তু অধিকাংশ কার্যই দেশীয় অফিসারদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাই ইউরোপীয় কালেক্টরের পরিবর্তে যদি এদেশীয় সম্ভ্রান্ত এবং উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করা হয় তাহলে ৩০০।৪০০ টাকা বেতনই যথেষ্ট। তাই রামমোহন লিখেছেন, 'The large sum that may thus be saved by dispensing with the collectors would not only enable government to give some relief to the unfortunate Ryots above referred to by reducing their rents, but also raise the character of the natives and render them attached to the existing government and active in the discharge of their public duties,...'। রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে যদি এদেশীয় ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হয় তাহলে তাঁরা নিজেদের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বপ্রথমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন এবং তার ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে রাজস্ব বিভাগের কার্য সুসম্পন্ন হবে।

বিচার বিভাগ সম্বন্ধে রামমোহন মোট ৭৮টি প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠান ১৮৩১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে। বিচার বিভাগ সম্পর্কে রামমোহনের প্রথম মন্তব্য হল : 'The judicial system established in 1793, by Lord Cornwallis, was certainly well adapted to the situation of the country, and to the character of the people as well as of the government, had there been a sufficient number of qualified judges to discharge the judicial office, under a proper code of laws.' রামমোহনের মতে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থা দেশের পক্ষে উপযোগী ; কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার প্রধান অন্তরায় হল যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য বিচারক ও উপযুক্ত ব্যবহার-সংহিতার অভাব। এই বিশাল দেশের তুলনায় কোর্টের সংখ্যা অল্প হওয়ায় একদিকে দূরস্থিত সাধারণ দরিদ্র অধিবাসীদের পক্ষে প্রতিকারের জন্য কোর্টের সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে অত্যধিক কেসের জন্য বিচারকার্যও ত্বরান্বিত করা অসম্ভব হয়। ইউরোপীয় বিচারকদের প্রতি রামমোহনের যথেষ্ট আস্থা ছিল। কিন্তু

তাঁদের কার্যে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ভাষা। রামমোহন লিখেছেন, 'The first obstacle to the administration of justice is, that its administrators and the persons among whom it is administered have no common language.' সে সময় কোর্টে ফারসী ভাষার প্রচলন ছিল; কিন্তু বিচারক এবং এদেশের অধিবাসী—উভয়ের নিকট ফারসী ছিল বিদেশী ভাষা। তাই রামমোহন ফারসীর পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব করেন। ইংরাজী ইউরোপীয় বিচারকদের মাতৃভাষা এবং এদেশীয় অধিবাসীরা এই ভাষা ক্রমশঃ আয়ত্ত করতে সক্ষম হলে বিচারকার্য ফারসী অপেক্ষা ইংরাজীতে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এই সঙ্গে রামমোহন দেশীয় ব্যক্তিদের বিচারকার্যে অধিকার দানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। এদেশের ভাষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রথা-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা না থাকার জন্য ইউরোপীয় বিচারকদের পক্ষে বিচারকার্য যথাযথভাবে নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে দেশীয় সহকারীগণ তাঁদের নানাভাবে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাই রামমোহন ইউরোপীয় বিচারকের সঙ্গে দেশীয় বিচারকের একত্রে কার্য করার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মতে, 'The only remedy which exists, is to combine the knowledge and experience of the native with the dignity and firmness of the European.' উপযুক্ত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ দেশীয় ব্যক্তিদের গভর্নমেণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আবশ্যকতা ও যোগ্যতার কথা রামমোহন সর্বত্রই দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। দেশীয় এসেসর নিয়োগ ও দেশীয় পঞ্চায়েত প্রথার ন্যায় জুরির বিচার প্রবর্তনের প্রতি রামমোহন বিশেষ জোর দেন।

বিলাত হতে যে-সকল সিভিলিয়ানগণ এদেশে আসতেন তাঁদের সম্পর্কেও রামমোহনের মন্তব্য স্মরণীয়। রামমোহনের মত হল, তরুণ সিভিলিয়ানদের দ্বারা এদেশের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। ঐ বয়সে চরিত্র ঠিকমত গঠিত হয় না, বিবেচনাশক্তির উপযুক্ত বিকাশ ঘটে না এবং কর্তব্যবোধও গড়ে ওঠে না। অথচ এদেশে এসে তাঁরা উচ্চপদাধিকার করে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়। তাই তাঁদের চরিত্রে অসংযমের ছাপ পড়ে, অবিবেচনার ফলে প্রায়ই তাঁরা অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করেন এবং কর্তব্যকর্মে অবহেলা করেন। তাই তাঁরা

নিজেদের, গভর্নমেণ্টের এবং জনসাধারণের অনিষ্টকারী। রামমোহন এই সমস্ত বিবেচনা করে প্রস্তাব করেছেন যে ২৪ অথবা ২২ বৎসরের কম কোন ইংরাজকে সিভিলিয়ানরূপে ভারতে প্রেরণ করা উচিত নয়। তাছাড়া কেবলমাত্র যাঁদের আইনশাস্ত্রে জ্ঞান থাকবে, তাঁরাই বিচারবিভাগে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবেন। এর জন্য তাঁদেরকে ইংলণ্ডের আইনশাস্ত্রের কোন একজন অধ্যাপকের নিকট হতে গৃহীত উপযুক্ত প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করতে হবে। ইংলণ্ডের আইনশাস্ত্রে যদি তাঁর জ্ঞান থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে এদেশের আইন-কানুন যথাযথভাবে অনুধাবন করা সহজে সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছেন, 'This is so important, that no public authority should have the power of violating the rule, by admitting to the exercise of judicial functions any one who has not been brought up a lawyer.' অযোগ্য ব্যক্তির উপর যেন বিচারকার্যের ভার অর্পণ করা না হয়। দেশের সমগ্র জনসাধারণ যেন অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য বিচার বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে এবং বিচারকার্য যেন সর্বদা ন্যায়সংগতভাবে সম্পন্ন হয়—রামমোহন তাঁর মন্তব্যে বিশেষভাবে এগুলির উল্লেখ করেছেন। উপযুক্ত দেশীয় ব্যক্তিকে বিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে বিচার বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করার আবশ্যকতার উপরও তিনি জোর দিয়েছেন। এর দ্বারা শাসক ও শাসিত উভয়েই উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই সবশেষে তিনি লিখেছেন, 'In the improvements which I have ventured to suggest, I have kept in view equally the interests of the governors and the governed ; and without losing sight of a just regard to economy, I have been actuated by a desire to see the administration of justice in India placed on a solid and permanent foundation.' বিচার বিভাগকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল রামমোহনের মূল উদ্দেশ্য।

এরপর রামমোহন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে অতিরিক্ত ১৩টি প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠান ১৮৩১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে। এই সমস্ত প্রশ্নগুলির

বিষয়বস্তু ছিল : ভারতবাসীদের শারীরিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থা, বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা, এবং ইংরাজ শাসন সম্পর্কে তাদের অভিমত। রামমোহন তাঁর উত্তরে ধনী, দরিদ্র, সহরবাসী, গ্রামবাসী প্রত্যেকেরই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দরিদ্র গ্রামবাসীদের প্রতিই তাঁর সহানুভূতি অধিকমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। তাদের নৈতিক গুণাবলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন তিনি। সহর অথবা কোর্ট-কাচারির আবহাওয়া হতে দূরে অবস্থিত এদেশের সাধারণ চাষী অথবা গ্রামবাসী পৃথিবীর যে-কোন দেশের সৎ মানুষের সঙ্গে সমানভাবে তুলনীয়। রামমোহন দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন, 'From a careful survey and observation of the people and inhabitants of various parts of the country, and in every condition of life, I am of opinion that the peasants or villagers who reside at a distance from large town and head stations and courts of law, are as innocent, temperate and moral in their conduct as the people of any country whatsoever ;' ইংরাজশাসন সম্বন্ধে ভারতবাসীর অভিমত প্রসঙ্গে রামমোহনের মূল বক্তব্য হল, যোগত্যা অনুসারে প্রশাসনিক কার্যে দেশীয় ব্যক্তিদের নিযুক্ত করলে জনসাধারণ ও গভর্নমেণ্টের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রাজস্ব বিভাগ ও বিচার বিভাগ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ও রামমোহন গভর্নমেণ্টের উচ্চপদে দেশীয় ব্যক্তিদের নিযুক্ত করার আবশ্যকতা উল্লেখ করছেন। এখানেও তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করে লিখেছেন, 'I have no hesitation in stating, with reference to the general feeling of the more intelligent part of the native community, that the only course of policy which can ensure their attachment to any form of Government, would be that of making them eligible to gradual promotion according to their respective abilities and merits, to situations of trust and respectability in the state.'

রামমোহন এদেশের উন্নতির জন্য সেদিন বৃটিশ শাসনের প্রয়োজন স্বীকার

করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে এদেশের অধিবাসীরা প্রশাসনিক কার্যের দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত হয়ে ক্রমশঃ নিজেদের শাসনভার নিজেরা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজস্ববিভাগ ও বিচার-বিভাগের বিভিন্ন দোষত্রুটির উল্লেখ করেন এবং তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

সিলেক্ট কমিটির কাছে রামমোহন ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা এদেশের কল্যাণের পক্ষে কতখানি প্রযোজ্য সে বিষয়ে ভারতবর্ষে আলোচনা শুরু হয়। রামমোহনের অনুগামীগণের ও দেশের অন্যান্য উদারদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ধারণা হল যে রামমোহনের সুপারিশ কার্যকরী হলে এদেশের প্রভূত উপকার সাধিত হবে। কিন্তু রক্ষণশীল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করতে লাগলেন। তাঁদের মত হল, রামমোহন দেশের শত্রু। দেশের ধর্মবিশ্বাসকে ও সামাজিক আচার-আচরণকে তিনি বারবার আঘাত করেছেন। সুতরাং তাঁর দ্বারা দেশের কোন মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। ১৮৩১ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে জনৈক বিশ্বাস সমাচার দর্পণে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে উক্ত বিবাদের উল্লেখ আছে। পত্রলেখক এই প্রসঙ্গে প্রকৃত সত্য নিরূপণের জন্য আলোচনা আহ্বান করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের সমাচার দর্পণ হতে জানা যায় যে এ সম্বন্ধে পত্রিকা একটি দীর্ঘ পত্র পেয়েছিল কিন্তু সেই পত্রে রামমোহনের গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য থাকায় পত্রিকা সেটি প্রকাশ করেনি। পরে ১৫ই অক্টোবর তারিখের সমাচার দর্পণে এই বিষয়ে একটি পত্র মুদ্রিত হয়। পত্রটিতে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামপুরের যে মিশনারীদের সঙ্গে একদিন রামমোহনের তুমুল বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল তাঁরা কিন্তু এই সুযোগে রামমোহনকে এতটকু আক্রমণ করলেন না। বরং তাঁরা রামমোহনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। সমাচার দর্পণের পাতায় তাঁরা রামমোহনকে সে-যুগের একজন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করলেন। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখলেন যে, রামমোহনের ইংলণ্ডযাত্রা সময়ানুগ হয়েছে। তাঁর মতামতে দেশের কোন ক্ষতি হওয়ার পরিবর্তে উপকার সাধিত হবে; এবং এর জন্য ভবিষ্যতে তিনি দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে সম্মানিত হবেন।

রাজস্ববিভাগ সম্পর্কে রামমোহনের মতামত সম্বন্ধে এদেশে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি মতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং উভয়েই রামমোহনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিল। একটি মত হল, রামমোহন নিজে একজন জমিদার, তাই রায়তদের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টভাবে তিনি বর্ণনা করেননি। অপর মতটি হল, রামমোহনের বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে জমিদারদের স্বার্থের বিরোধী। প্রথম মতটি ব্যক্ত হল হরকরা পত্রিকায়, দ্বিতীয় মতটি প্রকাশ করল সমাচার চন্দ্রিকা। উভয়েই রামমোহনের বক্তব্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করল। উভয়পক্ষ যখন রামমোহনকে এইভাবে আক্রমণ করতে ব্যস্ত তখন ১৮৩২ সালের ২১শে জুলাই তারিখে সমাচার দর্পণ মন্তব্য করল যে রামমোহনের ইংলণ্ডগমন এবং সেখানে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার ফলে এদেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হবে ; উভয়পক্ষের অসন্তোষের মধ্যেই এই মন্তব্যের সত্য নিহিত।

রামমোহন ইংলণ্ড যাওয়ার পূর্বেই কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রতিবাদ করেন। ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাস ও কৃষি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে কোলকাতায় যে আন্দোলন শুরু হয় রামমোহন সেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শুধু এদেশে নয়, ইংলণ্ডেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সংঘর্ষ গড়ে উঠে। '১৮২৯ খৃষ্টাব্দে A view of the Present State and Future Prospects of the Free Trade and Colonization of India নামে একটি পুস্তিকা লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থকদের কাছে এই পুস্তিকার কদর বাইবেলের চেয়ে কম ছিল না।' [১] ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যাতে পুনরায় চার্টার না দেওয়া হয় তার জন্য পার্লামেণ্টের অনেক সদস্য চেষ্টা করছিলেন। তাই রামমোহন যখন প্রথম লিভারপুলে উপস্থিত হন তখন কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা ও ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বসবাস সম্পর্কে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়। এ বিষয়ে ১৮৩১ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের 'সমাচার দর্পণ' লিখেছে, 'পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমিটির কয়েকজন সাহেব বাবু রামমোহন রায়ের আগমন জন্য সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কম্পানীর বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আমাদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যে যে অভিপ্রেত তাহা

১। ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া সলা দ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা। আদালত সম্পর্কীয় কোনো কোনো সুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশ মধ্যে লবণাদির একচেটিয়া রূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইয়োরোপীয়দিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমা ব্যতিরেকে তাঁহারদিগকে তদ্দেশ বহির্ভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কম্পানী বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্বার চার্টার পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।' রামমোহন এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কলোনাইজেসনের পক্ষে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন।

সিলেক্ট কমিটির কাছে রামমোহন এ বিষয়ে তাঁর মতামত লিখে পাঠান ১৮৩২ সালের ১৪ জুলাই তারিখে। ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের ফলে সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি এখানে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। রামমোহনের মত হল : ইউরোপীয়রা এদেশে কৃষি ও বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলে কৃষি ও বাণিজ্য পদ্ধতির উন্নতি ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতিদ্বারা এদেশের অধিবাসী উপকৃত হবে। তাদের সংস্পর্শে এসে এদেশের অধিবাসীদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর হবে। ইউরোপীয়রা শাসকদের সমপর্যায়ভুক্ত; তাই তারা আইন ও বিচারপ্রণালীর প্রয়োজনীয় উন্নতি আদায় করতে সমর্থ হবে এবং তার ফলে এদেশের অধিবাসীরা জমিদার ও রাজকর্মচারীদের নিপীড়ন হতে রক্ষা পাবে। ইউরোপীয়দের সাহায্যে এদেশে সাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং দেশময় ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটবে। তাদের দ্বারা গভর্নমেণ্ট পূর্ব অথবা পশ্চিমের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে এবং ইংলণ্ড ও ভারত এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ হবে। এই সকল সুবিধার পাশাপাশি রামমোহন কতকগুলি অসুবিধার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তারা শাসকদের স্বজাতি সেইজন্য তারা গভর্নমেণ্টের কাছ হতে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা আদায় করবে, এদেশের অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব জাহির করবে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানবে। এই সমস্ত অসুবিধার কথা বিবেচনা করে রামমোহন ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাস করতে দেওয়ার পরিকল্পনাটিকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছেন। সেইসঙ্গে একথাও উল্লেখ করেছেন যে কেবলমাত্র শিক্ষিত, উন্নতচরিত্র এবং মূলধনের অধিকারী

ইউরোপীয়দেরই ভারতবর্ষে বসবাস করার অনুমতি ও উৎসাহ দেওয়া উচিত। তিনি লিখেছেন, 'On mature consideration, therefore, I think I may safely recommend that educated persons of character and capital should now be permitted and encouraged to settle in India, without any restriction of locality or any liability to banishment, at the discretion of Government; the result of this experiment may serve as guide in any future legislation on this subject.'

কলোনাইজেসন সম্পর্কে এই আন্দোলন বিফল হয়নি। ১৮৩৩ সালে কোম্পানীর নূতন সনন্দে বলা হল যে ১৮০০ সালের পূর্বে কোম্পানী যে-সমস্ত জায়গা অধিকার করেছিল সেখানে ইউরোপীয়গণ অবাধে বসবাস করতে পারবে কিন্তু ১৮০০ সালের পরে অধিকৃত জায়গায় বসবাস করতে হলে স্থানীয় গভর্নমেণ্টের নিকট হতে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। যাই বা হোক, এই নূতন সনন্দের দ্বারা এদেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে নূতন যুগের সূচনা হল এবং এই শুভ সূচনার পশ্চাতে রামমোহনের প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে রামমোহনের আর একটি প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এদেশে লবণের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ছিল কোম্পানীর হাতে। লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় কোম্পানীর কর্মচারীদের অংশ ছিল এই ব্যবসায় এবং তারা ইচ্ছামত দাম ধার্য করে প্রচুর লাভ করত। এর ফলে এদেশের অধিবাসীদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। বাংলাদেশের বহুসংখ্যক অধিবাসী এই লবণ তৈরীর কার্যে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু কোম্পানীর অত্যাচারের ফলে তাদের দুরবস্থার সীমা ছিল না; অথচ এই কার্য পরিত্যাগ করারও উপায় ছিল না। কোম্পানী লবণ বিক্রয়ের জন্য এদেশীয় এজেণ্ট নিযুক্ত করত। সেই এজেণ্টরাও লবণ গুদামজাত করে রেখে দেশে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করত এবং অতিরিক্ত চড়া দরে তা বিক্রয় করত। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এত বেশী পরিমাণে ভেজাল দিত যে তা সম্পূর্ণরূপে অখাদ্য ছিল। অথচ এই কালো অখাদ্য লবণ গ্রহণ করা

ছাড়াও উপায় ছিল না। বিদেশ হতে আমদানীকৃত লবণের উপর কোম্পানী এত বেশী শুল্ক ধার্য করেছিল যে তা ক্রয় করা দুঃসাধ্য ছিল।

কোম্পানীর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আন্দোলন শুরু হল। কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণের সময় যতই নিকটবর্তী হতে লাগল ততই সেই আন্দোলন বেড়ে উঠল। পত্র-পত্রিকায় নানা রচনা প্রকাশিত হল; অনেকে এ সম্বন্ধে পুস্তিকাও প্রকাশ করলেন। এঁদের মধ্যে J. Crawford এবং R. Rickards অন্যতম। সিলেক্ট কমিটির পক্ষ হতে রামমোহনকে কয়েকটি প্রশ্ন করে পাঠান হল এবং রামমোহন সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে সমগ্র পরিস্থিতিটি নিপুণভাবে তুলে ধরলেন। রামমোহনের বক্তব্য হল: লবণ অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী; কিন্তু অতিরিক্ত মূল্যের জন্য তা সামান্য পরিমাণে ক্রয় করাও দরিদ্র অধিবাসীদের পক্ষে দারুণ কষ্টকর। এর ফলে অন্নের সঙ্গে ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা তাদের আর থাকে না; কেবলমাত্র লবণ সহযোগেই অন্ন গ্রহণ করতে হয়। রামমোহন লিখেছেন, 'the high cost of this ingredient sometimes obliges the poor people to give into their *byunjun* or *salun* to procure it, and eat their rice with salt alone.' অথচ লবণের মূল্য ভারত অপেক্ষা ইংলণ্ডে এক-চতুর্থাংশ কম এবং তা অনেক ভাল। ঐ লবণ এদেশে আমদানী হলে মাটি মিশ্রিত অখাদ্য লবণ অতিরিক্ত চড়াদরে ক্রয় করার দুর্গতি হতে এদেশের অধিবাসীরা পরিত্রাণ পাবে।

সিলেক্ট কমিটির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করার সময় রামমোহন তাঁর অন্যান্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হননি। রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় সতী-আইনের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেছিলেন। রামমোহন ইংলণ্ডবাসীদের সহানুভূতির জন্য সতী-আইন সম্পর্কে তাঁর কতকগুলি মন্তব্য মুদ্রিত করে প্রচার করলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় একদিকে তিনি শাস্ত্রপ্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে সতীদাহ শাস্ত্রানুমোদিত নয়, অন্যদিকে বিস্তারিতভাবে নামোল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্যগণ, সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের বিচারকগণ, গভর্নমেণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অফিসারগণ এবং বিচক্ষণ ও সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়গণের সমর্থন ও সুপারিশের পর গভর্নর জেনারেল ঐ আইন পাশ করেছেন। ১৮৩২

সালের জুলাই মাসে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের শুনানী শুরু হল। রামমোহন উপস্থিত হয়ে আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা শুনতেন। অবশেষে ১১ই জুলাই তারিখে আপীল বাতিল হয়ে গেল। এই সংবাদ ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। দেশের দরদী মানুষ আনন্দিত হল। রামমোহনের সহকর্মীগণ ব্রাহ্মসমাজের সভা আহ্বান করে এই আনন্দোৎসব পালন করলেন ও কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানালেন। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় ক্ষোভে, দুঃখে ও পরাজয়ের গ্লানিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। সমাচার চন্দ্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁদের সংক্ষুব্ধ অন্তরের হতাশ্বাস প্রকাশ পেল। এতদিনে তাঁদের নিষ্ঠুর অহঙ্কারের শেষ হল।

মিঃ ওয়েন-এর 'ইণ্ডিয়ান জুরি বিলে' এদেশের অধিবাসীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল এবং তারই প্রতিবাদে রামমোহন কোলকাতা হতে পার্লামেণ্টে একটি আবেদন করেন। কিন্তু সেদিন সেই আবেদনে কোন ফল হয়নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বোম্বাই ও মাদ্রাজ হতেও অনুরূপ দুটি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছিল। পরে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট মিঃ চার্লস্ গ্র্যাণ্ট (Mr. Charles Grant) এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে পার্লামেণ্টে একটি নূতন বিল উপস্থাপিত করা মনস্থ করলেন এবং কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কাছে এই প্রস্তাব জানালেন। চার্লস্ গ্র্যাণ্ট তাঁর বিলে খৃষ্টান এবং হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেককেই সমান অধিকার দানের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ তা সমর্থন করতে চাইলেন না। এই সময় রামমোহন ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি কোর্ট অব ডিরেক্টরসের আপত্তি খণ্ডন করে তাঁর লিখিত মতামত পেশ করলেন। রামমোহনের মতামত মিঃ গ্র্যাণ্টকে উৎসাহিত করল। তিনি কোর্ট অব ডিরেক্টরসের আপত্তি গ্রাহ্য না করে পার্লামেণ্টে তাঁর বিল পেশ করলেন। ১৮৩২ সালের ১৮ই জুন বিল পাশ হল এবং ১৬ই আগষ্ট হতে এই নূতন আইন কার্যকরী হল। এই নূতন আইনে ধর্মের বিভিন্নতার জন্য এদেশীয় ব্যক্তিদের জুরি হওয়ার ক্ষেত্রে যে বাধা ছিল তা অপসারিত হল, এবং সেই সঙ্গে এই প্রথম এদেশের অধিবাসীরা 'জাষ্টিস অব পীস' হওয়ার অধিকার পেল। রামমোহন ইংলণ্ড হতে তাঁর জনৈক সহকর্মীকে এই শুভ সংবাদ জানিয়ে লিখেছেন, 'I…now lose no time in informing you that the East India Juries and Justices Bill has passed into a law. (on

the 16th instant.) notwithstanding strenuous opposition on the part of the Company and some of their servants. The natives of India are indebted only to Mr. Charles Grant, President of the Board of Control, for this just and liberal measure, which much have the effect of raising them morally and politically. Both the Hindoos and Mossulmans are now entitled, equally with Christians, to serve as Justices of Peace as well as to sit on both Grand and Petty Juries. No longer can a spirit of religious rancour find its way into India.'

ঐ পত্রেই অন্যত্র রামমোহন ইংলণ্ডের গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন, 'The present Government seems very liberal, and the voice of the mighty people of England grows every day stronger in proportion to the growth of their intelligence.' এর ফলে ইংলণ্ডে রিফর্ম বিল পাশ হয়ে গেল। রামমোহন আনন্দিত হলেন। এইজন্য দীর্ঘদিন তিনি উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত করেছিলেন ; এমনকি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি রিফর্ম বিল না পাশ হয় তাহলে তিনি ইংলণ্ডের অধিকারে আর বাস না করে আমেরিকায় বসবাস করবেন। তাই এই বিল পাশ হলে তিনি উল্লসিত অন্তরে ১৮৩২ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে লিভারপুলের উইলিয়ম র‍্যাথবোনকে লিখেছেন, 'As I publicly avowed that in the event of the Reform Bill being defeated I would renounce my connection with this country, I refrained from writing to you or any other friend in Liverpool until I know the result. Thank heaven I can now feel proud of being one of your fellow subjects, and heartily rejoice that I have had the infinite happiness of witnessing the salvation of nation, nay of the whole world.'

রামমোহন ১৮২৯ সালে লাখেরাজ ভূমি-সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে যে আবেদন করেছিলেন বাংলা গভর্নমেণ্ট তা অগ্রাহ্য করেছিল। তাই এখন তিনি তাঁর সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কাছে এ বিষয়ে আপীল করলেন; কিন্তু এ আপীলেও কোন ফল হল না। তখন তিনি ইংলণ্ডের জনসাধারণের সমর্থনের আশায় রামরত্নের নামে 'Appeal to the British Nation against violation of common justice and a breach of public faith by the Supreme Government of India with the Native Inhabitants' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। ১৮৩৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এই পুস্তিকায় মূল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, গভর্নমেণ্টের নিকট প্রেরিত আবেদনপত্র, গভর্নমেণ্ট ও কোর্ট অব ডিরেক্টরসের উত্তর এবং এই প্রসঙ্গে অন্যান্য সংবাদ উল্লিখিত ছিল। লণ্ডনের 'Times' পত্রিকা ১৮৩৩ সালের ৬ই ও ১৩ই এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোচনা করে বাংলার গভর্নমেণ্ট ও কোর্ট অব ডিরেক্টরসের আচরণের প্রতি তীব্র মন্তব্য করে। এই মন্তব্যের প্রতিবাদে 'A. B.' স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধ ১৮৩৩ সালের জুন মাসের এশিয়াটিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। পরের মাসে ঐ পত্রিকায় এই প্রতিবাদের উত্তর মুদ্রিত হয়। 'C. D.' স্বাক্ষরিত এই প্রবন্ধের রচয়িতা, মনে হয়, রামমোহন স্বয়ং।

রামমোহনের আর একটি উদ্দেশ্যও এই সময় সফল হয়। সেটি হল দিল্লীর বাদশার দৌত্যকার্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় বাদশার বৃত্তি বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ভারতে গভর্নর জেনারেলকে জানান যে দিল্লীর বাদশার জন্য তাঁরা অতিরিক্ত তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। রামমোহনের এই সফলতা ভারতবর্ষে আড়োলন জাগিয়েছিল। অনেকেই তখন কোম্পানীর অবিচারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আবেদন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

॥ তিন ॥

ইংলণ্ড হতে রামমোহন কিছুদিনের জন্য ফ্রান্স পরিদর্শনে যান। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতির পীঠস্থান ফ্রান্স দর্শনের জন্য রামমোহনের বহুদিনের বাসনা ছিল। ইংলণ্ড আসার বহু পূর্বেই ফ্রান্সে রামমোহনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ফরাসী বিদ্বমণ্ডলী রামমোহনকে সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। 'তিনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই ফ্রান্সের সোসিয়েতে আসিয়াতিক (প্রাচ্য বিদ্যানুশীলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরূপ সারস্বত সভা) নামক প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত বিদেশী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।'

রামমোহন ১৮৩২ সালের শরৎকালে লণ্ডন হতে প্যারিস যাত্রা করেন। এই সময় পাশপোর্ট ছাড়া কোন বিদেশীর পক্ষে ফ্রান্সে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। রামমোহন এই নিয়মে ক্ষুব্ধ হন। তিনি পাশপোর্টের জন্য ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীর নিকট একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সেখানে দেশ জাতি নির্বিশেষে মানুষের ঐক্যের বাণী ঘোষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'It is now generally admitted that not religion only but unbiassed common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.' রামমোহন এখানে সমস্ত মানবজাতিকে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে কল্পনা করেছেন। শুধু তাই নয়, জাতিসংঘ গঠনের পরিকল্পনাও তাঁর চিন্তায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সেও রামমোহন যথেষ্ট সমাদর পান। ফ্রান্সের সম্রাট লুই

ফিলিপ তাঁকে সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর সঙ্গে একত্র ভোজন করেন। ফ্রান্সে রাজনীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোহনের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও চরিত্রমাধুর্যে প্রীত হন। সুপ্রসিদ্ধ কবি স্যর টমাস মুরের সঙ্গে রামমোহন প্যারিসের কোন এক হোটেলে একসঙ্গে আহার করেন। টমাস মুরের রোজ-নামচায় এর উল্লেখ আছে। কয়েকমাস পরে ১৮৩৩ সালের প্রথম দিকে রামমোহন লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন। ফরাসী ভাষায় দখল না থাকার জন্য রামমোহনের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। এ সম্বন্ধে ১৮৩৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে তিনি ব্রাইটনের Mr. Woodford-কে লিখেছেন, 'I was detained in France too late to proceed to Italy last year ; besides, without a knowledge of French, I found myself totally unable to carry on communication with foreigners, with any degree of facility. Hence I thought I would not avail myself of my travels through Italy and Austria to my own satisfaction. I have been studying French with a French gentleman who accompanied me to London, and now is living with me.'

ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতা রামমোহনের ফ্রান্স যাত্রার সঙ্গী ছিলেন। রামমোহন যখন ইংলণ্ডে আসেন তখন তাঁর অসুবিধা ও কষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য এবং তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য ডেভিড হেয়ার তাঁর ভ্রাতাদের পত্রদ্বারা বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। রামমোহন লণ্ডনে উপস্থিত হলে হেয়ারের ভ্রাতারা তাঁকে তাঁদের বেডফোর্ড স্কোয়ারের বাসভবনে অবস্থান করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু রামমোহন অপরের সাহায্য যতদূর সম্ভব গ্রহণ না করে স্বাধীনভাবে থাকার জন্য সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। এই সময় তাঁকে কতিপয় ব্যক্তি পরামর্শ দেন যে লণ্ডনে ধনী ব্যক্তির ন্যায় জাঁকজমকে অবস্থান করলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সুবিধা হবে। পরামর্শদাতাদের মধ্যে তাঁর সেক্রেটারী স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট একজন। রামমোহন তাই রিজেণ্ট পার্কে কম্বারল্যাণ্ড টেরাম নামক এক প্রাসাদতুল্য বাড়িতে অবস্থান করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে সেই বাড়ী পরিত্যাগ করেন এবং বেডফোর্ড স্কোয়ারে

হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদের সঙ্গে বসবাস করেন। তিনি যতদিন লণ্ডনে ছিলেন ততদিন ওখানেই থাকতেন।

লণ্ডনের সমাজ রামমোহনকে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। মেরী কার্পেণ্টার তাঁর The last days in England of the Rajah Rammohun Roy গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রামমোহনের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিনয় প্রত্যেককে মুগ্ধ করত। তাঁর কথোপকথন ছিল বুদ্ধিদীপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী। তাঁর মিষ্ট মধুর ব্যবহারে, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ফলে তিনি ইংলণ্ডের নারীসমাজের চিত্ত জয় করেছিলেন। তাই অনেকেই তাঁদের চিঠিপত্রে, দৈনন্দিন লিপিতে অথবা গ্রন্থ মধ্যে রামমোহনের প্রচুর প্রশংসা করেছেন। Miss Lucy Aikin নামে জনৈক মহিলা কর্তৃক Dr. Channing-কে লিখিত কয়েকটি পত্রে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'With very great intelligence and ability, he unites a modesty and simplicity which win all hearts.' তিনি রামমোহনের বিদ্যা-বুদ্ধি, তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁর বিনয় ও সরলতা এবং তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর হতেই এশিয়াখণ্ডের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রামমোহন সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত আবেগে তিনি লিখেছেন, 'He is indeed a glorious being,—a true sage, as it appears, with the genuine humility of the character, and with the genuine sensibility, a more engaging tenderness of heart than any *class* of character can justly claim.'

লণ্ডনের তৎকালীন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ফ্যানী কেম্বল (Fanny Kemble) তাঁর দৈনন্দিন লিপিতে রামমোহনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বেসিল মণ্টেগু সাহেবের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে রামমোহনের আলাপ হয়। প্রাচ্য নাটকে তাঁর আগ্রহের পরিচয় পেয়ে রামমোহন তাঁকে উইলিয়ম জোন্সের অনুদিত কালিদাসের শকুন্তলা নাটক উপহার দেন। রামমোহন ইজাবেলা নাটকে ফ্যানী কেম্বলের অভিনয় দেখতে যান এবং দেখে যথেষ্ট মুগ্ধ হন। তাছাড়া মণ্টেগু পরিবারে

একদিন তাঁর নৃত্যও উপভোগ করেন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর বহুক্ষণ কথোপকথন হয় এবং তিনি প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'We presently began a delightful conversation, which lasted a considerable time, and amused me extremely. His appearance is very striking. His picturesque dress and colour make him, of course, a remarkable object in a London ballroom. His countenance, besides being very intellectual, has an expression of great sweetness and benignity.' রামমোহন যে কেবলমাত্র দার্শনিক পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তা নয়, তিনি নৃত্য ও নাটকের রসাস্বাদন করতেন এবং সুরসিক ও আমোদপ্রিয়ও ছিলেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে রামমোহন রাজারামকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য Rev. D. Davison M. A. নামে জনৈক সাহেবের নিকট রেখেছিলেন। এই সূত্রে তিনি ঐ পরিবারের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন এবং তাঁরা রামমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। একসময় ঐ পরিবারের একটি শিশুর নামকরণ উপলক্ষে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং শিশুটির নামকরণ করলেন 'রামমোহন রায়'। এই শিশুটির প্রতি রামমোহনের স্নেহ ছিল অত্যন্ত গভীর। রামমোহনের সুন্দর স্বভাব ও ভদ্র ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে Mrs. Davison লিখেছেন, 'For surely never was there a man of so much modesty and humility! I used to feel quite ashamed of the reverential manner in which he behaved to me. Had I been our Queen I could not have been approached and taken leave of with more respect.'

রামমোহনের ইংলণ্ড আগমনের কিছু পরেই ডাঃ কার্পেণ্টার তাঁকে Miss Kiddell ও Miss Castle-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা ব্রিষ্টলে ষ্টপলটন গ্রোভ (Stapleton Grove)-এ বাস করতেন। ব্রিষ্টলে মাইকেল ক্যাসেল নামে জনৈক বণিক ডাঃ কার্পেণ্টারের উপাসকমণ্ডলীর একজন সভ্য

ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। তখন তাঁদের নাবালিকা কন্যা মিস্ ক্যাসেলের দেখাশুনার ভার পড়ে ডাঃ কার্পেণ্টারের উপর। মিস্ কিডেল ছিলেন মিস্ ক্যাসেলের মাতুলানী। এঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর ঠিক হয় যে রামমোহন ব্রিষ্টলে এঁদের অতিথি হয়ে বাস করবেন। কিন্তু দীর্ঘদিন তিনি ব্রিষ্টলে যাওয়ার কোন অবসর পাননি। অনেকগুলি উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ইংলণ্ড রওনা হয়েছিলেন। তাই সেই সকল উদ্দেশ্য পুরণের জন্য তাঁকে সর্বদাই কর্মব্যস্ত থাকতে হত। রিফর্ম বিল, কোম্পানীর নূতন সনন্দ, ভারতের শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য তাঁর লণ্ডনে অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক ছিল। তাই আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্রিষ্টলে যেতে পারেননি। মিস্ কিডেল ও মিস্ ক্যাসেলকে লিখিত বিভিন্ন পত্রে তিনি একথা উল্লেখ করেছেন। ১৮৩৩ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে মিস্ কিডেলকে লিখিত পত্রে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'But the sense of my duty to the natives of India has hitherto prevented me from fixing a day for my journey to that town, and has thus overpowered my feeling and inclination.' স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। কোন কারণেই তিনি স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হন নি। তাই লণ্ডনে তাঁর সমস্ত কাজ শেষ হলে ১৮৩৩ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে তিনি মিস্ কিডেলকে লিখেছেন, 'I have now the pleasure of informing you that I feel relieved, and will proceed Staplet... Grove on Thursday next.'

সব কাজ সাঙ্গ করে রামমোহন এলেন ব্রিষ্টলে। সঙ্গে এলেন তাঁর সঙ্গীরা ও হেয়ার সাহেবের ভগিনী; রাজারাম তাঁর আগেই এসেছিলেন। রামমোহন ষ্টেপলটন গ্রোভ-এ মিস্ ক্যাসেলের অতিথি হলেন। লণ্ডনের কর্মব্যস্ত জীবন হতে দূরে এখানকার শান্ত পরিবেশ তাঁকে তৃপ্তি দিল গভীরভাবে। এখানে তিনি ডাঃ কার্পেণ্টারের সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। ডাঃ কার্পেণ্টার যে উপাসনালয়ের আচার্য ছিলেন সেই Lewin's Mead Chapel-এ রামমোহন দুবার উপাসনায় যোগ দেন। প্রসিদ্ধ প্রাবন্ধিক Rev. John Foster মিস্ ক্যাসেলের ভাড়াটিয়া হিসাবে ষ্টেপলটন গ্রোভ-এর

পার্শ্বে বাস করতেন। রামমোহন সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভাল ছিল না। কিন্তু এখানে তিনি রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর পূর্বধারণা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। ১৮৩৩ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে তিনি তাঁর বন্ধুকে এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'My prejudice could not hold out half-an-hour after being in his company.' রামমোহনের বন্ধুত্বপূর্ণ মধুর ব্যবহার ও বিনয় তাঁকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে।

১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ষ্টেপলটন গ্রোভ-এ একটি সভা হয়। সেখানে রামমোহনের সঙ্গে আলোচনার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন। রামমোহন উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে ভারতবর্ষের ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, তার ভবিষ্যৎ এবং সে দেশের দার্শনিক মতামত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সুদীর্ঘ তিনঘণ্টা কাল দণ্ডায়মান হয়ে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তাঁর স্পষ্ট, যথার্থ ও যুক্তিসম্মত উত্তরে সকলেই অভিভূত হন।

এটাই ছিল রামমোহনের শেষ আলোচনা। কর্মময় জীবননাট্যের শেষ দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেল। সমস্ত উত্তেজনা, উৎসাহ ও পরিশ্রমের শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন রূপে তিনি প্রতিভাত হলেন পরদিন সকালে। ব্রিষ্টলের শান্ত আকাশের নীলে ছুটির ইশারা জেগে উঠল। রামমোহন জ্বরাক্রান্ত হলেন ১৯শে সেপ্টেম্বর। অসুস্থ রামমোহন আর সুস্থ হলেন না। মাত্র আট দিনের অসুখ—তারপর ২৭শে রাত্রি ২টা ২৫ মিনিটে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

Mr. Estlin-এর ডাইরী থেকে এই কয়েকটি দিনের বিবরণ পাওয়া যায়।[১] ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মিঃ এষ্টলিন ষ্টেপলটন গ্রোভ ভবনে যেয়ে দেখলেন যে রামমোহনের জ্বর হয়েছে। তিনি ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। কিছু সুবিধা হলেও জ্বর তখনও রইল। ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতা Mr. Jhon Hare ও ভগিনী Miss Hare সেখানেই ছিলেন। ২০শে রামমোহনের অবস্থা পূর্বের চেয়ে খারাপ হল। তাঁর মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল। সন্ধ্যায় তিনি নিদ্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখের

১। Mr. Estlin-এর ডাইরীর এই অংশ মেরী কার্পেন্টার রচিত 'The last day of the Rajah Rammohun Roy গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

পাতা খোলা ছিল। রাত্রি একটার সময় দেখা গেল যে তাঁর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল এবং তার স্পন্দন ১৩০। গরম জল, অল্প সুরা এবং বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে কিছু উপকার হল। কিন্তু অত্যধিক অস্থিরতার জন্য তিনি কখনও শয্যায়, কখনও সোফায়, কখনও বা মাটিতে শয়ন করতে লাগলেন। Mr. Estlin রামমোহনের কাছে সর্বদা থাকার জন্য Miss Hareকে অনুরোধ করলেন। রামমোহন প্রথমে সংকোচবশতঃ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু পরে রাজী হন। রামমোহনের অবস্থা দেখে এষ্টলিন উদ্বিগ্ন হলেন; ঠিক করলেন যে অবস্থার উন্নতি না হলে পরদিন প্রিচার্ড সাহেবকে ডেকে দেখাবেন। ২১শে নাড়ীর অবস্থা কিছু ভাল হলেও জিহ্বার অবস্থা ভাল ছিল না। মিস্ কিডেল ডাক্তার প্রিচার্ডকে দেখানোর প্রস্তাব করলেন। প্রিচার্ড সাহেবকে আনা হল। তিনি ২২শে তারিখেও এলেন। মিস্ হেয়ার অক্লান্তভাবে রামমোহনের সেবা করতে লাগলেন। রামমোহন তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন, তিনিও রামমোহনকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। ২৩শে তারিখে রামমোহন খুব অস্থির ছিলেন। সমস্তদিন তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। অন্যের উপস্থিতি বুঝতে পারেন নি। মিঃ হেয়ার, মিস্ হেয়ার ও মিঃ এষ্টলিন এ ক্ষেত্রে অন্য চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ উচিত বিবেচনা করলেন। ডাক্তার ক্যারিককে আনা ঠিক হল। প্রিচার্ডের সঙ্গে ক্যারিক এলেন সন্ধ্যায়। রামমোহনের মস্তিষ্কই অধিক রোগাক্রান্ত বলে বিবেচিত হল। তাই মস্তিষ্কে জোঁক বসান হল। রামমোহন কিছু ভাল বোধ করলেন। ২৮শে ক্যারিক ও প্রিচার্ড উভয়েই এসেছিলেন। দিবাভাগে রামমোহন অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন, নিদ্রাও হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় এবং রাত্রে অবস্থা পুনরায় খারাপ হয়। ২৬শে রামমোহনের শরীরে ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ দেখা গেল; তাঁর শরীর বেঁকে যেতে লাগল। প্রিচার্ড ও ক্যারিক উভয়েই এলেন। রামমোহনের চুল কেটে তাঁর মাথায় ঠাণ্ডা জল দেওয়া হল। তাঁর চোখের তারা ছোট হয়ে এল; মনে হল বাঁ-হাত ও পা অবশ হয়ে গেছে। ডাক্তার বার্ণার্ডকে ডাকা স্থির হল। কিন্তু বার্ণার্ড এলেন না। অপরাহ্নে রামমোহনের শরীর অধিকতর গরম এবং নাড়ী প্রবল হলেও সন্ধ্যা হতে আবার ধনুষ্টঙ্কার দেখা দিল। তাঁর বাহ্যজ্ঞান প্রায় কিছুই ছিল না। প্রিচার্ড ও ক্যারিক চলে গেলেন। মুমূর্ষু রামমোহনকে

ঘিরে মিস্ কিডেল, মিস্ ক্যাসেল, মিস্ হেয়ার, রাজারাম, মিঃ জন হেয়ার, মিঃ এষ্টলিন ও তাঁর মাতা ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় রাত্রি অতিবাহিত করলেন। ২৭শে রামমোহনের অবস্থা প্রতি মুহূর্তেই খারাপ হয়ে এল। তাঁর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল; নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা সম্ভব হল না। তখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কারও কিছুই করার ছিল না। জানালার বাইরে জ্যোৎস্নালোকিত নীলিমার শান্ত সুষমা, আর ভিতরে একজন অসাধারণ ব্যক্তি মহাপ্রস্থানের পথে। মিঃ এষ্টলিন লিখেছেন, 'I shall never forget the moment.'

মিঃ হেয়ারের ইচ্ছানুসারে রামমোহনের অন্তিম সময়ে রামরত্ন কিছু প্রার্থনা করেন। ডাঃ কার্পেন্টার অসুস্থ থাকার জন্য এই সময় রামমোহনের পার্শ্বে থাকতে পারেননি; সংবাদ পেয়ে পরদিন প্রাতঃকালে তিনি উপস্থিত হন। Push নামে জনৈক মার্বেল পাথরের মিস্ত্রী রামমোহনের মস্তক ও মুখের প্রতিমূর্তি গ্রহণ করেন। ডাঃ কার্পেন্টার ও মিঃ এষ্টলিন ব্রিষ্টল নগরে যেয়ে রামমোহনের দেহ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এলেন। শনিবার তাঁর দেহ পরীক্ষা করে জানা গেল যে মস্তিষ্কের প্রদাহ হয়েছিল। মিঃ এষ্টলিন লিখেছেন, 'The brain was found to be inflamed containing some fluid and covered with a kind of purulent effusion: its membrane also adhered to the skull, the result, probably of previously existing disease: the thoracic and abdominal viscera were healthy.' রামমোহনের জ্বরই হয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ও মস্তিষ্কের প্রদাহ; অথচ এক্ষেত্রে তার বাহ্য লক্ষণ ঠিকমত প্রকাশ পায়নি।

রামমোহনের রোগশয্যার পার্শ্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে রামমোহন বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে চিকিৎসকগণেরও প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর পক্ষে আরোগ্যলাভ করা অসম্ভব। তাই তিনি তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুগণকে অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁকে যেন খৃষ্টানদের সমাধিক্ষেত্রে তাঁদের নিয়মানুসারে সমাধিস্থ করা না হয়। তাঁর পুত্রগণ পাছে বিষয়াধিকার হতে বঞ্চিত হন হয়ত সেইজন্যই

তিনি এ অনুরোধ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যে তাঁর মৃতদেহে যজ্ঞোপবীত ছিল। যাই বা হোক্, রামমোহনের অন্তিম বাসনা আগ্রহের সঙ্গে পূরণ করলেন মিস্ ক্যাসেল। তিনি তাঁর ষ্টেপলটন গ্রোভ-এর কাছে একটি ছায়াচ্ছন্ন নির্জন স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন। ১৮ই অক্টোবর শুক্রবার সেখানে নিঃশব্দে রামমোহনকে সমাহিত করা হল।

রামমোহনের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল তাঁর অত্যধিক পরিশ্রম ও অতিরিক্ত চিন্তা। চিন্তা কেবলমাত্র স্বদেশের উন্নতির জন্য নয়, সেই সঙ্গে এই সময় তাঁর আর্থিক চিন্তাও যথেষ্ট ছিল। তিনি কোলকাতায় যে হৌসের সঙ্গে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, সেটি ফেল হয়ে যাওয়ায় এই অসুবিধা হয়। আর্থিক অনটনের জন্য তিনি গভীর দুশ্চিন্তায় কাল অতিবাহিত করেন। এই প্রসঙ্গে দেওয়ান রামকমল সেনকে লিখিত হোরেস হেম্যান উইলসনের ১৮৩৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামমোহন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'He had become embrassed for money, and was obliged to borrow of his friends here, in doing which he must have been exposed to much annoyance, as people in England would as soon part with their lives as their money. Then Mr. Sandford Arnot, whom he had employed as his Secretary, importuned him for the payment of large arrears which he called arrears of salary, and threatened Rammohun, if not paid, to do what he has done since his death, claim as his own writing all that Rammohun published in England'. [১] উদ্ধৃত এই অংশটিতে শুধুমাত্র রামমোহনের আর্থিক দুরবস্থা নয়, সেইসঙ্গে স্যাণ্ডফোর্ড আর্নটের চরিত্রের পরিচয়টুকুও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রামমোহনকে একটি শান্ত নির্জন স্থানে সমাহিত করা হয়েছিল। সেখানে কোন স্মৃতিচিহ্ন ছিল না। দশ বৎসর পরে রামমোহনের অন্যতম বন্ধু ও সহকর্মী দ্বারকানাথ

১। প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত Life of Dewan Ramcomul Sen গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত।

ঠাকুর যখন ব্রিষ্টলে আসেন তখন তিনি জগৎবিখ্যাত সেই অসাধারণ মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ একটি সমাধিমন্দির তৈরীর সংকল্প করেন। কিন্তু তখন রামমোহনের সমাধির উপর কোন মন্দির করা সম্ভব ছিল না; কারণ ইতিমধ্যে ষ্টেপলটন গ্রোভ-এর মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছিল। তাই তিনি ১৮৪৩ সালের ২৯শে মে ব্রিষ্টলের নিকটবর্তী আরনোস্ ভেল (Arno's Vale) নামক স্থানে রামমোহনের শব স্থানান্তরিত করে একটি সমাধিমন্দির নির্মাণ করান। এর অনেক পরে ১৮৭২ সালে যখন সেই সমাধিমন্দির পুনরায় নূতন করে মেরামত করা হয় তখন সেখানে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ হল :

Beneath this stone rest the remains of
Raja Rammohun Roy Bahadoor.
A conscientious and steadfast believer in the unity
of the Godhood ;
He consecrated his life with entire devotion to the
worship of the divine spirit alone.
To great natural talents he united a thorough
mastery of many languages,
and early distinguished himself as one of the
greatest scholars of his day.

His unwearied labours to promote the social, moral and physical condition of the people of India, his earnest endeavours to suppress idolatry and the rite of suttee, and his constant zealous advocacy of whatever tended to advance the glory of God and the welfare of man, live in the greatful remembrance of his countrymen.

This tabtet
Records the sorrow and pride with which his memory is
cherished by his descendants.
He was born in Radhanagar, in Bengal in 1774,
And died at Bristol, September 27th, 1833.

রামমোহনের জীবন শেষ হলে ; আর তাঁর জীবনে জীবন লাভ করে জেগে উঠল সমগ্র ভারতবর্ষ। জড়তা, অজ্ঞানতা, অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের সহস্র নাগপাশ হতে মুক্ত করে ভারতকে তিনি দিলেন মুক্ত স্বচ্ছ উদার স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকার। তার উন্নতির সবগুলি অবরুদ্ধ পথ দু'হাতে উন্মুক্ত করে দিলেন তিনি। প্রাচীন ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ঐশ্বর্যসম্ভার পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন ভারতের শাশ্বত মহিমা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সফল সমীকরণের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল নূতন ভারতবর্ষ। এই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন মানবকল্যাণের মন্ত্র। বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি শতধারায় উৎসারিত হল। তিনি বিশ্বের সকল মানুষকে আহ্বান জানালেন বিশ্বমৈত্রীর বেদীমূলে।

যে-আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে ধরায় এসেছিলেন রামমোহন, ধরণী উদ্ভাসিত হল সে-আলোর পুণ্যপ্রভায়।

॥ পরিশিষ্ট ॥

গ্রন্থপঞ্জী

১৮০৩-৪ খৃষ্টাব্দ

১। তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন।

[ভূমিকাটি আরবী ও অবশিষ্টাংশ ফারসী ভাষায় রচিত]

২। মানাজারুতুল্ আদিয়ান্।

[প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি]

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ

১। বেদান্ত গ্রন্থ।

২। বেদান্তসার।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দ

১। তলবকার উপনিষৎ [কেনোপনিষৎ]

২। ঈশোপনিষৎ।

৩। Translation of an Abridgment of vedant or Resolution of all the veds; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology; establishing the Unity of the Supreme Being; and that He alone is the object of propitiation and worship.

৪। Translation of the Cena Upanishad, one of the chapter of the Sama veda: according to the gloss of celebrated Shunkuracharya; establishing the Unity and the Sole Omnipotence of the Supreme Being; and that He alone is the object of worship.

৫। Translation of the Ishopanishad, one of the chapter of Yajur Ved: according to the commentary of the celebrated Sunkuracharya: establishing the Unity and Incomprehensibility of the Supreme Being; and

that His worship alone can lead to Eternal Beatitude.

৬। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার। [১৮১৬-১৭].

১৮১৭ খৃষ্টাব্দ

১। ভট্টাচার্যের সহিত বিচার।

২। কঠোপনিষৎ।

৩। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

৪। A Defence of Hindoo Theism in reply to the Attack of an Advocate for Idolatry at Madras.

৫। A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas in reply to an apology for the present state of Hindoo worship.

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ

১। সহমরণ বি·য়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ।

২। গায়ত্রীর অর্থ।

৩। গোস্বামীর সহিত বিচার।

৪। Translation of a conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practi^ of Burning Widows Alive, from the original Bungla.

৫। Counter-Petition of the Hindu Inhabitants of Calcutta against Suttee.

১৮১৯ খৃষ্টাব্দ

১। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ।

২। মুণ্ডকোপনিষৎ।

৩। Translation of the Moonduk Upanishad of the Uthurvu-Ved, according to the gloss of the celebrated Shunkuracharya.

৪। Translation of the Kut'h-Upanishad of the Ujoor-

Ved, according to the gloss of the celebrated Shunkuracharya.

১৮২০ খৃষ্টাব্দ

১। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার।

২। কবিতাকারের সহিত বিচার।

৩। An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances.

৪। A Second Conference between Advocate for and an Opponent of the Practice of Burning Widows Alive. Translated from the original Bengalee.

৫। The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness ; extracted from the Books of the New Testament ascribed to the four Evangelists. With translation into Sungscrit and Bengalee.

৬। An Appeal to the Christian Public in defence of the 'Precepts of Jesus'.

১৮২১ খৃষ্টাব্দ

১। ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সংবাদ। ১ম, ২য় ও ৩য়।

[শিবপ্রসাদ শর্মার নামে মুদ্রিত]

২। The Brahmunical Magazine or the Missionary and the Brahmun, being a vindication of the Hindoo religion against the attacks of Christian Missionaries. No. I. II & III.

[শিবপ্রসাদ শর্মার নামে মুদ্রিত]

৩। Second Appeal to the Christian Public in defence of the 'Precepts of Jesus'.

১৮২২ খৃষ্টাব্দ

১। চারি প্রশ্নের উত্তর।

২। Brief Remarks regarding Modern Encroachments

on the Ancient Rights of females according to the Hindoo Law of Inheritance.

১৮২৩ খৃষ্টাব্দ

১। প্রার্থনাপত্র।

২। পাদরি ও শিষ্য সংবাদ।

৩। গুরু পাদুকা।

[পুস্তকটি পাওয়া যায়নি; কিন্তু রেভারেণ্ড লঙের Descriptive Catalogue of Bengali Books গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। এই পুস্তকের ভূমিকাটি সন ১৩৪০ সালের পৌষসংখ্যা 'ছোট গল্প' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হতে প্রকাশিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর গ্রন্থপঞ্জী অংশে ঐ ভূমিকাটি উদ্ধৃত হয়েছে।]

৪। পথ্য প্রদান।

৫। The Brahmunical Magazine or the Missionary and Brahmun. No IV.

৬। Final Appeal to the Christian Public in defence of the 'Precepts of Jesus'.

৭। Humble Suggestions to his Countrymen who believe in One True God.

[পুস্তিকাটি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত]

৮। A few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians. Part I & II.

৯। A Dialogue between a Missionary and three Chinese Converts.

১০। A Vindication of the Incarnation of the Deity as the common basis of Hindooism and Christianity against the schismatic attacks of R. Tytler Esqr. M. D.

[রামদাস ছদ্মনামে প্রকাশিত]

১১। A Letter to Lord Amherst on Western Education.

১২। Petitions against the Press Regulations.
(a) Memorial to the Supreme Court.
(b) Appeal to the King in Council.

১৮২৪ খৃষ্টাব্দ

১। A Letter to Rev. Henry Ware on the Prospects of Christianity in India.

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ

১। Translation of a Sunscrit Tract on Different Modes of Worship.

[রচয়িতার কোন নাম ছিল না ; লেখা ছিল, 'By a friend of the Author']

১৮২৬ খৃষ্টাব্দ

১। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ।

২। কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার।

৩। Bengalee Grammar in English Language.

১৮২৭ খৃষ্টাব্দ

১। বজ্রসূচী।

২। গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং।

৩। A Translation into English of a Sunscrit Tract, inculcating the Divine Worship, esteemed by those who believe in the revelation of the Veds as most appropriate to the nature of the Supreme Being.

৪। Answer of a Hindoo to the question 'why do you frequent Unitarian places of worship instead of the numerously attended Established Churches'?

[পুস্তিকাটি চন্দ্রশেখর দেবের নামে প্রকাশিত]

১৮২৮ খৃষ্টাব্দ

১। ব্রহ্মোপাসনা।

২। ব্রহ্ম সংগীত।

৪। Symbol of the Trinity.

১৮২৯ খৃষ্টাব্দ

১। অনুষ্ঠান।

২। সহমরণ বিষয়।

৩। The Universal Religion: Religious Instructions founded on Secred authorities.

৪। The Padishah of Delhi to the King George the Fourth of England.

৫। Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands.

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ

১। Address to Lord William Bentinck, Governor General of India upon the passing of the Act for the abolition of the Suttee.

২। Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal.

৩। Abstract of Arguments regarding the burning of widows, considered as a religious rite.

৪। Counter-Petition to the House of Commons to the Memorial of the advocates of the Suttee.

১৮৩২ খৃষ্টাব্দ

১। Translation of several Principal Books, Passages and Texts of the Veds, and of some controversial works on Brahmunical Theology.

২। Appeal to the British Nation against a violation of common justice and a breach of public faith by the Supreme Government of India with the Native Inhabitants.

[এটি রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত]

৩। Exposition of the practical operation of the Judicial and Revenue Systems of India, and of the general character and condition of its native inhabitants, as submitted in evidence to the authorities in England. With Notes and Illustrations. Also a brief Prelimi-

nary sketch of the ancient and modern boundaries, and of the history of that country.

৪। Answers of Rammohun Roy to the Questions on the Salt Monopoly.

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ

১। গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

২। Translation of the Creed maintained by the Ancient Brahmins as founded on the Sacred Authorities.

৩। The Autobiographical Letter.

নিম্নলিখিত রচনা দুটির প্রকাশকাল জানা যায় নি,—

১। আত্মানাত্মবিবেক। (১৮১৯ ?)

২। ক্ষুদ্রপত্রী।

এ ছাড়া আবও দুটি রচনা হল :

১। The English in India should adopt Bengali as their language.

[১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'মডার্ণ বিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত]

২। Hindoo authorities in favour of slaying the cow and eating its flesh.

[এটি এখনও অপ্রকাশিত]

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি ইংবাজী গ্রন্থ ইংলণ্ড ও আমেবিকা হতে পুনর্মুদ্রিত হয়। একটি গ্রন্থেব জার্মান সংস্করণ, অপর একটি গ্রন্থেব ডাচ সংস্কবণ এবং কয়েকটি গ্রন্থের হিন্দী সংস্করণও প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তাবিত বিবরণের জন্য মিস্ কলেট রচিত Life and Letters of Raja Rammohun Roy গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।